দ্বিতীয় বর্ষ]   কার্ত্তিক, ১৩১৬।   [১ম সংখ্যা।



খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়

সম্বলিত ধর্ম্ম, সমাজ ও

বিবিধ বিষয়ক

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

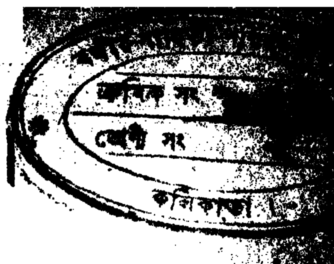
দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

কুশদহ-কার্য্যালয়

২৮।১ সুকিয়াষ্ট্রীট কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১।০ মাত্র।   প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

কুশদহ



খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, গৈপুর, ইছাপুর প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়
সম্বলিত ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও
বিবিধ বিষয়ক
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দ্বিতীয় বর্ষ

১৩১৬ সালের কার্ত্তিক হইতে
১৩১৭ „ আশ্বিন পর্য্যন্ত।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু দ্বারা
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

কুশদহ কার্য্যালয়,
২৮।১, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কুশদহর দ্বিতীয় বর্ষের সূচী।

২য় বর্ষ। আশ্বিন, ১৩১৭। ১২শ সংখ্যা।

সূচী।

দ্বিতীয় বর্ষ—কুশদহর নিয়মাবলী।

১। কুশদহ তিমাই ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসের শেষে বাহির হয়।

২। বার্ষিক চাঁদা মায় ডাকমাশুল ২৲ টাকা, সাধারণ চাঁদা অগ্রিম মায় ডাকমাশুল ১।৹ মাত্র।

৩। কুশদহতে প্রকাশজন্য প্রবন্ধ ও কবিতা এবং স্থানীয় সংবাদ সাদরে গৃহীত হইবে। স্থানীয় লেখক লেখিকাগণের প্রবন্ধাদি সমধিক আদরণীয় হইবে। কাপী স্পষ্ট লেখা আবশ্যক।

(ক) প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী থাকিবেন।

(খ) কুশদহতে কোন ধর্ম্মের বা সম্প্রদায়ের নিন্দাদি করা হইবে না।

(গ) প্রবন্ধাদি প্রকাশ যোগ্য না হইলে কারণ দর্শান এবং কাপী ফেরত দেওয়া যায় না। প্রেরকগণ কাপী রাখিয়া পাঠাইবেন। ১০ই তারিখের পরে পাঠাইলে সে মাসে বাহির হওয়া অসম্ভব।

৪। ১৩১৬ সালের কার্ত্তিক হইতে কুশদহর দ্বিতীয় বর্ষারম্ভ হইয়াছে। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহক হইতে হয়।

৫। কোন মাসের কাগজ না পাইলে, তাহার পর মাসের ৩০শে তারিখের মধ্যে না জানাইলে এবং ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ না দিলে, তজ্জন্য কাগজ পাইতে গোলযোগ হইলে আমরা দায়ী হইব না।

কুশদহ সংক্রান্ত চিঠি পত্র, প্রবন্ধাদি, মণিঅর্ডার ও বিনিময়ের পত্রিকাদি সমস্তই সম্পাদকের নামে ২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্ (কলিকাতা) পাঠাইতে হইবে।



কুশদহ।

"তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ,
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ ;
তোমারি (তরে) আঁখি বরষিছে,
এ বীণা তোমারি গাহিছে গান।"

দ্বিতীয় বর্ষ। কার্ত্তিক ১৩১৬। ১ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

"কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায়, ত্রাসে কম্পিত প্রাণ।"

হে করুণাময় বিধাতা! তোমার কৃপাতেই যে আজ দ্বিতীয় বর্ষের "কুশদহ" আরম্ভ হইল, তাহাতে আর কোন সন্দেহই রহিল না। আজ দুই মাস কাল হইতে কঠিন রোগে শয্যাগত হইয়া এ সম্বন্ধে তোমার যে গূঢ় রহস্য দেখিলাম, তাহাতে এখন মুক্তকণ্ঠে তোমার মহিমা ও করুণার কথা সর্ব্বাগ্রে না বলিয়া কিরূপে অকৃতজ্ঞের ন্যায় নীরব থাকিব? কিন্তু তোমার করুণার কথা বলিতে গিয়া কিছুই বলা হয় না। তবে এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার মহিমার কথা যেন না ভুলি। প্রভু পরমেশ্বর! প্রথম বর্ষের "কুশদহ" পত্রিকার পরিচালনে যে সকল ত্রুটী ঘটিয়াছে, তাহা তুমি ক্ষমা করিয়া এবার নূতন বল দাও, যেন তোমাতে সর্ব্বদা চিত্ত রাখিয়া এই কার্য্য সাধন করিতে পারি, এবং যাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই সেবার কার্য্য করাইতেছ, তাঁহাদের যেন মঙ্গল হয়।

কুশদহ।

কুশদহের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই; সুতরাং ইহা কোন্ সময়ে এবং কাহার দ্বারা কুশদহ নামে অভিহিত হয় তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কুশ-দহকে পূর্ব্বে কুশদ্বীপ বলিত। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যে কুশদ্বীপও একটী দ্বীপ। তবে কি কুশদ্বীপ সেই সপ্তদ্বীপের মধ্যে একটী দ্বীপ? পুরাণোক্ত কুশদ্বীপ সম্ভবতঃ মধ্য এসিয়ার কোন স্থানকে বলা হইত। বোধহয় সেই সময়ে কুশদ্বীপের সমৃদ্ধি ও উন্নতি দেখিয়া ইহার নাম কুশদ্বীপ রাখা হইয়াছিল। কুশদ্বীপ যে এককালে বঙ্গ সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ছিল এবং এখানে বিখ্যাত পণ্ডিত মণ্ডলীর ও বিপুল ধনশালী ভাগ্যবান লোকের বসতি ছিল তাহার সম্যক প্রমাণ পাওয়া যায়।

কৃষ্ণনগর রাজ বংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের অভ্যুদয়ের সময়ে কুশদ্বীপের অন্তর্গত জলেশ্বরে, কাশীনাথ রায় নামক এক ব্রাহ্মণ ভূস্বামী ছিলেন, তাঁহার বাসস্থানের চিহ্ন এখনও জলেশ্বরের নিকট মাঠে দেখা যায়। তাঁহার পূজিত শিব, আজও বৎসর বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে মহা সমারোহে পূজিত হইয়া থাকে;—এবং উক্ত দিবসে তথায় একটী মেলা হইয়া থাকে। উক্ত শিব, জাগ্রত শিব বলিয়া কুশদহের মধ্যে সকলের বিশ্বাস।

ভবানন্দ মজুমদার ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে নদীয়ার ফরম্যান প্রাপ্ত হইয়া নদীয়ার অধিপতি হইয়াছিলেন সেই সময়ে জলেশ্বরের রাজা কাশীনাথ রায় বর্ত্তমান ছিলেন।

ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে কুশদ্বীপ নামে নবদ্বীপ রাজ্যের একটী প্রধান নগরের উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু এই কুশদহের মধ্যে কুশদ্বীপ বা কুশদহ নামে কোন নগর বা গ্রাম দেখা যায় না। এই কুশদহ যে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজগণের অধিকৃত রাজ্য ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ড অব রেভিনিউ নদীয়া জেলাকে ৭২ পরগণায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পরগণার পরিমাণ ফল ও রাজস্ব সংক্রান্ত যে বিবরণ দিয়াছিলেন তাহাতে জানা যায় কুশদহের পরিমাণফল ১,০৯৪৪৯ বর্গ বিঘা এবং বার্ষিক রাজস্ব ১৮,৯৮৭৲ টাকা এবং ইহার মধ্যে চৌবেড়িয়া, সাতবেড়িয়া

ধর্ম্মপুর, জলেশ্বর, মাটিকোমরা, শ্রীপুর, ইছাপুর, মল্লিকপুর, নাইগাছি, গৈপুর, বালিয়ানি, খাঁটুরা, হৃদয়পুর, গোবরডাঙ্গা, কানাই নাটশাল, ঘোষপুর, গয়েশপুর চারঘাট, বেড়গুম, বেড়ী, রামনগর, ভুলোট (রামচন্দ্রপুর সম্বলিত) ও ডুমা প্রভৃতি ভদ্র প্রধান গ্রাম। কুশদহে দশ সহস্র অধিবাসীর বাস। এই সকলের মধ্যে পূর্ব্বে ইছাপুর সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল তৎপরে খাঁটুরা। এক্ষণে গোবরডাঙ্গা সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ; এবং এখানে কুশদহ সমাজের সমাজপতির বাসস্থান। আমরা ক্রমে ক্রমে এই সকল স্থানের ইতিবৃত্ত লিখিতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ—

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ভূতপূর্ব্ব "প্রভা" সম্পাদক।

অধ্যাত্ম যোগ।

যাঁহারা সাধক এবং যোগতত্ত্বজ্ঞ তাঁহাদের জন্য এ প্রবন্ধ নহে। এক শ্রেণীর মানবের মধ্যে দেখা যায়, যাঁহারা ধর্ম্মের দুই চারিটী তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করেন, কোন কোন সময় ইহাদের মুখে যোগের কথাও শোনা যায়, কিন্তু তাহা প্রায় বাহ্যিক কোন না কোন প্রকার যোগের কথা। তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া কতকগুলি ভ্রান্ত মত লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন। প্রধানতঃ, সেই সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মানুষের অভিমান, অহঙ্কারাদি দেখিয়া সহজেই সকলে বিশ্বাস করেন, আমিত্ব দূর না হইলে কেহ ঈশ্বরের সহিত যোগে যুক্ত হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে একথা সত্য। যোগ শব্দের সাধারণ অর্থ দুই বস্তুর মিলন। অতএব অধ্যাত্মযোগ কাহাকে বলে? জ্ঞানে জ্ঞানে, প্রেমে প্রেমে, ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিলনই অধ্যাত্ম যোগ। জীবাত্মার মধ্যে জ্ঞান আছে, কিন্তু সেই জ্ঞান যখন অজ্ঞানতায় পরিণত হয় অর্থাৎ পরমাত্মা ঈশ্বরই জীবের সর্ব্বস্ব এই তত্ত্ব ভুলিয়া জীব যখন এই স্থূল দেহাদিকেই আমি ও সংসারকেই আমার মনে করে, তাহার নামই অজ্ঞানতা। মানুষ যখন সেই অজ্ঞানতা পরিহার করিয়া ঈশ্বরকেই

আশ্রয় করে, তখন জ্ঞান যোগের আরম্ভ হয়। এইরূপে হৃদয়ের সমগ্র অনুরাগ আসক্তি, সদ্ভাব সকল ঈশ্বরে অর্পণ করার নাম প্রেমযোগ বা ভক্তিযোগ। স্বসুখ বাসনা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছায় সুখী হওয়া, তাঁহার ন্যায় মঙ্গল সঙ্কল্প হইয়া, তাঁহার ইচ্ছা পালনই ইচ্ছাযোগ। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ইচ্ছাযোগে যুক্ত হইয়া, ঈশ্বরে ও জীবে একত্ব ভাব উপস্থিত হয়। অতএব, ইহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। ইহার মধ্যে কোন জড় ভাব নাই। তবে যাঁহারা মনে করেন, একেবারেই অধ্যাত্ম যোগ হয় না এজন্য আগে ক্রিয়া যোগ দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া লইতে হয়। এ সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বলিবার নাই, তবে সংক্ষেপে এইমাত্র বলি, যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাকে প্রথম হইতেই যদি আদর না করা হয়, তবে বাহ্যপ্রিয় মানবকে ঐ বহিরঙ্গে আবদ্ধ থাকিতেই দেখা যায়। "জ্ঞানাৎ পরতরং নহি" জ্ঞানই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের পথ ধরিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত পথ। কোনরূপ বাহ্যিক বিষয়ের দ্বারা মানবাত্মার মুক্তি হইতে পারে না। এই জন্য, অধ্যাত্ম যোগকেই যোগ বলা যায়।

প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞানতাই আমিত্ব। আমি ধনী, আমি মানী, আমি জ্ঞানী, আমি বুদ্ধিমান এইরূপে যত আমিকে স্বতন্ত্র একটা কিছুর অভিমান করি, তাহাই আমিত্ব। এই আমিত্ব হইতেই "আমি, আমার" স্বার্থভাবে পরিচালিত হইয়া মানুষ সকল অপকর্ম্ম করে, কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানেই আমিত্ব বিনাশ হয়। মানুষের যখন প্রকৃতই দিব্য জ্ঞান হয়, তখন সে বুঝিতে পারে, ঈশ্বর ছাড়া আমি শূন্য অন্ধকার মাত্র। আমির মূল সকলই ঈশ্বর। এই জ্ঞান হইলে যে পরম ভাবানন্দ উপস্থিত হয়, তাহাতে তখন আর কাহাকে বলিয়া দিতে হয় না যে তুমি আমিত্ব পরিত্যাগ কর। জ্ঞানী ব্যক্তি পরমাত্মারূপ সাগরে আত্মসমর্পণ করিয়া সকল উদ্‌বেগ, উত্তেজনা, মোহ এবং কামনার জ্বালা হইতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। যেমন জলের মীন জলেই সঞ্জীবিত, তদ্রূপ জীব-স্বরূপ পরম-স্বরূপে যুক্ত হইয়াই পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন ; ইহাই অধ্যাত্ম যোগাবস্থা।

যোগ দুই বস্তুর মিলন। এক বস্তু আর এক বস্তুতে মিলিল, এজন্য একের অস্তিত্ব লোপ হইল তাহা নহে। পরমাত্মার সহিত জ্ঞানে জ্ঞানে, ভাবে ভাবে, ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিলনে জীবের পূর্ব্বের মলিন স্বরূপ অজ্ঞানতা, অপ্রেম, কুইচ্ছার লোপ হইল, এখন সেখানে জ্ঞান, প্রেম বা ভক্তি ও শুভ ইচ্ছার বিদ্যমানতা

রহিল সুতরাং নির্ব্বাণ মুক্তি অর্থে বিনাশ নহে। পরমাত্মা অনন্ত স্বরূপ, পূর্ণ এক অদ্বিতীয়। পরমাত্মা পরমেশ্বরে কোটী কোটী জীবাত্মা মিশিয়া গেলেও পরমাত্মার কিছুই বৃদ্ধি হয় না, আর কোটী কোটী সৃষ্টি হইলেও তাঁহার ওজন কমে না। সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশিয়া গেলে জীবাত্মার অস্তিত্ব লোপ হইল বলাও যা আর জীবাত্মার ধ্বংস স্বীকার করাও তাহা। জীবাত্মা যদি এক সময় ধ্বংস হইবে, তবে এত জ্ঞান, প্রেম, শুভ ইচ্ছা সকলইত মিথ্যা বস্তু। যদি বলা যায় জ্ঞান অবস্তু, জ্ঞানেরও ধ্বংস হয় তাহা হইলে, আর কোন সত্যই থাকে না, এত ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্ম সাধন, সৃষ্টি ও স্রষ্টা পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়। মানব অন্তরে যে সত্যের আদর, সত্যের বল দেখা যায়, তাহা হইতেই পারিত না, যদি জ্ঞান সত্য বস্তু না হইত। অতএব জ্ঞানের ধ্বংস নাই; জ্ঞান বস্তুই সত্যবস্তু, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণ জ্ঞানময়। জীবাত্মা, পরমাত্মার সেই অনন্তজ্ঞান অনন্তকাল লাভ ও উপভোগ করিবে। ভগবৎ জ্ঞানী, কামনা শূন্য পূর্ণ ভাবাপন্ন।

এখন শেষ কথা এই, যোগী যখন যোগসাধন করেন তখন তাঁহার আত্মজ্ঞান থাকে, এ আত্মজ্ঞান অভিমানের আমি নহে। যে আমি কোন অবস্থায় যায় না, এ সেই মৌলিক আমি। যোগের প্রথম অবস্থা ও মধ্যম অবস্থায় আত্মবোধ থাকে। তন্ময় অবস্থায় থাকে না কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, যে তখনও যোগ করিতেছে যে সে যায় না, সে লুপ্ত হইয়া আনন্দ স্বরূপে বিদ্যমান থাকে। যদি বল সে আনন্দ ভগবানই ভোগ করেন, তাহা বলা যায় না, আনন্দ স্বরূপ ও আনন্দ ভোক্তা, দুই না হইলে ভোগ হয় না। বিশেষতঃ যোগীর যোগ কেন? স্বরূপে স্বরূপ মিলন। এই জন্য ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন "চিনি হতে চাই না মা গো চিনি খেতে চাই"। প্রকৃতাবস্থা জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলিয়া আনন্দ ভোগ করে। সাধারণ অবস্থায়ও দেখা যায় মানুষের যদি কখন অত্যন্ত শোক দুঃখ বা আনন্দ হর্ষ উপস্থিত হয় তবে সেও কিছুক্ষণের জন্য "আত্মভোলা" হইয়া যায়, তাহা বলিয়া সে কি থাকে না? তাহা নহে। তদ্রূপ যোগী যোগে তন্ময় হইলেও যোগীর লোপ হয় না।

মানুষ আমিত্বের দৌরাত্ম্য দেখিয়া, তার গোড়া পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিতে

চাহে। আমিত্ব বিনাশ সম্বন্ধে এক সময় কোন মহাত্মা বলিয়াছিলেন, "আমাদের ইন্দ্রিয় সকলের যখন কার্য্য হয় তখন তাহাদের বিস্মৃতিতেই হয়, অর্থাৎ "চক্ষু" "চক্ষু" এইরূপ স্মরণ করিয়া দর্শন কার্য্য হয় না, "কর্ণ" "কর্ণ" এইরূপ ভাবিয়াও শ্রবণ করিতে হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল স্মরণে আসে তখনই যখন তাহাদের পীড়া হয়। চক্ষে যদি বেদনা হয় চক্ষুর বিষয় সর্ব্বদা স্মরণে পড়িবে, তদ্রূপ আমাদের আমিত্বের পীড়া হইলেই তাহাদের কথা স্মরণ হয়। আমি ধনী আমি মানী এই অভিমান রূপ পীড়াই আমিত্ব। যিনি ধনী মানী হইয়াও তিনি নিজে তাহা মনে না করেন, তবে নিরাভিমানের কি সুন্দর ক্রিয়াই না হইতে থাকে।"

মানুষ যদি বুঝিতে পারে যে আমি বা আমার এই জীবন মিথ্যা নহে, কিন্তু ভগবানের স্বরূপেই আমার স্বরূপ, এবং অধ্যাত্ম যোগ একটা ভয়ানক ব্যাপারও নহে, উহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, তবে তার ধর্ম্মের জন্য কত আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ হইতে পারে। কিন্তু হায়! মানুষ ভ্রান্ত মতের ঘোরে প্রকৃত জ্ঞান বিশ্বাসের পথে প্রকাণ্ড প্রাচীর দিয়া কি যন্ত্রনাই ভোগ করিতেছে। ভগবান জীবের মঙ্গল করুন।

জীব-ইচ্ছা ও জীবনাথের ইচ্ছা।

"এই তত্ত্ব নিহিত আছয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে"।

দুটি ইচ্ছা সৃষ্টি মাঝে করিতেছে কার্য্য,—
ব্রহ্মেচ্ছা জীবেচ্ছা উভয়ের গতি ধার্য্য
হয় তত্ত্বক্ষেত্রে, যথা ইচ্ছাময় যিনি
হন সর্ব্বে-সর্ব্বা,—সর্ব্ব মূলাধার তিনি।
দুই ইচ্ছা অহরহ কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে
করে কার্য্য নিরবধি সাজি নানা সাজে।

জানিবারে সেই তত্ত্ব প্রাণ মম চায়
ব্যাকুল হইয়া প্রাণ-ময় পানে ধায়।
ভাবিতে ভাবিতে আর চলিতে চলিতে
পরাণ আকুল হল না পারি বুঝিতে ;
করুণা হইল তাঁর যিনি কৃপাময়,
ভাতিল সে তত্ত্ব হৃদে গূঢ় অতিশয়।
বর্ণন না হয় তার, তথাপি বলিব,
তাঁর মূল ইচ্ছাধরি জীবেচ্ছা ভনিব।
কথাটা প্রকৃত এই "ইচ্ছা ভবেশের,"
তাহাতে আকাঙ্ক্ষা রূপে হৃদে মানবের
বহে বেগ,—উঠে কত সাধের তরঙ্গ
না হয় গণন তার সৃষ্টির এ রঙ্গ।
জীব-ইচ্ছা বিভু-ইচ্ছা যবে মিশে যায়
শুভ কর্ম্ম যত কিছু তাহাতে জন্মায়।
মানুষের ইচ্ছা দেব-ভাব প্রাপ্ত হলে
স্বার্থ পরতার বল যায় কোথা চলে।
তখন সকল কার্য্য হয় সুধাময়
মন প্রাণে অহরহ হয় সুখোদয়।

কি ভৌতিক কি আত্মিক কার্য্য দেখি যত,
প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম কর্ম্ম কত কত,
বিভু-ইচ্ছা মূলে সে সবার উৎপত্তি
সম্বন্ধ সূত্রেতে, যথা জীবের নিয়তি
যোযিত স্বকর্ম্মে, যার ফল সম্ভোগিয়া
চলেছে অনন্ত পথে জ্ঞান উপার্জ্জিয়া
লভিবারে অচ্যুত আনন্দ ব্রহ্মপুরে—
আসিলে যথায়, যায় মোহমায়া দূরে।
স্বরতি বিরতি হয়ে আত্মরতি আনে,
ব্রহ্ম ইচ্ছা হেরিয়ে সাধক সর্ব্বস্থানে,

হন আপ্তকাম জীবনাথে ইচ্ছাবরি
দেখেন মঙ্গলে বিশ্ব আছে পূর্ণ করি ;—
ব্রহ্মময় সব প্রতিভাত আত্মজ্ঞানে।
"এই তত্ত্ব নিহিত আছয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে"।

পরিব্রাজক

মাধ্যাকর্ষণ।

এই বিপুল বিশ্বের যে দিকে দৃক্‌পাত করি, সেই দিকেই আমরা পরম-পিতা পরমেশ্বরের অপার করুণা রাশি দেখিতে পাই। তিনি মনুষ্যকে সকলই দিয়াছেন ;—মস্তকে বুদ্ধি, হৃদয়ে উৎসাহ, চারিদিকে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার কিছুরই তাহার অভাব নাই ;—আবিষ্কার করিয়া লইতে পারিলেই হইল। জগদীশ্বরের বিশ্ব পুস্তক অতীব প্রকাণ্ড ; সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ ত দূরের কথা, কেহ জীবনে ইহার এক পৃষ্ঠার অধিক পাঠ করিয়াছে কিনা সন্দেহ ! কিন্তু প্রতিভাশালী মনুষ্য ঐ একপৃষ্ঠা হইতেই কত নব নব তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়াছেন। এবং তদ্দ্বারা কত কুসংস্কার দূরীকৃত করিয়াছেন। অর্কমণ্ডলের আলোক দর্শনে রাত্রির বিভীষিকাচয়ের ন্যায়, জ্ঞানালোকেও সংসারের কুসংস্কার পলায়ন করে। পূর্ব্বে অনেকে আলেয়া দর্শনে ভয়ে অভিভূত হইত ; কত নির্ব্বোধ প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছে ; কিন্তু তাহাদেরই বংশধরগণ এখন তাহা লইয়া ক্রীড়া করে !

পরমেশ্বরের এই বিশ্ব পুস্তকের নাম বিজ্ঞান। একজন ইংরাজ লেখক সত্যই বলিয়াছেন, "God's Book, which is the Universe, and the reading of His Book, which is Science, can do you nothing but good, and can teach you nothing but truth and wisdom." বিশ্বই ঈশ্বরের পুস্তক, এবং ইহা পাঠই বিজ্ঞান ; ইহা তোমার মঙ্গল ব্যতীত কিছুই করিবে না এবং সত্য ও জ্ঞান ব্যতীত কিছুই শিখাইবে না। এই পুস্তকের প্রতি যিনি একবার মাত্র আকৃষ্ট হ'ন, তিনি আর উহা ছাড়িতে

পারেন না। কিন্তু ইহার প্রাথমিক আলোচনা কিঞ্চিৎ কঠিন। চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি পদার্থ প্রত্যক্ষ করি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি না। তাই ভূদেব বাবু বলিয়াছেন, "যেমন অপরিজ্ঞাত এবং বিশৃঙ্খল রূপে সম্বন্ধ কোন পুস্তক হস্তে পড়িলে তাহা খুলিয়া তাহার কোথায় আদি কোথায় অন্ত কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া মৌনভাবে এবং ম্লান মুখে সেই পুস্তক রাখিয়া দিতে হয়, পরিদৃশ্যমান এই প্রকৃতি পুস্তকের প্রতি হঠাৎ অবলোকন করিলেও ঠিক সেইরূপ ঘটে। * * কিন্তু এই জগদ্রূপ গ্রন্থ মনুষ্যকৃত কোন গ্রন্থ অপেক্ষা যে বিশৃঙ্খল হইবে এমত সম্ভব নহে। ইহার প্রাকৃতিক বিভাগ অবশ্য থাকিবেই থাকিবে।" অনেক মহাত্মা কিন্তু ইহার দুই একটী সূত্র ধরাইয়া দিয়াছেন; এ স্থলে একটী সূত্রই আমাদের আলোচ্য।

সার আইস্যাক্ নিউটন একটী আতা ফল বৃক্ষ হইতে পতিত হইতে দেখিয়া যাহা আবিষ্কার করেন, তাহাই মাধ্যাকর্ষণ। হায়, ক্ষুদ্র ইংলণ্ডে এরূপ কত শত নিউটন বর্ত্তমান আছেন! কিন্তু এই সুবৃহৎ "সুজলা সুফলা শ্যামলা" বঙ্গ-ভূমিতে একমাত্র তারহীন টেলিগ্রাফ আবিষ্কর্ত্তা;—আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। ইহা কি কম পরিতাপের কথা।

যাহা হউক, নিউটন আবিষ্কার করিলেন যে, জগতের যাবতীয় বস্তুরই পরস্পরের প্রতি টান আছে। ইহাকেই মাধ্যাকর্ষণ কহে। যে দ্রব্য যত বড় তাহার আকর্ষনী শক্তিও তত অধিক। আবার ভূপৃষ্ঠস্থ সমস্ত বস্তুর অপেক্ষা পৃথিবী বৃহত্তম সুতরাং ইহার মাধ্যাকর্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। (১) এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সকল দ্রব্যই কেন পরস্পরের প্রতি ধাবিত হয় না? তাহার উত্তরে নিম্ন লিখিত উদাহরণটী যথেষ্ট মনে করি। মনে করুন, একস্থানে একটী গরু বাঁধা আছে; ইহার কিছু দূরে কচি ঘাস অথবা অন্য কোন দ্রব্য আপনি লইয়া গেলেন। গরুটী নিশ্চয়ই আপনার দিকে আসিতে চেষ্টা করিবে কিন্তু সমর্থ হইবে না; কারণ ঘাসেরও আকর্ষণ আছে বন্ধনেরও আছে। ইহাদের মধ্যে

(১) যে শক্তি প্রত্যেক বস্তুকে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করে, তাহাই মাধ্যাকর্ষণ। ইংরাজীতে ইহাকে Gravity কহে। এবং বস্তু সকলের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণকে Gravitation বলে। বাঙ্গালায় কিন্তু দু'টাই মাধ্যাকর্ষণ নামে অভিহিত।

বন্ধনের আকর্ষনী শক্তি অধিক ; সুতরাং সে কি প্রকারে বন্ধন ছিন্ন করিবে ? তবে চুম্বকের কথা স্বতন্ত্র।

সুতরাং দেখা যাইতেছে,—প্রত্যেক দ্রব্যই পৃথিব্যাভিমুখে আকর্ষিত। এক্ষণে যদি একখানি প্রস্তর ও একখানি কাগজ একসঙ্গে কোন উচ্চ স্থান হইতে পড়িতে আরম্ভ করে ; তবে কোন্‌খানি অগ্রে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবে ? সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন প্রস্তর খণ্ডই অগ্রে ভূপতিত হইবে। তবে কি বস্তু বিশেষের সহিত মাধ্যাকর্ষণের হ্রাস বৃদ্ধি হয় ? না, তাহা নহে। কি ছোট, কি বড়, কি গুরু, কি লঘু সকল বস্তুই একই আকর্ষণে আকর্ষিত। গিনি ও পালক (Guinea feather) নামে কাচের একপ্রকার নল আছে। তন্মধ্যে একটী গিনি ও একটী পালক আছে, উহা 'বায়ুহীন-করণ-যন্ত্র' (Air pump) দ্বারা বায়ু শূন্য। নলটী উল্টাইলেই গিনি এবং পালক এক সঙ্গে অপর প্রান্তে সমুপস্থিত হয়। সুতরাং বুঝাইতেছে যে, বায়ু দ্বারাই বস্তু সকল অগ্র পশ্চাৎ পতিত হয়।

কিন্তু পল্লীগ্রামে শতাধিক মুদ্রাব্যয়ে ঐরূপ একটী যন্ত্র ক্রয় করা সকলের সাধ্য নহে ; সুতরাং একটী সহজ উপায় লিখিত হইতেছে। একটী পয়সার সমান করিয়া এক খণ্ড কাগজ কটিয়া লউন, এবং তাহার উপর পৃষ্ঠে সংলগ্ন করিয়া ফেলিয়া দিন, দেখিবেন পয়সা ও কাগজ একসঙ্গে ভূমি স্পর্শ করিবে। কিন্তু সাবধান যেন কাগজ পয়সার উপর উত্তমরূপে সংলগ্ন হয়—ফাঁক না থাকে।

গবেষণা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, প্রতি সেকেণ্ডে ৩২·১৯১ ফিট বা ৯৮১ ১৭ সেন্টিমিটার (centimetre) হিসাবে বস্তু সকল অবতরণ করে। স্মরণ রাখিবেন কোন বস্তুর একটী নির্দ্দিষ্ট উচ্চ পর্য্যন্ত উঠিতে যত সময় লাগে নামিতে ও ঠিক তত সময় লাগিবে। এ স্থলে দেখা কর্ত্তব্য যে, যখন দ্রব্যটী উঠিতে থাকে, তখন তাহা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিদ্বারা আকর্ষিত হইলেও, মৎপ্রদত্ত বলের দ্বারা ঊর্দ্ধে নীত হইতে থাকে এবং উহার শেষ হইবামাত্রই পড়িতে আরম্ভ করে। তখন উহার কিছুই পূর্ব্ব বেগ (২) থাকে না—মাধ্যাকর্ষণের বলে নামিতে

---

(২) যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মনুষ্য কিম্বা যন্ত্রের নিকট হইতে দ্রব্যটি যে বেগ প্রাপ্ত হয় তাহার নাম 'পূর্ব্ববেগ'। ইংরাজীতে ইহাকে Initial velocity কহে।

থাকে, এবং যত অধিক দূর নামিতে থাকে তত বেশী বল পায় ও সর্ব্বশেষে যখন উহা ভূমিস্পর্শ করে তখন উহার বেগ 'পূর্ব্ববেগের সহিত সমান' হয়। আবার; যখন ইহা উঠিয়াছিল তখন মাধ্যাকর্ষণকে পরাস্ত করিতে হইয়াছিল এবং নামিবার সময় যেমন 'পূর্ব্ববেগ' কিছুই ছিল না কিন্তু 'পূর্ব্ববেগের' মাধ্যাকর্ষণের সহিত যুদ্ধ করিতে হয় নাই! পরন্তু ঠিক তদ্রূপ সাহায্য মাধ্যাকর্ষণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং উঠা ও নামা উভয়েরই সময় সমান। এ বিষয়ে যাঁহার সন্দেহ হইবে তিনি পরীক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু বস্তুটী কৌশলে 'লম্বভাবে' ছোড়া উচিত।

পরীক্ষার নিমিত্ত নিম্নলিখিত কয়েকটি নিয়ম বিশেষ কার্য্যকরী হইবে। উঠিবার সময় = পূর্ব্ববেগ ÷ মাধ্যাকর্ষণ। উচ্চতা = (পূর্ব্ববেগ × পূর্ব্ববেগ) ÷ (২ × মাধ্যাকর্ষণ)! পূর্ব্ববেগ = ½ × মাধ্যাকর্ষণ × সময়। উঠা ও নামার সমস্ত সময় = (২ × পূর্ব্ববেগ) ÷ মাধ্যাকর্ষণ। (১)

বলাবাহুল্য, যে উল্লিখিত নিয়মগুলি পরীক্ষার্থী ও রীতিমত শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রয়োজন। যদি একটীমাত্র পাঠকও প্রমাণ প্রার্থনা করেন, তবে নিজেকে ধন্য মনে করিব; আর মনে করিব পল্লীগ্রামেও বিজ্ঞানচর্চ্চার ক্রমবিকাশ আরম্ভ হইয়াছে।

এই কঠিন বিষয়, অতিসংক্ষেপে ও সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন। তাঁহাদের ভাল লাগিলে আগামী বারে নিউটনের গতির তিনটী নিয়মের বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

—নরেন্দ্রনাথ রক্ষিত।

---

(১) For proof See, W. Briggs and G. H. Bryan's 'Mechanics', or Loney's 'Statics and Dynamics, or any other book of the kind.

জাতীয় সঙ্গীত।

(কীর্ত্তন)

কাণে কাণে প্রাণে প্রাণে মায়ের নাম আজ কে শুনালে।
সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে আটকোটী প্রাণ কে মাতালে।
বন্দে মাতরম্ মাতরম্, উঠ্‌ছে ধ্বনি কি মধুরম্,
মরতের জয়ধ্বনি স্বর্গের আসন কাঁপাইল।
শক্তি খেলে মায়ের নামে, পাষাণ গলে মায়ের গানে ;
ভক্তি-রস-লীলা এবে, নবীন বেশে দেখা দিল।
মরা প্রাণে ধরে আগুন, প্রাণ পেয়ে প্রাণ জ্বল্‌ছে দ্বিগুণ ;
যা ভাবি নাই, যা শুনি নাই, সে আগুণ আজ কে জ্বালাইল।

বেহাগ মিশ্র—কাওয়ালী।

এখন আর দেরী নয়, ধরগো তোরা হাতে হাতে ধরগো !
আজ আপন পথে ফির্‌তে হবে সাম্‌নে মিলন স্বর্গ।
ওরে ঐ উঠেছে শঙ্খ বেজে, খুলিল দুয়ার মন্দিরে যে,
লগ্ন বয়ে যায় পাছে ভাই, কোথায় পূজার অর্ঘ্য !
এখন যার যা কিছু আছে ঘরে, আন্ আপনার থালা ভরে,
আন্, আরতির প্রদীপ জ্বেলে আন্‌রে বলির খড়্গ !
আজ নিতেও হবে, দিতেও হবে, দেরী কেন করিস্ তবে,
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে, মর্‌তে হয় ত মর্‌গো !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিমালয় ভ্রমণ। *

কোন সময় নানকচরিত পাঠ করিয়া, তাঁহার স্বর্গীয় জীবন-প্রভায় আমার মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়। তৎপরে অমৃতসরের গুরুদরবারার অবিশ্রান্ত ভজনাদির বিষয় শুনিয়া প্রাণে এই এক গূঢ় আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল যে, একবার অমৃতসর (অর্থাৎ অমৃত সরবর) দেখিব। আর এক সময় হিমালয় ও ভারতের প্রাচীন তীর্থ হরিদ্বার, ঋষিকেশ, এবং গোমুখী গঙ্গার বর্ণনা সকল শুনিয়া তদ্দর্শন পিপাসা বলবতী হয়, কিন্তু এতদিন প্রাণের ভাব প্রাণেই পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। বর্ত্তমানে আমার পক্ষে একটী সুযোগ হইল, সংসারে আমার একমাত্র স্ত্রী, তিনি খুলনার জনৈক বন্ধুর স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায়, তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন আমার আর কোন সাংসারিক দায়ীত্ব রহিল না। বহুদিনের গূঢ় উদাসভাব যেন সময় পাইয়া উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তখন মনে হইল এই সময় সাধারণ ভাবে অতিবাহিত করা উচিত নহে, জীবনের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার এই সুসময়। "যাই একবার নিঃসঙ্গভাবে, উদাসপ্রাণে, যথাইচ্ছা তথা, কিন্তু

* আমার হিমালয় ভ্রমণবৃত্তান্ত মুদ্রিত করিব এরূপ সঙ্কল্প ছিল না, এজন্য দৈনিক পুস্তকে (ডায়েরীতে) অতি সংক্ষেপে যা কিছু লেখা ছিল। এই দীর্ঘ ভ্রমণে আমার শরীর মন ও আত্মার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। মনের বল, বিশ্বাস নির্ভরের প্রসার এবং আত্মার আনন্দ, অধিকন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি যথেষ্টই লাভ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে যখন আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের সহিত ঐ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-প্রসঙ্গ করিতাম, তখনও সেই আনন্দ ও উৎসাহের ভাব প্রকাশিত হইত। যাঁহারা তাহা শুনিতেন কিছুক্ষণের জন্য আত্মবিস্মৃতের ন্যায় হইয়া শুনিতেন। একদা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার জনৈক ধর্ম্মবন্ধু আমাকে বলিলেন, "আপনি এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত "কুশদহ" পত্রিকায় প্রকাশ করুন।" কথাটা আমার মনে একটু লাগিল! ভাবিতে ভাবিতে পরে, দৈনিক পুস্তক দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল এত সংক্ষিপ্ত লেখা কিরূপে প্রকাশ করা যায়, আর ইহাকে যদি একটু বিস্তার করা যায়, তাহাতেও ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে, সুতরাং ঐ সংক্ষিপ্ত ভাব রক্ষা করিয়া যথাসম্ভব ঘটনা সকল প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইল। অগত্যা এ প্রবন্ধে ভাষার ত্রুটী সত্ত্বেও ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হইল। পাঠকপাঠিকাগণ ইহাকে ডায়েরী মনে করিয়া পাঠ করিবেন।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু।

এ নহে বাতুলের খেলা।" চল মন চল সেই হিমালয়-প্রবাহিতা গঙ্গার দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ জুড়াইব, সেখানে জ্ঞানযোগী শঙ্কর-পন্থি পরমহংসদিগকে দর্শন করিব; আর চল, পঞ্জাবক্ষেত্রে নানক-তীর্থে চল। আর আর জনপদ সকল দর্শনে ভগবানের মহিমা ও লোকচরিত অবলোকন কর।

প্রথমত মনে হইল দূরদেশে একেবারে নিঃসম্বলে যাওয়া উচিত নহে, অতএব কিছু অর্থ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। কয়েকদিনের মধ্যে যত রকম উপায় ছিল দেখা গেল, কিন্তু, "বিধাতার কলম রদ করে কে" ৫৲টী টাকাও সংগ্রহ হইল না। তখন মনে হইল তবে কি এ সকল আমার কল্পনা মাত্র। মন বড় বিষাদযুক্ত হইল। যেন ঘন মেঘে প্রাণ ঢাকিল। ইতিপুর্ব্বে বন্ধুবর শরচ্চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত স্বীকার করিয়াছিলাম তম্‌লুক যাইব, সুতরাং কয়েকদিনের জন্য তথায় চলিয়া গেলাম। সেখানে পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুদিগের নিকট ভগবানের নাম গান করিলাম সৎপ্রসঙ্গও হইল। তৎপরে কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম কিন্তু এখন পর্য্যন্ত অর্থ সংগ্রহের কোন উপায় প্রকাশ হইল না। অন্ধকার ঘনীভূত হইলে তাহা অধিকক্ষণ থাকে না। অন্তরে আলোক পাইলাম, "নিঃসম্বলে চলিয়া যাও, সাংসারিক বুদ্ধি কেন, আমি সর্ব্বত্র আছি।" তখন মনে একটী সাহসের ভাব আসিল, সমস্ত ঠিক হইয়া গেল।

পথে,—চুঁচড়া, হুগ্‌লি, বোলপুর।

৫ই আশ্বিন শুক্রবার (২১ সেপ্টেম্বর) ১৩১৩ সাল। বেলা ২টার পর কলিকাতা হইতে একাকী নিঃসঙ্গভাবে ২৲ টাকা কয়েক আনা মাত্র সম্বলে যাত্রা করিলাম। শিয়ালদহ ষ্টেসনে ট্রেণে উঠিয়া আগড়পাড়া জনৈক আত্মীয়ার সহিত সাক্ষাৎ করায়, নিঃসম্বলে দূরদেশ ভ্রমণে চলিয়াছি দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ পাথেয় দিলেন। ইহাতে কিছু ভগবানের ঈঙ্গিত বোঝা গেল।

আগড়পাড়া হইতে কাকনাড়ায় নামিয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া সন্ধ্যার সময় চুঁচড়ায় পৌঁছিলাম। তখন অল্প অল্প অন্ধকার হইয়াছে। খুঁজিতে খুঁজিতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সাহার সহিত সাক্ষাত হইল। আমি বলিলাম শ্রদ্ধেয় বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ প্রচারক মহাশয় যিনি প্রতি শনিবারে এখানে ব্রহ্ম-মন্দিরের উপাসনার কার্য্য করিতে আসেন, তিনি কল্যও আসিবেন। আমাকে

এখানে একদিন থাকিয়া আপনাদের সহিত আলাপ ও ভগবানের নাম করিতে বলিয়াছিলেন এজন্য আমি আজ এখানে আসিলাম। তখন তিনি আমাকে শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সাহার বাড়ী লইয়া গিয়া রাত্রিতে তথায় থাকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিশোরী বাবুর সদর ঘরে বসিয়া গোপাল বাবু ও কিশোরী বাবুর সহিত আমার কিছু সৎপ্রসঙ্গ হইল, এবং প্রার্থনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত করিলাম। তাহাতে তাঁহারা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। রাত্রিতে কিশোরী বাবু, ঘরের তৈরী আহারীয় আনিয়া দিলেন, আহার করিয়া সেই ঘরেই শয়ন করিলাম।

৬ই আশ্বিন শনিবার প্রত্যূষে উঠিয়া চুঁচড়ার পল্লীতে বাড়ী বাড়ী নামগান করিলাম। বেলা ৯ কি ৯৷৷০ টার সময় হুগলি বাবুগঞ্জে শ্রীযুক্ত রাধারমণ সিংহের বাসায় গেলাম। অনেক দিনের পর পুরাতন ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত রাধারমণ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমরা উভয়েই বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি তখন অসুস্থ শরীরে সপরিবারে অনেকগুলি সন্তান সহিত কষ্টে সৃষ্টে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তথাপি আমাকে যথেষ্ট যত্ন আদর করিলেন। তাঁহার বাসায় উপাসনা ও আহারাদি হইল।

সন্ধ্যার সময় চুঁচড়া ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপাসনায় যোগ দিলাম, বৈকুণ্ঠ বাবু উপাসনা করিলেন, আমি সঙ্গীত করিলাম। রাত্রিতে আমি রাধারমণ বাবুর বাসায় রহিলাম।

৭ই আশ্বিন রবিবার। প্রাতে গঙ্গায় স্নানাদি করিয়া হুগলিঘাট ষ্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে আসিলাম। হুগলিঘাট ষ্টেশন পর্য্যন্ত রাধারমণ বাবুর দুইটী পুত্র আমার সঙ্গে আসিল, বালকের সরল মুখচ্ছবি, দৃষ্টির বহির্ভূত করিতে মমতা হইতে লাগিল। ট্রেণে কয়েকটী লোকের সহিত ধর্ম্মালাপ ও একটী সঙ্গীত করি। বেলা ২টার পর বোলপুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে আসিলাম। আমার নিকট একখানি রেলওয়ে-সময়-নিরূপক পুস্তক (টাইম টেব্‌ল) ছিল, কিন্তু ষ্টেশন হইতে শান্তিনিকেতন যে অনেকদূরে তাহা না জানিতে পারায় অসময়ে পৌঁছিলাম। এমন সময় অন্নাহারের আশা ছিল না, তথাপি অল্পক্ষণের মধ্যে "গরম গরম ভাতে ভাত" পরিষ্কার অন্ন পাওয়া গেল। কুশদহ অন্তর্গত জসাইকাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় ওখানকার "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" নামক বোর্ডিং স্কুলের একজন শিক্ষক, তাঁহার সহিত আলাপ হইল। তিনি আমাকে বিশেষ যত্ন করিলেন।

৮ই সোমবার। শান্তিনিকেতনের উপাসনালয়, কাঁচ এবং শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত স্বচ্ছ ও সুন্দর; মানব অন্তরে আধ্যাত্মিক উপাসনালয় যে প্রকার স্বচ্ছ ও সুন্দর, ইহাও যেন সেই আদর্শে গঠিত। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ক্ষেত্র ধূ ধূ করিতেছে, তাহার মধ্যে শান্তিনিকেতন, শান্ত-পাদপ শ্রেণী আবৃত; আমলকী হরিতকী প্রভৃতি বৃক্ষরাজী প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের তপোবনের স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিতেছে। প্রতিদিন উপাসনা মন্দিরে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনা হয়, উপাসনা আরম্ভের পূর্ব্বে দামামা শঙ্খ, ঘণ্টা ধ্বনি হয়। একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত উপাসনা পাঠ করিবার জন্য ও একজন সুকণ্ঠ গায়ক (তানপুরা যোগে) ব্রহ্ম-সঙ্গীত করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন। আমি উপাসনায় যথাসাধ্য যোগ দিলাম। পরে অনেকক্ষণ ঐ স্থানে বসিয়া ভগবৎ চিন্তায় শান্তিভোগ করিতে চেষ্টা করিলাম। মহর্ষিদেবের পুত্র শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও তাঁহার পুত্র দীপেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাত ও অল্পকিছু আলাপ হইল। দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কোন কষ্ট হইতেছে না ত?" আরো বলিলেন "মহর্ষিদেবের ইচ্ছা ছিল এই শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্মগণ আসিয়া সাধন ভজন করিবেন, তিনি তাহার জন্য গৃহ এবং অন্যান্য সকল ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু সময়ে দেখা গেল, সাধন ভজন জন্য প্রায় কেহ আসেন না, এক আধ বেলা বেড়াইবার জন্য কিম্বা স্বাস্থ্যের জন্য কেহ কেহ আসেন, সুতরাং তাহার জন্য নিয়ত আয়োজন রাখা বৃথা হয়। এক্ষণে যাঁহারা আসেন স্কুল বোর্ডিং এর মধ্যে আহার করিতে হয়।" তৎপরে রবীন্দ্রবাবু "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" নামে এখানে যে একটী আদর্শ বালক-বিদ্যালয় ও বোর্ডিং (আশ্রম) করিয়াছেন, তাহার নিয়মাদি খুব ভালই বোধ হইল। আমি যখন এখানে গেলাম তখন পূজার ছুটী হইয়াছে, স্কুল বন্ধ, বোর্ডিংএর ৫।৭টী বালক কেবল দেখিলাম। আমি যে অল্প সময় ওখানে ছিলাম তাহাতে দেখিলাম, প্রাতঃকালে বালকগণ ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের পট্টবসন পরিধানপূর্ব্বক প্রত্যেকে এক একখানি আসন লইয়া এক এক বৃক্ষমূলে পূর্ব্বাস্যে বসিয়া কিছুক্ষণ ধ্যান অভ্যাস করেন। ঋষি বালকগণের ন্যায় এই দৃশ্য বড়ই আনন্দপ্রদ। তৎপরে

বৃক্ষলতাপুষ্প বৃক্ষাদির সেবা করিতে হয়, তাহাতে শারীরিক ব্যায়ামের কার্য্যও হয়। শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে শুনিলাম, স্কুলের মত বেঞ্চ চেয়ার সজ্জিত গৃহে ১০টা হইতে বেলা ৪টা পর্য্যন্ত ক্লাস হয় না। কিন্তু এক এক শিক্ষকের নিকট কয়েকটী করিয়া ছাত্র, দেশীয়ভাবে চৌকির উপর কম্বলে বসিয়া দুইবেলা পাঠাভ্যাস করেন। এবং নানাপ্রকারে প্রাকৃতভাবে শিক্ষাদি প্রদত্ত হয়। যে শিক্ষকের যে কয়েকটী ছাত্র, তাহারা দিনরাত্রি তাঁহার নিকট থাকায় শিক্ষক ও ছাত্রে একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় তাহাতে শিক্ষার সঙ্গে নীতি চরিত্র এবং কর্ত্তব্য জ্ঞানেরও গঠন হইয়া থাকে। আমি কয়েকটী বালককেই দেখিলাম তাহারা বেশ শান্ত শিষ্ট। অল্প সময়ে আমার সঙ্গে তাহাদের একটা আনুগত্য ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। আমি আশ্রমের অতিথি (গেষ্টে) আমার প্রশ্নের উত্তর অতি বিনীতভাবে দিয়াছিল। শুনিলাম এখানে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য অনেক ব্যয় হয় সুতরাং অধিকাংশ ব্যয় আশ্রম বহন করেন। এখানে অধিক বয়স্ক ও হীন জাতীয় ছাত্র লওয়া হয় না। ইহা ঠিক ব্রাহ্ম বোর্ডিং নহে। এখানকার শিক্ষা প্রণালী ও পাঠ্য পুস্তকাদি স্বতন্ত্র হইলেও ছাত্রদিগকে এন্ট্রান্স পরীক্ষার উপযুক্ত করা হয়।

৯ই আশ্বিন বেলা ২টার সময় সময় শান্তিনিকেতন হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় তিন মাইল পথ চলিয়া বোলপুর ষ্টেশনে আসিলাম। লুপ লাইনে যাইবার আমার উদ্দেশ্য না থাকায় ডাউন ট্রেনে উঠিয়া কড় লাইনে খানা জংশনে আসিলাম। (ক্রমশঃ)

পরলোকগত

"কথক" ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসিদ্ধ কথকগণের নামে খাঁটুরা-গোবরডাঙ্গা গ্রামের নামও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ সুকণ্ঠ ধরণী কথকের নাম আজও বঙ্গের চারিদিকে ধ্বনীত আছে। বোধহয় এখনও এমন ব্যক্তিগণ জীবিত আছেন, যাঁহারা তাঁহার সুমধুর কথকতা শ্রবণ করিয়াছেন। ১২৮১ সালের মাঘ মাসে, ৬২

বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও তাঁহারই খুল্লতাত, পণ্ডিত প্রবর সুবিখ্যাত রামধন শিরোমণি মহাশয় বিদ্যা ও সদ্‌গুণে এবং কবিত্বে কথক শ্রেণীর যথার্থই শিরোমণি ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে শিরোমণি মহাশয় তাঁহার একটি পুত্রকে কথকতা শিক্ষা দিতে ছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে তেমন যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন নাই, পক্ষান্তরে ভ্রাতস্পুত্র যুবক ধরণীধর অন্তরাল হইতে শুনিয়া শুনিয়া সুন্দর শিক্ষা করিতে ছিলেন। একদা ধরণী আপন মনে "আলাপচারি" করিতেছেন, সহসা রামধন তাহা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন এবং ধরণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই এরূপ কোথায় শিখ্‌লি?" যখন শুনিলেন যে তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা শুনিয়াই তিনি শিখিয়াছেন, তখন শিরোমণি মহাশয় অত্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক ধরণীকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, ধরণীধরও নিজ কোকিলকণ্ঠে বঙ্গ মোহিত করিলেন।

ধরণীর উন্নতির আর একটি শুভযোগ হইল, তৎসম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ শোনা যায়। এক সময় শিরোমণি মহাশয় ইছাপুর চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে কথকতা করিতেছিলেন, একদা শিরোমণি মহাশয় ধরণীকে বলিলেন, "আজ আমার শরীরটা ভাল না, বেদী খালি যাবে, যা তুই আজকার মত বলিয়া আয়।" ধরণী প্রথমতঃ একটু কুণ্ঠিত হইলেন কিন্তু তাঁহার উৎসাহবাক্যে তাঁহার সাহস হইল, এবং তিনি ইছাপুর চলিয়া গেলেন। এদিকে কিঞ্চিৎ বিলম্বে পাল্কি করিয়া শিরোমণি মহাশয়ও ইছাপুর গিয়া শুনিলেন, অন্যদিন অপেক্ষাও আজ ধরণী ভালই বলিতেছে, তিনি অন্তরালেই রহিলেন এবং কথা শেষ হইয়া গেলে যখন শ্রোতৃমণ্ডলী সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, তখন শিরোমণি মহাশয়ও ধরণীর সম্মুখে উপস্থিত; ধরণী যেন একটু লজ্জিত হইলেন কিন্তু শিরোমণি মহাশয়ের উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদে তাঁহার কুণ্ঠা ভাব দূরে গেল। সেই হইতে ধরণী প্রকাশ্যে কথকতা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন।

শিরোমণি মহাশয়ের এবং ধরণী কথক মহাশয়ের উৎকৃষ্ট পদাবলী যদি আমরা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা কুশদহে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। এ বিষয়ে ধরণীবাবুর সুযোগ্য পুত্র প্রফেসর শ্রীমান্ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় আমাদিগকে সাহায্য করিলে আমরা একান্ত উপকৃত হইব।

ধরণী কথক মহাশয়ের সমসময়ে ও তৎপরবর্ত্তি কয়েকজন কথক খাঁটুরা গোবরডাঙ্গায় হইয়াছিলেন।

দেশের রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কথকতার আদর কমিয়া গিয়াছে। বিগত ২৫।৩০ বৎসর মধ্যে আর কোন সুবিখ্যাত কথকের নাম শোনা যায় নাই কিন্তু তন্মধ্যে থিয়েটারের প্রচুর উন্নতি হইয়াছে। কথকতা শুনিয়া জাতীয় চরিত্র কোন ছাঁচে গঠিত হইত, আর থিয়েটার দেখিয়া কোন ছাঁচে গঠিত হইতেছে, তাহা দেশের লোক কি কিছুতেই বুঝিবেন না?

স্ত্রীশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

(১)

আমাদের দেশে স্ত্রীজাতিকে সাধারণতঃ সকলেই অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সেই কার্য্যে অকৃতকার্য্য হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া তাচ্ছিল্য করা হয়। কিন্তু বাস্তব পক্ষে স্ত্রীজাতি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য নহে। স্ত্রীজাতি লক্ষ্মীস্বরূপা। বর্ত্তমানে স্ত্রীজাতি যে, অকর্ম্মণ্য ও আমাদের (পুরুষের) গলগ্রহ স্বরূপ হইয়াছে, তাহা কেবল-মাত্র আমাদের (পুরুষের) দোষে। স্ত্রীশিক্ষার অভাবেই স্ত্রীজাতি আমাদের গলগ্রহ স্বরূপ ও সৎকার্য্যের বাধা স্বরূপ হইয়াছে। নারীজাতি যে পুরুষাপেক্ষা হীন নহে, তাহা ইতিহাসাদি গ্রন্থে উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; বর্ত্তমানে রণ পাণ্ডিত্যে ও নীতি কৌশল প্রদর্শন করিয়া পুরুষ যেমন পৃথিবীতে বিখ্যাত হইতেছেন, নারীজাতিতেও ঐ সকল গুণ পূর্ব্বকালে বিরল ছিল না। লীলাবতী, খনা প্রভৃতির বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আমরা চমৎকৃত হই; সংযুক্তা, অহল্যাবাই প্রভৃতির সুশাসন নৈপুণ্য রাজশক্তি দর্শন করিয়া আনন্দিত হই; এবং তারাবাই, দুর্গাবতী প্রভৃতির সামরিক কৌশল ও নীতি জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই। স্ত্রীজাতি যে, কর্ত্তব্যবোধে নিজপুত্রকেও অকুণ্ঠিত চিত্তে বলি দিতে পারে, সে দৃষ্টান্তও এই দেশে দুষ্প্রাপ্য নহে। অদ্য এই বিষয় একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। পন্না চিতোরাধিপতি উদয়সিংহের ধাত্রী। উদয় সিংহের

শৈশবাবস্থায় রাজকার্য্য পরিচালনার্থ তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত, তদীয় পিতার দাসী পুত্র বনবীরের হস্তে মন্ত্রিগণ, শাসন দণ্ড অর্পণ করেন; কিন্তু পাপিষ্ঠ বনবীর রাজ্য লালসায় মত্ত হইয়া শিশুর প্রাণ বধ করিতে কৃত সংকল্প হয়। ইহা এক বিশ্বস্ত ক্ষৌরকারের মুখে পন্না অবগত হইয়া, সেইদিন রাত্রে, একটী ফলের চাঙারির মধ্যে শিশুকে রাখিয়া, পাতা লতা দ্বারা চাঙারি আচ্ছাদিত করিয়া, সেই ক্ষৌরকারের সাহায্যে এক নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়। এদিকে অস্ত্র হস্তে ঘাতক আসিয়া শিশুর তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে পন্না, নির্ব্বাক অবস্থায় অনায়াসে অঙ্গুলি সঙ্কেতে স্বীয় নিদ্রিত শিশুকে দেখাইয়া দিল। ঘাতক ধাত্রী পুত্রের প্রাণ সংহার করিয়া প্রস্থান করিল। ধাত্রী নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া সেই হৃদয়বিদারক শোচনীয় দৃশ্য দর্শন করিল। যে রমণী চিতোরের জন্য, স্বদেশের জন্য, মিবাররাজ-বংশ রক্ষার জন্য অনায়াসে স্বীয় একমাত্র পুত্রকে বলি দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না, সেই নারীজাতির অবনতির মূল কারণ একমাত্র আমরাই। যতদিন দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার না হইবে,—যতদিন স্ত্রীজাতি শিক্ষার দ্বারা দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্যকরূপে অবগত হইতে না পারিবে, এবং বিলাসিতার ভীষণ পরিণাম সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে না পারিবে, ততদিন দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে না, হইতেও পারে না। শিক্ষা ব্যতীত ধর্ম্মভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না, এবং শিক্ষাব্যতীত মানব, আত্ম-নির্ভরশীল হইতে পারে না; যদি দেশের প্রকৃত উন্নতি করিতে চাও তাহা হইলে দেশে ধর্ম্মভাব জাগরিত কর। ধর্ম্মভাব জাগরিত করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন, আমাদের দেশে বর্ত্তমানে স্ত্রীশিক্ষার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তাই বলিতেছি, হে ভ্রাতৃবৃন্দ! যদি দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য দেশবাসীর জন্য প্রাণ কাঁদিয়া থাকে, যদি জননী জন্মভূমির দুর্গতি মোচন করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, যদি স্বদেশপ্রেমে মত্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে হে মাতৃসেবক! দেশে স্ত্রী শিক্ষারও ব্যবস্থা কর; নচেৎ তোমাদের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, চাত্রা

সিগারেট।

সম্প্রতি "ল্যান্সেট" নামক বিলাতী চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকায় সিগারেটের অপকারিতার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ল্যান্সেটের ইংরেজ ডাক্তার লিখিয়াছেন,—

"সিগারেট টানিবার সময় ধোঁয়া নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়া ফুস্ ফুস্ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, উহাতে হাঁপ, কাশি, যক্ষ্মা, রক্তামাশয় ও বক্ষঃক্ষত প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ জন্মিয়া থাকে," ইংরেজ ডাক্তারের কথা এই; এবং প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রও সিগারেটের সম্পূর্ণ বিরোধী; কিন্তু ঐ বিষোপম সিগারেট বিক্রীত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বর্ষে বর্ষে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের একটি বন্ধু কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তিনি আর কখনও কলিকাতায় আসেন নাই, কয়েক দিন থাকিয়া তিনি কলিকাতার বহু স্থান দেখিয়া একদিন বলিলেন,—"কলিকাতায় আসিয়া একটি নূতন দৃশ্য দেখিলাম। একটি বালক মায়ের কোলে চড়িয়া সিগারেট টানিতে টানিতে চলিয়াছে!"—বাস্তবিকই তাই।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

রোগ শয্যায়—

কুশদহ সংক্রান্ত কার্য্যে আমি বিগত ১০ই আষাঢ় গোবরডাঙ্গায় গিয়া অল্পদিনের মধ্যেই ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইয়া পড়ি। ঐ অবস্থায় আষাঢ় ও শ্রাবণ, দুই বার কুশদহ বাহির হইবার পর, আমার বাম হাতের অঙ্গুলিতে একটা আকস্মিক বেদনা হইয়া, পরে তাহাতে অস্ত্র চিকিৎসা হয়। ক্রমে ঘায়ের অবস্থা প্রবল এবং দুষিত হইয়া পড়িল। ১১ই আশ্বিন কলিকাতায় আসিয়া, ভাদ্রের ১২শ সংখ্যার কুশদহ বাহির করা হয়। পূজার বন্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে গ্রাহকগণের কাগজ পাঠাইয়া অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। তৎপরে কলিকাতার দুই একটি বিজ্ঞ চিকিৎসক ঘায়ের অবস্থা দেখিয়া ভাল বোধ করিলেন না, এমন কি আঙ্গুলটী কাটীয়া বাদ দিবার সম্ভাবনা বিচিত্র নহে, ইহারও আভাষ পাওয়া গেল। তখন নিরুপায় প্রায় হইয়া অতর্কিত ভাবে একটী ধর্ম্মবন্ধুর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি সমস্ত অবস্থা শুনিয়া আমাকে, ৪৩নং বিডন ষ্ট্রীটে ডাক্তার শশিভূষণ নাগের নিকট লইয়া গেলেন।

ও পরদিন হইতে তাঁহার চিকিৎসার অধীন হইলাম। ভগবানের কৃপায় তাঁহার আশ্চর্য্য "মলমের" গুণে ১০।১৫ দিনে ঘায়ের অবস্থা ফিরিল, আঙ্গুলটী রক্ষার আশা হইল। বর্ত্তমানে ঘা আরোগ্যাবস্থায় আসিয়াছে, কিন্তু বিগত দেড় মাসের মধ্যে ঐ দারুণ ক্ষত, তাহার উপর প্রত্যহ অল্প অল্প জ্বর এবং অরুচিতে আমি মৃতকল্প হইয়া পড়িলাম। জীবনের কোন উদ্যম উৎসাহ যেন রহিল না, সুতরাং "কুশদহ" প্রকাশের আশাও নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িল। শয্যাগত হইয়া ভগবানের নাম মাত্র ভরসা রহিল। তৎপরে ঐ অবস্থায় তাঁহার আশ্চর্য্য করুণার পরিচয় পাইয়া অবাক্ হইলাম। এত রোগ যাতনায়ও আমার এমন মনে হয় না যে, কোন দিন কোনরূপ অসহ্য যাতনা হইয়াছে, করুণাময়ী কোন দিন শান্তি হরণ করেন নাই, এবং অভাবনীয়রূপে ঔষধ পথ্যাদি সকল "জননী" অন্তরালে থাকিয়া যোগাইলেন। তারপর দেখি, সহসা কোথা হইতে "কুশদহের" সকল আয়োজন প্রস্তুত, তাঁহার বাণী অন্তরে বলিল, "উঠ, এবার বর্দ্ধিত আকারে, নূতন সাজে "কুশদহ" বাহির কর।" তখন আমার প্রাণ তাঁহার চরণে প্রণত হইল। তাই বলি, শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় গ্রাহকগণ! আসুন, কুশদহের প্রতি একটু বিশ্বাসের ভাবে, ধর্ম্ম দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করুন। আমরা যেন তাঁহার করুণা না ভুলি। ভগবান সকলের মঙ্গল করুন।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু।

স্থানীয় সংবাদ।

আমরা এবার বড়বাজার চিনিপটীর চিনি ব্যবসায়ীগণের, বারইয়ারির ব্যয় সম্বন্ধে সদ্দৃষ্টান্তের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাঁহারা বারইয়ারির যাত্রা গানের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া কুশদহ প্রভৃতি স্থানের গরীব গৃহস্থের মাসিক ও অন্যান্য সাহায্য করিতেছেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত দীননাথ দাঁ ও শ্রীযুক্ত কুশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এইরূপে অর্থের সদ্ব্যয় করিতে বিশেষ ইচ্ছুক। ঈশ্বর করুন তাঁহাদের এই শুভইচ্ছা, বাহ্যিক নাম ও সুখ্যাতির জন্য না হইয়া, আন্তরিক দয়ার ভাব হইতে হউক, যাহাতে ইহ এবং পরলোক সফল হয়।

আরো সুখের বিষয় এই যে এবার বারইয়ারিতে যাত্রা ভিন্ন, অশ্লীল, অপবিত্র বারাঙ্গনার নৃত্য গীত হয় নাই। কলিকাতা সহরে প্রায় প্রত্যেক পল্লীতে এক একটী বারইয়ারি হয়। সকলেই যদি এইরূপে অপবিত্র নাচ গান বন্ধ করিয়া, যাত্রাগানে কিছু ব্যয় করিয়া, অবশিষ্ট অর্থ ভাল বিষয় ব্যয় করেন, তাহাতে দেশের কত অভাব মোচন হইতে পারে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, গৈপুর নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি কলিকাতা এম্ এম্ বসু হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সাঁওতাল পরগণা, কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও দেরাদুনে বৎসরাধিক বিশেষ প্রশংসার সহিত চিকিৎসা কার্য্য করিয়াছিলেন। দেরাদুনে দুটী টাইফয়েড (Typhoid fever case) কেস্ অতি দক্ষতার সহিত আরোগ্য করিয়া কয়েক খানি প্রশংসা-পত্র পাইয়াছেন। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ দেরাদুন পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে (সাহারাণপুর জেলার) দেওবন্দে চিকিৎসা ব্যবসা করিতেছেন। এখানেও একটী Typhoid fever case আরাম করিয়াছেন এবং অল্পকালের মধ্যে সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। যদিও তিনি বিদেশে আছেন, তথাপি তিনি কুশদহ- বাসী, এজন্য আমরা উত্তরোত্তর তাঁহার উন্নতি কামনা করি।

কুশদহের চাঁদা প্রাপ্তি। (সাবেক)

শ্রীমতী সুপ্রভা আশ	১৲	শ্রীযুক্ত নয়নকৃষ্ণ দেব	১৲
" গায়েত্রী রায়	১৲	" হরিচরণ বসু	১৲
শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর আইচ	১৲	" ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৲	" সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৲
" ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	১৲	" বিজয়কৃষ্ণ বসু	১৲
" রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, উকিল	১৲	" রবীন্দ্রনাথ বসু	১৲
" সূর্য্যকান্ত মিশ্র	১৲	" আশুতোষ বাগচি	১৲
" প্রমথনাথ রায় চৌধুরী	১৲	Mr. Charles S. Paterson	১৲
" অম্বিকাচরণ দে স্কোয়ার	১৲	শ্রীযুক্ত দীননাথ দাঁ	১৲

গ্রাহকগণের প্রতি।

একবৎসরের অভিজ্ঞতায় বোঝা গেল, সমগ্র কুশদহের মধ্যে এরূপ একখানি মাসিকপত্র সুন্দর রূপেই চলিতে পারে। সংবাদপত্রের দ্বারা দেশের কিরূপ উপকার হয়, তাহা কি এখনকার দিনে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে! ঈশ্বর কৃপায় এই এক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি গ্রাহকের নিকট হইতে কুশদহের স্থায়িত্বের কামনা যুক্ত পত্র ও অভিমত পাওয়া গিয়াছে।

প্রথম বর্ষের কুশদহের যে সকল ত্রুটী ঘটিয়াছে, তাহার একটী প্রধান কারণ অর্থাভাব। কুশদহের গ্রাহক শ্রেণীর মধ্যে এমন ব্যক্তি অনেক আছেন, যিনি ইচ্ছা করিলে একাই কুশদহের সামান্য ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন। প্রথম বর্ষে যেরূপ পরিশ্রমে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা যিনি একমাত্র একাজের নিয়ন্তা, —সেই ভগবানই জানেন। কিন্তু এ কথা বলি না যে, ঐ পরিশ্রমে কাতর হইয়াছি ; বরং আত্মপ্রসাদ লাভই হইয়াছে। তবে এবার এ দাসের শরীর ভগ্ন ; আর যে দ্বারে দ্বারে দয়াভিক্ষা করিতে পারিব এমন বোধহয় না ; তাই দয়ালু গ্রাহকগণকে একথা জানাইলাম। যদি দয়া হয়, অগ্রিম চাঁদা প্রেরণ করুন।

যিনি অগ্রিম চাঁদা দিতে অবিশ্বাস করিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলি যে, পরমুহূর্ত্তে কি হইবে তাহা কেহ জানেন না, সুতরাং জীবনের নশ্বরতা এবং অনির্দ্দিষ্ট ঘটনার বিষয় ভাবিলে কেহই কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারেন না। আমরা ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত, গ্রাহকশ্রেণীর যিনি দুই এক টাকার জন্য নির্ভর এবং বিশ্বাসের আশ্রয় না করিতে পারিবেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব। যাঁহারা এক বর্ষ কাগজ গ্রহণ করিয়া শেষ সংখ্যা ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়াছেন, ঈশ্বর আশীর্ব্বাদে আমরা যেন তাঁহাদের প্রতি কোন অনুযোগ না রাখি।

বিনীত—দাস।

Printed by J, N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

দ্বিতীয় বর্ষ]   অগ্রহায়ণ, ১৩১৬।   [২য় সংখ্যা।



গাঁটুরা গোবরডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়

সম্মলিত ধর্ম্ম, সমাজ ও

বিবিধ বিষয়ক

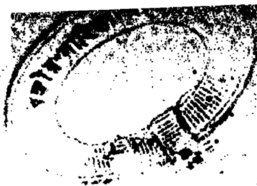
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

কুশদহ-কার্য্যালয়

২৮।১ সুকিয়াষ্ট্রীট কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১।০ মাত্র।   প্রতি সংখ্যা নগদ মূল্য /৫ পয়সা।



দ্বিতীয় বর্ষ।　　অগ্রহায়ণ, ১৩১৬।　　২য় সংখ্যা।

সঙ্গীত।

সারঙ্গ।—ত্রিতালী।

পাপ তাপে তাপিত ধরণী।
মানব সব,　　হাহাকার রব
ছাড়ে দিবা রজনী।
হইল ম্লানতর যৌবন সুন্দর,
পশি কীট তাহে করে ছারখার ;
জ্ঞানহত মদে মত্ত এমনি।
পাপ প্রলোভন, যেন হুতাশন,
নিরন্তর সবে করিছে দহন
নাই উপায়, তব পায় মাগে জননী।
এমনি করিয়ে সারা জীবন যায়
তবু কি নাহি চেতনা পায়
যাতে মরে তাই করে, তার তারিণী॥

স্বর্গীয় নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ।

সিদ্ধান্তবাগীশ রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের নিকট সুপরিচিত। খড়দহ, সর্ব্বানন্দী প্রভৃতি প্রধান মেলের অনেক কুলিন হড়ভাবাপন্ন। বিশেষতঃ খড়দহমেলে সিদ্ধান্তী নামে যে পৃথক একটী থাক আছে, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সেই থাকের সৃষ্টিকর্ত্তা। হড়দোষও তাহা হইতে হইয়াছে।

কিন্তু কেবল থাকের সৃষ্টিকর্ত্তা বা একটী ব্রাহ্মণসমাজের গোষ্ঠীপতি বলিয়া সিদ্ধান্তবাগীশের নাম চিরস্মরণীয় হয় নাই। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী

বলিয়াও নহে। সিদ্ধান্তবাগীশের কীর্ত্তিতে বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরব করিবার সামগ্রী আছে। তিনি বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান। তাঁহার যশ একদিন সসাগরা ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারেও গীত হইয়াছিল। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া সমগ্র ভারত একদিন তাঁহার জয়গান করিয়াছিল। বাঙ্গালীর অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া বিদেশীয়গণও চমৎকৃত হইয়াছিল। সম্রাটের স্বরচিত জীবনীতে উজ্জ্বল অক্ষরে যে বাঙ্গালীগণের অমানুষী কার্য্যকলাপ লিখিত হইয়াছে, সিদ্ধান্তবাগীশ সেই বাঙ্গালীগণের নেতা ছিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার তিনিই দেখাইয়া বাঙ্গালীকে চিরগৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু সিদ্ধান্তবাগীশ কে? কোথায় ও কোন সময়ে তিনি জন্মিয়াছিলেন? কিরূপে তিনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমকক্ষতা করিতে সমর্থ হইলেন? কিরূপেই বা তিনি দিল্লীর সম্রাটকে নিজ ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন তাহা আমরা সকলে জানি না। জানিবার চেষ্টাও করি না। যদি ঘটনাক্রমে কোন বিষয় জানিতে পারি, আলস্য করিয়া তাহা সকলকে জানাইবার সুযোগ পরিত্যাগ করি। যাহা হউক যতটুকু সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই প্রকাশ করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় ইছাপুরের চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ। কুশদহ মধ্যে আধুনিক কালে (মেল বন্ধনের পরবর্ত্তী কালে) সিদ্ধান্তবাগীশের বংশ সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া পরিচিত। যখন নদীয়া রাজবংশেরও অভ্যুদয় হয় নাই তখনও ইছাপুরের চৌধুরীবংশ সাধারণের নিকট সম্মানের পাত্র হইয়াছেন। কিন্তু ইছাপুরই তাঁহার জন্মভূমি নহে। প্রবাদ আছে তিনি প্রথমে চালুন্দিয়া-তীরে বিষ্ণুপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরও তাঁহার আদি বাসস্থান নহে। যশোহর জেলায় ঝিকরগাছা ষ্টেসনের অল্প পূর্ব্বে লাউজানি নামক স্থানে একটী প্রাচীন রাজ্য ছিল। রাজা মুকুটরায় এই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে, ১৫০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে উক্ত রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অধিবাসীগণ নানা স্থানে পলায়ন করেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ও পলায়ন করিয়া বিষ্ণুপুরে আগমন করেন। বিষ্ণুপুরে তখন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন জনৈক মহাযোগী বাস করিতেন। কয়েক বৎসর তাঁহার নিকট

থাকিয়া তিনি যোগাভ্যাস করেন। তৎপরে যোগী তাঁহাকে সংসারে প্রবিষ্ট হইতে অনুরোধ করায় তাঁহার আদেশক্রমে সিদ্ধান্তবাগীশ ইছাপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

কেহ কেহ বলেন, সিদ্ধান্তবাগীশ প্রথমে জলেশ্বরের রাজা কাশীনাথ রায়ের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন। কেহ বলেন রাজা কাশীনাথের সহিত তাঁহার শোণিতসম্বন্ধ ছিল। এবং কাশীনাথের মৃত্যুর পর তাঁহারই তালুক ভোগ করিতে থাকেন। যাহাই হউক ইহা নিশ্চিত যে ইছাপুরে আসিয়া বাস করার সময় হইতে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সিদ্ধান্তবাগীশ প্রচুর ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সুপরিচিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে বা তাহার অল্প পরে মহারাজ প্রতাপাদিত্য সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট কর চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ উত্তরে বলিয়াছিলেন "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ কর দিব কি করিয়া? ব্রাহ্মণ চিরকালই নিষ্করে বাস করে"। বঙ্গাধিপ উত্তরে অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বশে আনিবার জন্য বিস্তর সৈন্য সাজাইয়া ইছাপুর যাত্রা করিলেন। সহস্র সহস্র সৈন্য যমুনা পার হইতে লাগিল। যমুনা তখন প্রবলা নদী হইলেও তাহার উপর নৌকার জাঙ্গাল বাঁধা হইল। বিস্তর হাতী ঘোড়া কামান ও নৌকা দেখিয়া কুশদহবাসী সকলে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সিদ্ধান্তবাগীশ কিন্তু ভীত হইলেন না। সৈন্য সজ্জাও করিলেন না। সে সামর্থও ছিল না। প্রতাপাদিত্য সৈন্য লইয়া যমুনার উত্তর পারে শিবির স্থাপন করিলে, সিদ্ধান্তবাগীশ একাকী ছদ্মবেশে বঙ্গেশ্বরের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। যোগপ্রভাবে বঙ্গাধিপকে কোন অলৌকিক বিষয় দেখাইয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিলেন এবং পরে আত্মপরিচয় দিলেন। উদারহৃদয় মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাঁহার পদধূলি লইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন। তাঁহার অধিকার ত অক্ষুণ্ণ রহিলই উপরন্তু কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কেবল একখানি গ্রাম অর্থাৎ যে স্থানটুকুতে মহারাজের শিবির স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাই তিনি চাহিয়া লইলেন। কেন না বঙ্গাধিপের নিয়ম ছিল যে অপর ব্যক্তির অধিকারে তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। যে স্থানে প্রতাপাদিত্যের শিবির সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল অদ্যাপি সে স্থান প্রতাপপুর নামে খ্যাত। এই ঘটনা একদিকে সিদ্ধান্তবাগীশের অলৌকিক ক্ষমতা ও অপর পক্ষে মহারাজ

প্রতাপাদিত্যের মহানুভবতার সাক্ষ্যদান করিতেছে। যতদিন প্রতাপপুর গ্রাম বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন এই ঘটনার স্মৃতি লোপ হইবে না। এই গ্রাম গোবরডাঙ্গা ষ্টেসন হইতে একমাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে যমুনাতীরে অবস্থিত।

সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সময় হইতে কুশদহ সমাজের পুষ্টিলাভ ঘটে। তিনি অনেক ব্রাহ্মণ আনাইয়া এতদঞ্চলে বাস করাইয়াছিলেন। তাঁহার উত্তর পুরুষগণের প্রদত্ত নিষ্কর-ভূমিদানপত্র এখনও অনেকের নিকট আছে এবং অনেক ব্রাহ্মণ অদ্যাপি সে সকল ভূমি ভোগ করিতেছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কুশদহস্থ ব্রাহ্মণগণের ভোগপ্রমাণবৃত্তি বাহল রাখিয়াছিলেন মাত্র, নূতন করিয়া দান করেন নাই; মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত সনন্দে ইহার উল্লেখ আছে। সত্য বটে, সিদ্ধান্তবাগীশের বংশধরগণের আর পূর্ব্বাবস্থা নাই, কমলার কৃপায় বঞ্চিত হইয়া তাঁহারা পূর্ব্ব সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ নহেন কিন্তু সুরনাথ বাবুর ন্যায় উদারহৃদয় ও অমায়িক ব্যক্তি অবস্থাবিপর্য্যয়েও কখন সাধারণের শ্রদ্ধা হারাইবেন না। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সৎসঙ্গ।

মহারাজ বিশ্বামিত্র মৃগয়াসক্ত হইয়া ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠদেবের তপোবন-সন্নিকটে উপস্থিত হন্। অরুন্ধতীপতিকে প্রণাম না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন অবৈধ জ্ঞানে, তিনি তাঁহার আশ্রমে গমন করেন। প্রণামান্তে বিদায়ের প্রার্থনা করিলে, শ্রীরামগুরু তাঁহাকে আতিথ্যগ্রহণের আদেশ করাতে, তিনি কুণ্ঠিতভাবে উত্তর করেন, 'বহুজন পরিবেষ্টিত হইয়া মৃগয়ায় আসিয়াছি। সর্ব্বাগ্রে একাকী প্রসাদ গ্রহণ করিলে আমার মহারাজ নামে কলঙ্ক হইবে'।

সহাস্যবদনে বশিষ্ঠদেব তাঁহার সমস্ত লোককেই আহার করিতে বলায়, বিশ্বামিত্র বিনীতভাবে পুনরায় বলিলেন, "তপস্যাশ্রমের পীড়া উৎপাদন করা ও তপস্যার ব্যাঘাত জন্মান মহারাজদিগের কর্ত্তব্য নহে।"

বশিষ্ঠদেব পূর্ব্ববৎ স্মিতবদনে উত্তর করিলেন, "বিশ্বামিত্র! মহারাজেরা

অনুগ্রহ করিয়াই যে তপস্যার বিঘ্ন জন্মান না, ইহা তুমি মনেও করিও না। হিংসাশূন্য তপোবনে হিংস্রক শার্দ্দূলও গৃহপালিত মার্জ্জারবৎ শান্ত হইয়া থাকে। আবার ভগবানের সর্ব্বাভাবশূন্য এবং ত্রিতাপনাশী শ্রীচরণ নিয়ত ধ্যান করিয়া, যে তপস্বীগণ কালাতিপাত করেন, তাঁহাদিগের কি কোন বিপদ বা অভাব থাকিতে পারে ?

রজোগুণপ্রধান মহারাজের কর্ণে তপোধনের উক্তি সুশ্রাব্য বোধ হইল না। কিন্তু স্বাভাবিক সভ্যতার অনুরোধে তিনি আতিথ্য স্বীকার করিলেন এবং অনতিবিলম্বে দেবদুর্ল্লভ নানাবিধ সুখাদ্য সামগ্রীর প্রচুর আয়োজন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

তৎপরে কামধেনুদর্শন, উৎকৃষ্ট ধেনু বলিয়া তাহাতে রাজাধিকার আছে, ইহা নিবেদন, উক্তধেনুপ্রসূত দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধৃগণের সহিত সমর, বিশ্বামিত্রপরাজয়, বশিষ্ঠের শতপুত্রনাশ, 'ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং' এইকথা বলিয়া বিশ্বামিত্রের তপস্যারম্ভ, পৃথিবীস্থ লোকমাত্রেরই বেশ্যার সংশ্রবে সর্ব্বথা সর্ব্বনাশই হইয়া থাকে, ইহা সুপ্রকাশ করিবার্ নিমিত্ত তাঁহার স্বর্গবেশ্যাসংস্পর্শে তপস্যায় ব্যাঘাত, তপঃপ্রভাব পরীক্ষার নিমিত্ত ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গপ্রেরণে বিফলযত্ন, ব্রহ্মাপ্রদত্ত রাজর্ষিপদপ্রাপ্তেও মহারাজার ক্ষোভ ও ষষ্টিসহস্র বৎসর তপস্যান্তে ব্রহ্মার বদন হইতে "মহর্ষি" শব্দ শ্রবণ, এ সমস্ত বিষয়ই বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।

বিশ্বামিত্র মহর্ষি হইয়া পূর্ণকাম হইয়াছেন। মিত্রের নিকট বিষাদ প্রকাশ করিলে বিষণ্ণের হৃদয় সেরূপ আর ভারাক্রান্ত থাকে না। শ্রবণমাত্র মিত্র সে বিষাদের অংশ গ্রহণ করেন। তদ্রূপ জয়ে বা আনন্দে সাধারণ মনুষ্য সুস্থির থাকিতে পারে না। সে অনুসন্ধান করিয়া তাহার পরম শত্রুর নিকট তাহা প্রকাশ করে; কারণ উক্ত কথা শ্রবণে শত্রু যে পরিমাণ ক্ষুব্ধ বা বিষণ্ণ হয়, সেই পরিমাণে জেতার আনন্দ বৃদ্ধি হইয়া থাকে! পরাজয় অবধি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে পরম শত্রু জ্ঞান করিতেন। এ ষাট হাজার বৎসরেও তাঁহার সে ভাবের কণামাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই; সুতরাং তিনি অবিলম্বেই বশিষ্ঠদেবের নিকট গমন করিলেন।

দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া বশিষ্ঠদেব, 'এস রাজর্ষি এস' এতদ্রূপ সম্বোধনে

তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি সম্পূর্ণ অসন্তোষব্যঞ্জকস্বরে উত্তর করিলেন, "স্বয়ং ব্রহ্মা আমাকে মহর্ষি বলিয়াছেন"।

তচ্ছ্রবণে সহাস্যবদনে বশিষ্ঠদেব বলিলেন, "পিতা সমধিক জ্ঞানী। আমি যথাজ্ঞানে তোমাকে রাজর্ষি বলিয়াছি"।

বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ সক্রোধে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করিলেন। রজোগুণমিশ্রিত তপঃপ্রভাবে প্রাণিমাত্রই পীড়িত হইয়া থাকে। সেই পীড়ানিবারণ মানসেই বিশ্বামিত্রসম্মুখে ব্রহ্মা বদন হইতে 'মহর্ষি' শব্দ নির্গত করিয়াছিলেন। আবার সেই উৎপাত উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মা সত্বর বিশ্বামিত্রের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, 'আবার কেন? পূর্ণ মনোরথ হইবার পর ত আর তপস্যা করিতে হয় না'।

বিশ্বামিত্র অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া উত্তর করিলেন, "আপনার পুত্র যে আমাকে রাজর্ষি ভিন্ন কিছুতেই মহর্ষি বলিতে চাহেন না"।

ব্রহ্মা সহাস্যবদনে বলিলেন, "বৎস! কে কি বলিবে তৎসম্বন্ধে আমি কি বলিব? বশিষ্ঠ অন্যায় বলিয়া থাকে, সে তাহার ফলভাগী হইবে। তুমি কিন্তু পূর্ণকাম হইয়া আর তপস্যা করিও না। আমার নিষেধ অবহেলা করিলে, তুমি পূর্ব্বতপস্যার ফল হইতে বঞ্চিত হইবে"।

বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার কথায় বুঝিলেন, তিনি নিঃসন্দিগ্ধরূপেই মহর্ষি হইয়াছেন এবং মানসগতিতে পুনরায় বশিষ্ঠের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ আবার তাঁহাকে রাজর্ষি বলিয়া সম্বোধন করাতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, মিথ্যাবাদী নিকৃষ্ট লোকও দণ্ডার্হ—উৎকৃষ্ট লোক রোষ বা অসূয়াবশতঃ সত্যের অপলাপ করিলে সমধিক দণ্ডেরই যোগ্য হইয়া থাকে—আর বশিষ্ঠের মত তপস্বী ব্রহ্মবাক্যে অবহেলা করিয়া যখন আমার মর্য্যাদা অযথারূপে ভঙ্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন ধর্ম্ম ব্যবস্থানুসারেই তিনি আমার বধ্য। অতএব অদ্য রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই নিশ্চয়ই আমি তাঁহার প্রাণনাশ করিব।

বিশ্বামিত্র সংকল্পিত কার্য্য করিবার মানসে সশস্ত্র হইয়া নিশীথে বশিষ্ঠের লতামণ্ডপপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং পতিব্রতা অরুন্ধতীকে জাগরিতা দেখিয়া তাঁহার নিদ্রাকর্ষণকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি শুনিলেন, অরুন্ধতী ইক্ষ্বাকুবংশের হিতকারী পতিকে বলিতেছেন,

"দেখ, দেখ নাথ? লতাপত্রমধ্য দিয়া কি সুন্দর নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ আমাদিগের মণ্ডপে প্রবেশ করিতেছে"। বশিষ্ঠ আবার তদুত্তরে পতিপ্রাণা পত্নীকে বলিতেছেন; "মুগ্ধে! কলঙ্কী শশীর জ্যোতি কি এরূপ নির্ম্মল ও নয়নানন্দকর হয়?" সরলা অরুন্ধতী অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, "তাই ত নাথ! আমি ভুলিয়াছি। আমাকে বলিয়া দেও, এ কিসের জ্যোতি"। বশিষ্ঠ স্নেহগদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, "এ আমার বিশ্বামিত্রের ষষ্টিসহস্রবর্ষব্যাপী তপস্যার জ্যোতি"।

বশিষ্ঠের কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র অস্থির। তিনি ভাবিতেছেন, "হা ধিক্ আমাকে! আমার তপস্যাতেও ধিক্ থাক! আমি যে বশিষ্ঠের শতপুত্রহন্তা, সেই বশিষ্ঠই আবার তাঁহার সেই পুত্রদিগের জননী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা অরুন্ধতী-দেবীকে বলিতেছেন, 'আমার বিশ্বামিত্রের তপস্যার জ্যোতি'। তাঁহাকেই বধ করিবার জন্য আমি এক্ষণে এস্থানে দণ্ডায়মান! জানি না—এতক্ষণেও আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিলাখণ্ডবৎ নিশ্চেষ্ট হইল না কেন! আমার পাপ হইয়াছে। আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি আমার ত্রিশ সহস্র বৎসরের তপস্যার ফল ঐ পিতৃসম বশিষ্ঠদেবকেই দান করিয়া পাপমুক্ত হইব। না হয় ব্রহ্মা আমাকে মহর্ষিপদ হইতে আপাততঃ বঞ্চিত করিবেন—আমি না হয় আবার ঐরূপ দীর্ঘ-কালব্যাপী তপস্যা করিয়া তাঁহাকে মহর্ষিত্ব পুনর্দান করিতে বাধ্য করিব"।

দীর্ঘসূত্রতা কাহাকে বলে, তাহা সে কালের কোন ক্ষত্রিয় সন্তান জানিতেন না। বিশ্বামিত্র ত ক্ষত্রিয়গণাগ্রগণ্য। সুতরাং ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে তিনি সেই নিশীথ সময়ে বশিষ্ঠের পদানত হইয়া কাতরবচনে বলিলেন, "শত-পুত্রহন্তাকে যে মহাত্মা 'আমার' বলিতে পারেন, সেই তাপসকুলগৌরবকে —সেই বশিষ্ঠদেবকে বধ করিতে আমি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম। আমার ঘোর পাপ হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া আমার পরিত্রাণ সাধন করুন। পাপমুক্তির আশায় আমি আপনাকে আমার তপস্যার অর্দ্ধাংশ দান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। কৃপানিধান! তাহা গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া আমাকে মর্ম্মবেদনা দিবেন না"।

সম্পূর্ণ স্নেহের সহিত বিশ্বামিত্রের মস্তকে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে গাত্রোত্থান করিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে আমি অবশ্যই তোমার দান গ্রহণ করিব"।

সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বিশ্বামিত্র গাত্রোত্থান করিলেন এবং আচমন পূর্ব্বক উক্ত তপস্যাফলদানে উদ্যত হইয়া দেখিলেন, বশিষ্ঠদেব অন্যমনস্ক। তিনি কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে বলিলেন, "কোন নির্ধন পুরুষ সসম্মানে বা সমাদরে কোন ধনবান্ লোককে কিছু দান করিতে ইচ্ছুক হইলে, সে ধনী তাহা অগ্রাহ্য করেন না। কিন্তু দানগ্রহণের পূর্ব্বেই তিনি তদ্বিনিময়ে তাহাকে কি দিবেন, তাহা স্থির করিয়া থাকেন! আমিও তোমাকে দানগ্রহণের পূর্ব্বে কি দিব, তাহা স্থির করিতেছি!

অরুন্ধতীপতির এ কথা শ্রবণে রজোগুণপ্রধান বিশ্বামিত্রের বদনে অভিমানের চিহ্ন দেখা দিল। তিনিও অভিমানব্যঞ্জকস্বরে ও বিরক্তিভাবে বলিলেন, "কি দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা দিন। অনর্থক বিলম্ব আমার সহ্য হয় না"।

স্মিতবদনে বশিষ্ঠদেব উত্তর করিলেন, "আমি বহুবিধগুণের অধিকারী বলিয়া ভাবিতেছি তোমাকে কোন গুণটী দান করিব—অর্থাৎ তোমাতে যে গুণের সম্যক্ অভাব আছে, তাহাই তোমাকে প্রদান করিব এবং তদ্দারায়ই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে"।

কিঞ্চিৎ কর্কশস্বরেই বিশ্বামিত্র বলিলেন "যদি স্থির করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে গুণটা আমাকে দিতে অনর্থক আর বিলম্ব না করিলেই ত ভাল হয়"।

বশিষ্ঠদেব পুনরায় সহাস্যে বলিলেন, "হাঁ বৎস! তুমি যে গুণের দরিদ্র, তাহা স্থির করিয়াছি; কিন্তু তাহার কত পরিমাণ তোমার সহ্য হইবে, তাহাই স্থির করিতে আমার এত বিলম্ব হইয়াছে। তোমাতে 'সৎসঙ্গ' গুণের এককালীন অভাব দেখিতেছি। সুমেরুপ্রমাণ সে গুণ আমাতে আছে। অনেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিলাম, তাহার তণ্ডুলকণাপ্রমাণ তুমি সহ্য করিতে পারিবে। অতএব এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তোমাকে তাহা দান করিলাম, তুমি 'স্বস্তি' শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহা গ্রহণ কর"।

বিশ্বামিত্র সহসা 'স্বস্তি' শব্দ মুখনির্গত করিয়াই সক্রোধে বলিলেন, "আমার মহারাজবংশে জন্ম—আমি ক্ষুদ্রপক্ষিযোনিসম্ভূত নহি। আপনার উক্ত তণ্ডুলকণাপ্রমাণ 'সৎসঙ্গ' ব্যঙ্গোক্তি না হইলে, আমার উদরপূরণ ত হইবেই না। তাহাতে অন্য কোন প্রকার ফললাভ আছে কি না, তাহা আপনি অথবা

সর্ব্বজ্ঞ ভগবানই জানেন—আমার এ ৬০ হাজার বৎসরব্যাপী তপস্যামার্জ্জিত বুদ্ধিতেও সে বিষয়ের কিছুমাত্র উপলব্ধি হইতেছে না। আপনি এ সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত আছেন কি" ?

বশিষ্ঠদেব স্বাভাবিক গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "নিশীথে স্থির মনে ভগবচ্চরণ ধ্যান করিতে যে কত আনন্দলাভ হয়, তাহা কিয়দ্দিনের তপস্যাতেই তুমি একরূপ ত অবগত হইয়াছ। সেইজন্য বলি, তুমি ভগবানের নিকট গমনপূর্ব্বক এ বিষয়ের ব্যাখ্যা শ্রবণ কর—আমি তাঁহার শ্রীচরণধ্যানে রত হই"।

বিশ্বামিত্র আর তাহাতে দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, "শ্রীভগবানের একটী নাম ত 'দর্পহারী'। তাঁহার নিকট ঈর্ষান্বিত হইয়া আমাকে বশিষ্ঠের নিন্দা করিতে হইবে না। বশিষ্ঠের অনুরোধ মত সমস্ত কথা বলিলেই ভগবান তাঁহার অহঙ্কারের পরিচয় পাইবেন। তাহা হইলে আমার বৈরনির্যাতনেচ্ছা অনায়াসেই সাধিতা হইবে"।

এতদ্রূপ চিন্তা করিতে করিতে বিশ্বামিত্র শ্রীভগবানের সম্মুখীন হইয়া প্রণত হইলেন। আনন্দময়ও সানন্দে তাঁহার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি রসায়ন যুক্ত করিয়া উক্ত সমস্ত ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে বিবৃত করিলেন। কিন্তু শ্রীভগবান তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে-করিতে স্নেহগদ্‌গদ বচনে বলিলেন, "আমার বশিষ্ঠ ত সুস্থশরীরে ও সুস্থিরমনে কুশলে আছে" ?

বিশ্বামিত্র এককালে অবাক্। তিনি ভাবিতেছেন, "শালগ্রামের উঠা বসা বুঝা ভার। স্বপত্নী সত্যভামার দর্পচূর্ণ করিতে পারিলেন, নিজ বাহন গরুড়, ভক্তপ্রধান সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার হনুমান চন্দ্র, অধিক কি কনিষ্ঠ শ্রীলক্ষ্মণকেও কুণ্ঠিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। আর ত্রিপণ্ড বশিষ্ঠের বেলায় যত জঞ্জাল। ক্রোধে আমার অঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে"। কিন্তু 'সামীপ্যাবস্থার' কেমনই প্রভাব, এরূপ ক্রোধেও বিশ্বামিত্রের বদনে একটী বাক্যও নিঃস্বরণ হইতেছে না। তৎপরে সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি করযোড়ে তণ্ডুলকণাপ্রমাণ সৎসঙ্গের ব্যাখ্যা করিতে অনুনয় করায়, ভগবান বলিলেন, "বিশ্বামিত্র ! তুমি জনৈক বুদ্ধিমান লোককে সমভিব্যাহারে লইয়া আইস। বারম্বার একই কথা নির্ব্বোধকে বুঝাইতে হইলে আমার অন্যান্য কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়া থাকে"।

পাঠক মহাশয়গণ ! ভগবানের শেষোক্তিতে অভিমানী বিশ্বামিত্রের মনের

অবস্থা আপনারাই ভাবিয়া দেখিবেন। আমি এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হই যে, তিনি আরক্ত বদন ও নয়নে এবং কম্পিত ওষ্ঠাধরে নিবেদন করিলেন, "বুদ্ধিমান লোকটার নামোল্লেখ করিয়া দিন্। আবার কাহাকে আনিতে কাহাকে আনিয়া বসিব"!

শ্রীভগবান্ সহাস্যবদনে অনন্তদেবকে ডাকিতে বলাতে, বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "ও অনন্তদেব! শীঘ্র আইস, ভগবান্ তোমাকে স্মরণ করিয়াছেন"।

বিনীতভাবে অনন্তদেব উত্তর করিলেন, "ভগবানাদিষ্ট পৃথিভার পরিত্যাগ করিয়া যাই কিরূপে"?

রজোগুণবিশিষ্ট বিশ্বামিত্র প্রতিশ্রুত অর্দ্ধাংশ বাদে বক্রী ৩০ হাজার বৎসরের তপস্যার বল নিজদণ্ডে অর্পণপূর্ব্বক তাহা পৃথিতলে সংলগ্ন করিয়া অনন্তদেবকে বলিলেন, "তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে আসিতে পার। আমি পৃথিবী স্থির করিয়া দিয়াছি"।

তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার তপস্যার অর্দ্ধাংশের বলে তিনি ত্রিভুবন ধারণ করিতে পারেন; সুতরাং তুচ্ছ পৃথিবীর কথা আর কি ভাবিবেন! কিন্তু অনন্তদেবের মস্তক ঈষৎ সঞ্চালনে ধরা অস্থিরা হইতেছেন দেখিয়া, অপমানশঙ্কায় উক্ত যষ্টিতে তাঁহার সম্পূর্ণ তপস্যার বল প্রদান করিয়া তিনি ভাবিলেন, "আবার না হয় ৩০ হাজার বৎসর তপস্যা করিয়া বশিষ্ঠকে দান করিব"। কিন্তু তাহাতেও পৃথিবী স্থির রহিল না দেখিয়া, 'ধিক তপস্যার বল', এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সে বল উক্ত যষ্টি হইতে আকর্ষণ করিলেন এবং অপমানাশঙ্কানিবারণার্থে সে কাষ্ঠখণ্ডে বশিষ্ঠপ্রদত্ত 'তণ্ডুলকণাপ্রমাণ সৎসঙ্গ'-বল প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন, সর্ব্বসংহা সুস্থিরা হইয়াছেন।

নিজের অসারতা ও বশিষ্ঠদেবের দেবাতীত ক্ষমতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বামিত্র অন্যমনস্কভাবে অনন্তদেবকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। অনন্তদেব কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি উত্তর করিলেন "ভগবানের মতে তুমি আমাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান। 'তণ্ডুলকণাপ্রমাণ সৎসঙ্গের' কত গুণ তাহা তিনি একবারমাত্র বলিবেন। তুমি তাহা সম্যকরূপে বুঝিয়া আমার স্থূল বুদ্ধিতে প্রবেশ করাইয়া দিবে"।

অনন্তদেব হাস্যবদনে উত্তর করিলেন, "তবে সে ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য ত আমার বৈকুণ্ঠধাম পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না। এই ত পৃথিবীধারণেই আপনি বুঝিতে পারিতেছেন যে, আপনার ষাটহাজার বৎসরের কঠোর তপস্যার বল অপেক্ষা বশিষ্ঠদেবপ্রদত্ত তণ্ডুলকণাপ্রমাণ সৎসঙ্গের বল কত অধিক"।

অনন্তদেবের কথা শ্রবণমাত্র বিশ্বামিত্র অভিমানশূন্য হইলেন। সত্ত্বগুণ-প্রভাবে তিনি আপনাকে 'তৃণাদপি সুনীচ' মনে করিতে করিতে বশিষ্ঠদেবের নিকটে আসিতে লাগিলেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াই বশিষ্ঠদেব গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহাকে 'মহর্ষি' বলিয়া সম্বোধন করিতে করিতে আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছায় দুইটী হস্ত বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বিশ্বামিত্র অতি কুণ্ঠিতভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণতঃ হইয়া বশিষ্ঠদেবের চরণযুগল ধারণ করিলেন এবং সকাতরে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! এতকালের পর অদ্যই প্রবুদ্ধ হইয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, আমি কীটানুকীট অপেক্ষা অপদার্থ ও নীচ। কবে লোকে আমাকে কৃষ্ণসখা শ্রীঅর্জ্জুনের ন্যায় 'বীভৎসু' বলিয়া ডাকিবে! আপনি আমার গুরু—আর এ অধমকে 'মহর্ষি' বলিয়া উপহাস করিবেন না"।

বশিষ্ঠদেব সস্নেহে তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস! ইতিপূর্ব্বে তুমি কঠোর তপস্যা দ্বারা মহর্ষির সমস্ত গুণই উপার্জ্জন করিয়াছিলে। অভিমানই তাহাদিগকে নিষ্প্রভ করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে অভিমানশূন্য হইয়াছে, আমিও তোমাকে 'মহর্ষি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করি সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে তুমি সত্বরই সম্পূর্ণরূপে অহঙ্কারশূন্য হইয়া পরমপদ লাভ কর"।

কিরূপে বৃদ্ধি করিয়া হীনতেজ জ্বর দূরীভূত করিতে হয়, তাহা বহুদর্শী চিকিৎসকগণই বুঝিতে পারেন। বাক্যাহুতির দ্বারায় অভিমান বৃদ্ধি করিয়া কি প্রকারে অহঙ্কারাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে হয়, তাহা বশিষ্ঠদেবের ন্যায় দেবোপম যোগী পুরুষগণই স্থির করিতে পারেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দুদিনের ধরা।

কিসের এ হাসি রাশী
　　কিসের এ আঁখি জল ?
দুদিনের ধরা এ যে
　　তৃণাগ্রে শিশির-দল।
এত অশ্রু এত তাপ
　　এত ব্যথা হাহাকার
দুদিনে ফুরাবে সব
　　নিমিষেতে একাকার,
এ যে ক্ষুদ্র মরভূমি
　　পলকে স্বপন চুর
প্রভাত-জলদ-রাশী
　　দেখিতে দেখিতে দূর।
আজ যারে হেরিতেছি
　　কাল তারে কোথা পাব !
আজ যারে ভাল বাসি
　　কাল তারে ফেলে যাব !
হাসিলে শারদ-শশি
　　চন্দ্রীকা নাচিলে জলে
তারকা নীলিম ভরা
　　ধরণী ছাইলে ফুলে,
পলকে মাতায়ে প্রাণ
　　কোন দূরে চলি যায় ?
দুদণ্ডের খেলা ভোর
　　অতীতে মিলায় কায়।

মিছা এই ধরা যদি
মরুমরিচীকা-ভার
তবে কেন এত অশ্রু
কেন এত হাহাকার ?

শ্রীমতী সুকুমারী দেবী।

ভারতে লোকক্ষয়।

বহুদিন হইতে বিষম ম্যালেরিয়া জ্বরে বঙ্গদেশে লোকক্ষয়ের আরম্ভ হইয়াছে, এখন কিন্তু ভারতের সর্ব্বস্থানেই ইহার আধিপত্য, এই আধিপত্য অনুদিন ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ম্যালেরিয়ার ক্রমবিকাশের কথা ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, শুদ্ধ বঙ্গ বলিয়া নয় সমগ্র ভারত মহাশ্মশানে অচিরে পরিণত হইবে। দেশে ডাক্তার কবিরাজ ও অপরাপর চিকিৎসকের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়াছে, প্রায় সর্ব্বস্থানেই সর্ব্বপ্রকার ঔষধ সহজপ্রাপ্য অথচ কিছুতেই কিছু হইতেছে না। কারণ রোগের চিকিৎসা লইয়া লোকে যেরূপ ব্যতিব্যস্ত, রোগের নিদান নির্ণয় বা নির্ণীত নিদানের উচ্ছেদ সাধনে তাহার সহস্রাংশের একাংশ চেষ্টাও করে না। শ্রাদ্ধ শান্তি বারোয়ারি এবং বিবিধ আমোদ প্রমোদে দেশে প্রভূত অর্থব্যয় হইতেছে কিন্তু পচা পুকুর ডোবা, প্রবাহশূন্য শৈবালপূর্ণ খাল বিল নদী একই ভাবে বিরাজ করিতেছে। কতশত ধনবানের উচ্চ অট্টালিকা লোকাভাবে ভগ্নস্তূপরূপে পরিণত হইতেছে, কতশত গণ্ডগ্রাম উড় পড়িয়া যাইতেছে ক্ষমতাশালী প্রভুত্বশালী যাহাদের শুদ্ধ কথায়,সামান্য চেষ্টায় অসাধ্যসাধন হইতে পারে তাঁহারা গ্রামে ম্যালেরিয়া দর্শনে স্ব স্ব প্রাণ লইয়া ভিটা ত্যাগ করেন। আর নিরুপায় দরিদ্রগণ জ্বরজ্বালায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরিতে থাকে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকে বারোয়ারির চাঁদা দেয়। শ্রাদ্ধে ও কন্যা পুত্রের বিবাহাদি উৎসবে কর্জ্জ করিয়াও ধূমধাম করে, কিন্তু যাহা লইয়া জগৎ, যাহাতে আমার আমিত্ব, সেই জীবন রক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বথা নিশ্চেষ্ট। যে দেশে পিতা রুগ্ন দেহে সন্তান উৎপাদন করিতে এবং যকৃৎপ্লীহোদর পুত্ররত্নের বিবাহ দিতে ইতস্ততঃ করে না, সে দেশের শিক্ষা মূর্খতার নামান্তর মাত্র, সে দেশের বক্তৃতা পাগলের চীৎকার, সে দেশের

সভাসমিতি উন্মত্তের সম্মিলন ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে! যাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া চিন্তা করিতে জানে না, মিলিত হইয়া কাজ করিতে গেলে নিজেরই পুষ্টির দিকে খরদৃষ্টি রাখে তাহারা মরিবে না তো মরিবে কে?

একমাত্র অবরুদ্ধ জলই ম্যালেরিয়ার কারণ নহে, কারণ বিস্তর। এই সমবেত বহু কারণে ভারত ছারেখারে যাইতেছে এবং অভূতপূর্ব্ব বিবিধ নামধেয় রোগ আসিয়া ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। ম্যালেরিয়া এবং এই সমস্ত নূতন রোগের যত কারণই থাকুক, আমার বিশ্বাস গোবংশ ধ্বংস এবং দরিদ্রতাই তৎসর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। সভ্যতাবৃদ্ধির দ্বারা দেশে গোচারণের স্থান নাই। কাঁচা ঘাসই গরুর পুষ্টিকর খাদ্য, তাহারা সেই খাদ্যের অভাবে সামান্য মাত্র আহারে বা বিচালি দ্বারা উদর পূর্ণ করিতে বাধ্য হয়। অনেকে অবস্থা-বৈগুণ্যে গরু পুষিতেই পারে না। দুষ্ট অর্থাৎ ক্ষুধাতুর গরুর শাসনের জন্য গো-পুলিশ সংস্থাপিত হইয়াছে, এই সমস্ত পুলিশে দুরাচার গরুদিগকে অনশনে কয়েদ থাকিতে হয়। এতদ্ভিন্ন প্রত্যহ অসংখ্য বৃষগাভী এবং গোবৎস মানুষের উদরগহ্বরে প্রেরিত হইতেছে। সমগ্র দেশটাতেই গরু মারিবার ফাঁদ পাতা।

এদিকে দেশে গরুর সংখ্যা যত কমিতেছে, লোকের স্বাস্থ্যও সেই পরিমাণে ক্ষয় পাইতেছে; এদেশের লোকের পক্ষে দুগ্ধ এবং ঘৃতই প্রধান পুষ্টিকর আহার। কিন্তু ইহার পূর্ণ অভাব ঘটিয়াছে। শিশু জলসাগু খাইয়া এবং পূর্ণ বয়স্কেরা কাঁচকলাপোড়া খাইয়া কতকাল তিষ্টিতে পারে। এই অনাহার ক্লিষ্ট অপুষ্ট শিশুদিগের মধ্যে যাহারা ভাগ্যবশে যৌবন সীমায় উপস্থিত হয়, তাহার পিতা মাতার আশীর্ব্বাদে পরিনীত হইয়া পুন্নাম নরকের হস্ত হইতে রক্ষা পায়। এই প্রপৌত্র আবার যথা সময়ে বংশ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়। নির্ব্বংশ হওয়া হিন্দুদিগের পক্ষে বড়ই মনঃক্ষোভের বিষয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এমন করিয়া আর কত দিন চলিবে? তাই মনে হয় ভারতের বিলোপ দূরবর্ত্তী নহে।

একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিলে সম্পূর্ণ না হউক বহু পরিমাণে গরুর অকাল মৃত্যু এবং গোজাতির অবনতির নিবারণ করা যাইতে পারে। সর্ব্বত্র গোচরণের প্রশস্ত ময়দান করাই গোরক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়। মিউনিসিপাল আইনের সাহায্যে মিউনিসিপালিটীর মধ্যে কুত্রাপি ভূমি লাভের ব্যাঘাত হইতে পারে না। তবে কি জান, আমরা মিউনিসিপাল

সভ্য লোকের পায়ে যাহাতে কাদা না লাগে ইহাই আমাদের একমাত্র কার্য্য। এরূপ মনে করিলে কখনই কিছু হইবে না। যে মিউনিসিপালিটীর মধ্যে পরিষ্কৃত পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই, গোচারণের প্রশস্ত মাঠ নাই, লোকেরা জ্বরে, বসন্তে ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে ক্রমাগত মরিতেছে প্রমাদ গুনিয়া বড় মানুষেরা বিপৎকালে জন্মভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিতে বাধ্য, রাজপুরুষেরা কেন এমন স্থানে 'গোদের উপর বিষফোড়া' করিয়া লোকদিগকে অধিকতর ক্লেশভাগী করেন বুঝিতে পারি না।

মিউনিসিপালিটীর ন্যায় মনে করিলে সর্ব্বত্রই গোচারণের মাঠ করা যাইতে পারে, কেবল একটু একতার প্রয়োজন। যে স্থানে বারোয়ারির ধূমধাম হয় সে স্থানে গরুচরিবার মাঠও হইতে পারে। ফলকথা, যদি সবংশে বাঁচিতে চাও, অগ্রে গরু রক্ষা কর। প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ঘৃত খাইতে পাইলে রোগের বীজাণু আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। দুর্ব্বলতাই রোগের কারণ। সকলই দেখিয়াছে লোকে একবার জ্বরাক্রান্ত হইলেই পুনঃ পুনঃ জ্বরে পড়িতে থাকে, কারণ দৌর্ব্বল্য; এই দৌর্ব্বল্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘৃত দুগ্ধ পান। সম্মিলিত চেষ্টায় যেমন বারোয়ারি হয়, সেইরূপ গোচারণের মাঠও হইতে পারে। রেলওয়েও জাহাজ আমাদের ধ্বংশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানকার রোগ সেইখানেই থাকিত, ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক বিভিন্ন দ্রব্য আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিত, ইদানীং তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন ভারতে ও ইংলণ্ডে চাউল এবং গোধূম প্রায় তুল্য মূল্য, ভারত হইতে খাদ্যের রপ্তানি হইতেছে বিদেশ হইতে নানাবিধ অশ্রুত-পূর্ব্ব রোগের আমদানী বাড়িতেছে, লোকে একে খাইতে পায় না তাহার উপর রোগ, কাজেই যম দ্বার যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে উৎপত্তি কমিতেছে।

কেহ কেহ বলেন আমেরিকা ও ইউরোপেও তো রেলওয়ে ও জাহাজ আছে, সেখানে তো লোক না খাইয়া মরে না এক স্থানের রোগ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে না? ইহার উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের লোক মানুষ, আর আমরা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান বিরহিত অক্ষম পশু। তাহারা অন্য দেশ হইতে শস্য সম্পত্তি স্বদেশে লইয়া যায় এবং বৈজ্ঞানিক কৌশলে বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিদেশের ধন রত্ন স্বদেশে আমদানি করে। যেখানে

খাদ্যের ও সম্পদের অভাব নাই, মানুষ মানুষের মত বলীয়ান ও তেজস্বী, তত্রত্য লোক রোগের বীজ পরিপাক করিতে পারে। ভারত নিরন্ন এবং দরিদ্র সুতরাং এখানে যে রোগের একবার আমদানি হয় তাহা আর ছাড়িতে চায় না। রেলওয়ে জাহাজ যেখানকার জিনিস, সেখানেরই গৌরব ও শোভা, আমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কৃতান্ত।

অসময়ে আহার ও আহারান্তেই ছুটাছুটী শীতপ্রধান দেশের পক্ষেই শোভা পায়, আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা। যাহারা ইংরেজী লেখাপড়া করে বা কোন আফিসের চাকর, তাহার অধিকাংশই অম্ল বা অজীর্ণতা ও তদানুষঙ্গিক বিবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কোনরূপে কয়েক দিন বাঁচিয়া থাকে। 'শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্'। শরীর না থাকায় কোন কার্য্যেই ইহাদের আন্তরিকতা নাই, ইহারা যাহা কিছু করে, যাহা কিছু বলে সমুদায়ই সাময়িক উত্তেজনা প্রসূত সুতরাং পরিণাম শূন্যগর্ভ।

কিন্তু আমরা যতই কেন চিন্তাশূন্য ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি বিরহিত হই না রাজ-পুরুষগণ নিশ্চেষ্ট নহেন, তাঁহারা দেশের জন্মমৃত্যুর তালিকা আমদানি রপ্তানির হিসাব, স্বদেশ জাত পণ্যের উৎপত্তি ও স্বদেশীয় পণ্যের বিক্রয় কৌশল আমাদের চক্ষের উপর সর্ব্বদাই ধরিয়া রাখিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য তোমরাও আমাদের মত হও। কিন্তু আজ অন্ধ আমরা তাহা দেখি না, তাঁহাদের ভাব ভঙ্গী বুঝি না সুতরাং আমাদের মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে অপরাধী করা যায় না, আমরা স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি, 'তারার' অপরাধ কি ?

শ্রীবরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়, গোবরডাঙ্গা।

দুঃখ।

কত দুঃখ কত যন্ত্রণা সয়ে
রহিয়াছি আমি, তোমারে চেয়ে,
দিনে দিনে যত সহিয়াছি জ্বালা ;
সেত দুঃখ নয়, তোমারই প্রেমের মালা।

শ্রীজানকীনাথ গুপ্ত।

জাতীয় সঙ্গীত।

পাহাড়িয়া মিশ্র।

হে ভারত, আজি তোমারি সভায় শুন এ কবির গান!
তোমার চরণে নবীন হরষে এনেছি পূজার দান!
এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্ম্মের মতি, এনেছি মোদের প্রাণ!
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ তোমারে করিতে দান!
কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের, অন্ন নাহিক জুটে!
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজি নাহি প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা দীন আয়োজন,
চির দারিদ্র্য করিব মোচন চরণের ধূলা লুটে!
সুর-দুর্লভ তোমার প্রসাদ লইব পর্ণপুটে!
রাজা তুমি নহ, হে মহা তাপস, তুমিই প্রাণের প্রিয়!
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়!
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন,
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন, তাই আমাদের দিয়ো!
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব তোমার উত্তরীয়!
দাও আমাদের অভয় মন্ত্র, অশোক মন্ত্র তব!
দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র, দাও গো জীবন নব!
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব!
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব?

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিমালয় ভ্রমণ। (২)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পথে,—গিরিডি, দেওঘর, বাঁকিপুর।

খামু জংসন হইতে রাত্রি ৯টার সময় মধুপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। গিরিডির ট্রেণ ছাড়িতে অনেক সময় ছিল। টিকিট করিয়া, মাত্র ৴১০ দুই পয়সা রহিল এবং তাহাতে দুইবার চা পান করিলাম। রাত্রি অল্প শীতল ছিল। প্রায় ২টার পর ট্রেণ ছাড়িল এবং ৪টার পর গিরিডি ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। আমি ফাষ্টক্লাস ওয়েটিং রুমে কোচে শুইয়া অল্পক্ষণ নিদ্রা গেলাম। যখন বাহিরে এলাম তখন পরিষ্কার প্রাতঃকাল দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

১০ই আশ্বিন বুধবার, প্রাতে গিরিডিতে ব্রাহ্মগণ প্রভাতী কীর্ত্তন করিয়া পথে চলিয়াছেন, আমি তাহাতে যোগ দিলাম। প্রাতে এরূপ ভগবানের নাম-কীর্ত্তন বড়ই মধুর লাগিল।

১২ই শুক্রবার পর্য্যন্ত গিরিডিতে ছিলাম, তখন এখানে ব্রাহ্মসমাজে উৎসব ছিল তাহাতে যোগ দিলাম। আমাদের আত্মীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার গণেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন, তাঁহার সহিত এই শেষ দেখা হইল। তিনিও বলিয়াছিলেন, "যোগীন্দ্র! বোধহয় তোমার সহিত ইহলোকে এই শেষ দেখা"। আমি এই তিন দিনই গণেশবাবুর বাড়িতে ছিলাম।

গিরিডি বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান, এখানে অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক বাড়ি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের লোকই অধিক। খোলা জায়গায় একটু দূরে দূরে এক একটী বাড়ি, দৃশ্যটী বেশ সুন্দর বোধ হইল। বেড়াইবার মাঠ বিস্তৃত। এখানে অনেক ব্রাহ্মবন্ধু ছিলেন, কিন্তু কাহাকেও আমার পাথেয়র কথা বলিতে হয় নাই। আমি আপাততঃ এখান হইতে দেওঘর যাইব শুনিয়া শ্রদ্ধেয় রামলাল বাবু বিশেষ সন্তোষ ভাবেই কিঞ্চিৎ পাথেয় দিয়াছিলেন।

১৩ই আশ্বিন শনিবার প্রত্যূষে যাত্রা করিলাম। ৫-২০ মিনিটে গিরিডি হইতে ট্রেণ ছাড়িল, কিছুক্ষণ পরে মধুপুর গাড়ি বদলের সময় দেখি, উমেশবাবু! (সিটী কলেজের প্রিন্সিপল শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়) পচম্বা হইতে দেওঘর আসিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বালকপুত্র আনন্দ। হঠাৎ আমাদের এই

সম্মিলন বিশেষ আনন্দপ্রদ হইল এবং উমেশ বাবুর সহিত দেওঘরে আমি প্রকাশ বাবুর বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। এখানে পারিবারিক উপাসনা উমেশবাবু করিলেন, তাঁহার সুমিষ্ট উপাসনায় যোগ দিয়া এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গীত করিয়া কয়েকদিন বড়ই উপকৃত হইলাম। সেই সময়ে দেওঘর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার ফকির চন্দ্র সাধুখাঁর বাড়িতে উপাসনা ছিল। সোমবার রাত্রে স্বর্গীয় রাজ নারায়ণ বসু মহাশয়ের গৃহে তাঁহার পুত্র যোগীন্দ্র-নাথের শ্রাদ্ধোপাসনা হইল। ঋষিপুত্র, যোগীন্দ্রনাথও কৌমার্য্য ব্রতধারী ঋষি ও ভক্ত সেবক ছিলেন। রাজ নারায়ণ বসু মহাশয়ের কন্যা ও জামাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার মিত্র মহাশয় তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণসহ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উমেশবাবু আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। এই পারলৌকিক অনুষ্ঠানের সময় আমার মনে ভগবানের অনন্তভাব, ও আমাদের প্রতি তাঁহার অনন্ত করুণার এমন একটী সুন্দর স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, যাহা এখন প্রকাশ করা সহজ বোধ হয় না, তবে যতদূর স্মরণ হয়; তাহাতে এইমাত্র বলা যায় যে—ভগবান এই জগতে আমাদের মঙ্গল ও সুখ শান্তির জন্য কত অসংখ্য বিষয় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমরা অনন্তকাল ধরিয়া (ইহ, পরলোকে) তাহা উপভোগ করিব। তিনি যে অনন্ত করুণাময়, এই ভাব উজ্জ্বল বোধ হইয়াছিল।

সোমবার রাত্রেই আমরা দেওঘর হইতে রওনা হইলাম। উমেশবাবুর সহিত আমার অনেক দিনের আলাপ পরিচয়াদি ভাল রকমই ছিল কিন্তু এই তিন দিনের সঙ্গগুণে কি যে মহচ্চরিত্রের ভাব দান করিলেন, তাহা আমি কোন কালে ভুলিতে পারিব না। এমন শান্ত সুমিষ্ট প্রেমপূর্ণ জীবন বড়ই দুর্লভ। ১৪।১৫ বৎসরের বালক আনন্দও একখানি ছোটখাট "প্রিয়দর্শন" ছবির মত, আমার প্রাণে সেই হইতে জাগরিত হইয়া রহিয়াছে। আনন্দের পাঠশিক্ষাদি পথে পথেও পিতার নিকট অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়াছিল দেখিয়া ভাবিলাম, পণ্ডিত পুত্রের শিক্ষা এইরূপে চলিবে না কেন? যাত্রাকালিন উমেশ বাবু আমার হাতে আস্তে আস্তে একটী টাকা গুঁজিয়া দিতেছেন দেখিয়া, আমি প্রথমে তাঁহার নিকট টাকা লইতে অস্বীকার করিলাম; কিন্তু তাঁহার ভাব আমাকে পরাস্ত করিল। প্রকাশবাবুও ১৲ টাকা দিয়াছিলেন।

আমরা বৈদ্যনাথ জংসনে ২টার সময় একস্‌প্রেস্ ট্রেণ ধরিলাম, উমেশবাবু

চুনার যাইবেন, বোধহয় তাঁহার ইন্‌টার ক্লাসের টিকিট ছিল আমি বাঁকিপুরের টিকিট করিয়া থার্ডক্লাস গাড়িতে উঠিলাম। গাড়িতে অত্যন্ত ভিড় ছিল কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ বসিবার স্থান পাইলাম, এবং ১৬ই মঙ্গলবার প্রাতে বাঁকিপুর পৌঁছিলাম।

১৬ই ও ১৭ই দুইদিন বাঁকিপুর শ্রদ্ধেয় প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ি থাকিয়া ডাক্তার কামিখ্যাবাবু, শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল গুপ্ত ও ভ্রাতা গণেশপ্রসাদ প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখা করিলাম। অনেক দিনের পর সাক্ষাতে পরস্পরের মধ্যে আনন্দানুভব হইল। শ্রীযুক্ত ডাক্তার কামিখ্যা বাবু যখন মঙ্গলগঞ্জে ছিলেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী নিতান্ত শিশু ছিল; সে স্ত্রীলোক কিম্বা পুরুষ মাত্রকেই মা সম্বোধন করিত অর্থাৎ তাহার নিকট এ জগত মা বলিয়াই বোধ হইত মাত্র। সেই শিশু "নবজীবনকে" বড় দেখিয়া সুখী হইলাম। প্রকাশবাবু এ সময় পাহাড়ে গিয়াছিলেন, তাঁহার সম্পর্কীয় নাতি, গিরিন্দ্রনাথ বাড়িতে ছিল, ছেলেটী বেশ বুদ্ধিমান ও নম্র; আমার কোন কষ্টই হয় নাই। মেয়েদের বোর্ডিং প্রকাশবাবুর স্বর্গীয়া পত্নী অঘোর কামিনীর স্মৃতি জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। বাড়ির উপাসনাগৃহটী নিতান্ত পবিত্র গাম্ভীর্য্যভাবপূর্ণ; অনুরুদ্ধ হইয়া এই গৃহ-দেবালয়ে মেয়েদের লইয়া আমাকে দুইদিনই উপাসনা করিতে হইয়াছিল।

১৮ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার, প্রাতে ভ্রাতা গণেশপ্রসাদের ছাত্রাবাসে (বোর্ডিংএ) আমরা উভয়ে উপাসনা করি; উপাসনার কার্য্য আমাকেই করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু উপাসনার প্রথমে ভ্রাতা গণেশপ্রসাদ একটী সঙ্গীত করেন, অদ্যাপি সেই সঙ্গীতের কথা ভুলিতে পারি নাই। যখন যেখানে সেই সঙ্গীত করিয়াছি, তাহা যাঁহারা শুনিয়াছেন প্রায়ই তাঁহারা তাহাতে তৃপ্ত হইয়াছেন। সে সঙ্গীতটী এই :—

কীর্ত্তনের অংশবিশেষ।

(খয়রা) "চল চল ভাই, মার কাছে যাই,
নাচি গাই প্রেমভরে।
(গিয়ে) অমর ভবনে, দেব দেবী সনে,
হেরি তাঁরে প্রাণ ভরে।

থাকিব না আর মোরা ইন্দ্রিয়গ্রামে,
যোগবলে প্রবেশিব চিদানন্দ ধামে ;
(আর রব না, রব না ;—দেহ-পুর-বাসে)
সেই জন্মস্থান হেথা অবস্থান,
কেবল দুদিনের তরে। (চল চল ভাই ইত্যাদি)
মহামিলন সঙ্গীত গাইব সকলে,
বসে মা আনন্দময়ীর শ্রীচরণ তলে,
(সুরে সুর মিলায়ে) অনন্ত জীবনে
অনন্তমিলনে, বিহরিব লোকান্তরে"।

তৎপরে আহার করিয়া ষ্টেসনে আসিয়া ১০-৩৫ ট্রেণে বাঁকিপুর ছাড়িলাম।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। (২)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভগবান স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুষের বিদ্যা শিক্ষার যেমন প্রয়োজন, স্ত্রীলোকেরও তদনুরূপ আবশ্যক। আমি এমন কথা বলিতে চাহি না যে, পুরুষ অর্থোপার্জ্জনের জন্য যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করেন, স্ত্রীলোকেও সেই সমুদয় বিদ্যা শিক্ষা করুন। জ্ঞানার্জ্জনের জন্যই বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন। যাহাতে প্রকৃত জ্ঞান-লাভ হয়, তাহাই স্ত্রীলোকের শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হিন্দুগণ গৌরব করিয়া বলিয়া থাকেন, বিবাহিত না হইলে, মানব পূর্ণ-অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। অনূঢ় অবস্থায় মানব অর্দ্ধাঙ্গ থাকে। বিশেষতঃ হিন্দুর নিকট স্ত্রী বিহারের সামগ্রী নহে ; অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী। হিন্দুশাস্ত্রে সহধর্ম্মিণীকে ত্যাগ করিয়া কোন ধর্ম্মকার্য্য করিলে তাহা অপূর্ণ থাকিয়া যায় ইহা উক্ত আছে। সহধর্ম্মিণীকে লইয়া যদি ধর্ম্মকার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীজাতিকে শিক্ষিত করিতে হইবে। নারীজাতি যদি শিক্ষিতা না হয়েন, তাহা হইলে মানব পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না ; কেন না, অর্দ্ধাঙ্গ অমুন্নত থাকিলে, অপর অর্দ্ধাঙ্গ পুষ্টিলাভ করিতে অক্ষম হয়।

সুতরাং মানব পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইল না। শিক্ষা ব্যতীত ধর্ম্মভাবেরও উন্মেষ হয় না। বিদ্যা ধর্ম্মের একটী প্রধান সহায়। শিক্ষা না হইয়া ধর্ম্মভাব উন্মীলিত হইলে, উহার আর উৎকর্ষতা লাভ হয় না; বরং কোন কোন স্থলে উহার দ্বারা নানাবিধ কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভগবান কি? তাঁহার উপাসনাই বা কি? এবং তাঁহার উপাসনায় মানবের প্রয়োজন কি? ইত্যাদি বিষয় জ্ঞাত হইতে না পারিলে যে তাঁহারা কুসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? প্রকৃত সুশিক্ষা অভাবে, তাঁহারা অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া ও অধর্ম্মে নিরত হইয়া অমূল্য মনুষ্যজীবন বৃথা নষ্ট করেন, ইহা কি কম দুঃখের বিষয়!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, চাতরা।

স্থানীয় সংবাদ।

বিগত ২রা অগ্রহায়ণ, খাঁটুরা নিবাসী মঙ্গলগঞ্জের জমিদার স্বর্গীয় লক্ষ্মণচন্দ্র আশ মহাশয়ের দৌহিত্রী ও সুবিখ্যাত ডাক্তার কর্ণেল আর, এল, দত্ত (রসিক লাল দত্ত) মহাশয়ের পৌত্রী, কুমারী আশালতার সহিত বাঁকিপুরের ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র আরার সিভিল হাঁসপাতালের ডাক্তার শ্রীমান্ করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ ৩৭নং থিয়েটার রোডস্থ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় পাত্র পাত্রীর জীবনে ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত হইয়া ব্রাহ্ম পরিবারের আদর্শ উজ্জ্বল হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গোবরডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায় দেওয়ানজী মহাশয় আর ইহলোকে নাই। তিনি অনেকদিন হইতে ভগ্নশরীরে সংসারের নানা পরীক্ষা ভোগ করিয়া, অনূ্ন ৬৫ বৎসর বয়সে বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ নিমোনিয়া রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যেরূপ বিচক্ষণ তদ্রূপ শান্ত নিরীহ-স্বভাব-সম্পন্ন ছিলেন,

জমিদারী বিভাগে কার্য্য করিয়া এমন শান্তভাব রক্ষা করা, এ তাঁহার স্বাভাবিক জীবনেরই ফল। গোবরডাঙ্গা জমিদার বাবুদের ষ্টেটে তিনি যৌবনকাল হইতে কার্য্যারম্ভ করিয়া চিরদিন সসম্মানে কাটাইয়াছিলেন। যদিও মধ্যে অল্পদিন ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে চাঁচল প্রভৃতি ষ্টেটে অল্পদিন কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে আবার সেই পূর্ব্ব পদেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আর অধিককাল তাঁহাকে পৃথিবীর দাসত্ব করিতে হইল না। তাঁহার জীবন আর একটী স্বাভাবিক সদ্ভাব ছিল। তিনি অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন, যেমত তাঁহার চিরানুরক্ত ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় কুঞ্জবাবুর শ্রদ্ধা-ভক্তি জ্যেষ্ঠের প্রতি কোনদিন বিচলিত হয় নাই, তেমনি তিনিও সংসারে নানাবিধ স্বার্থের সংঘর্ষ সত্বেও চিরদিন ভ্রাতার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ এবং ঐক্যতা রক্ষা করিয়াছিলেন। কেবল সহোদর ভ্রাতার প্রতি নহে, পুরন্দরবাবুর মৃত্যুতেও তিনি সহোদরের ন্যায় কাতর ছিলেন। যাহা হউক ঈশ্বর কৃপায় তিনি উভয় পক্ষের পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র, দৌহিত্রী প্রভৃতি যাঁহাদিগকে ইহলোকে রাখিয়া গেলেন, তাঁহারা তাঁহার ঐ সকল সদ্গুণের অধিকারী হউন, এবং ভগবান পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার শান্তিক্রোড়ে স্থানদান করুন।

বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণের বনগ্রামের সহযোগী "পল্লীবার্ত্তায়" জনৈক পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন,—"গোবরডাঙ্গা ইংরাজী বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল নহে। বর্ত্তমান সময়ে কুশদহ সমাজে অনেক কৃতবিদ্য উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা সকলেই এই বিদ্যালয়ের উন্নতি দর্শনে উদাসীন। কেবলমাত্র গোবরডাঙ্গার বাবুদের কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই এই বিদ্যালয় চলিতেছে। ইহার উপর যদি দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পতিত হয়, তবে অচিরাৎ এই বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন হইবে। আশা করি সাধারণে এ বিষয় যত্নবান হইবেন"। পত্রপ্রেরক মহাশয় কথাটী উল্লেখ করিয়া ভালই করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের ধারণায়, তাঁহার "আশা করি সাধারণে এ বিষয়ে যত্নবান হইবেন" এই মন্তব্যটী, উল্টা বলা হইয়াছে! কারণ অগ্রে বাবুদের এমন কিছু যত্নবান

হওয়া আবশ্যক, যাহাতে স্কুলের প্রতি সাধারণে যত্নবান হন। নতুবা আপন হইতে দেশের লোক যত্নবান হইবেন তাহার বড় সম্ভাবনা নাই। বড়বাবু ইচ্ছা করিলে দেশের কৃতবিদ্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী 'স্কুলকমিটী' গঠন করিয়া, যোগ্য ব্যক্তিগণের উপর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার দিয়া, বৎসর বৎসর স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ, ছেলেদের উৎসাহজনক নানাবিধ উপায় গ্রহণ এবং নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা, এবম্বিধ উপায় দ্বারা শীঘ্রই স্কুলের উন্নতি করিতে পারেন। অবশ্য এ প্রকার করিতে হইলে আরও অর্থের আবশ্যক; বড়বাবু একটু চেষ্টা করিলে যাহা হইতে পারে, আর কাহার দ্বারা তাহা হয় না, কিন্তু সেরূপ মতি ও সে মন কোথায়? বহুদিন পূর্ব্বে যখন শক্তিকণ্ঠবাবু হেড-মাষ্টার ছিলেন, তখন একবার স্কুলের মুখ ফিরিয়াছিল, সেবার ৪টী ছেলেই প্রথম বিভাগে পাস হইয়াছিল। মঙ্গলগঞ্জ মিসন হইতে ছেলেদের মেডেল দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমান বাবুদের কথা ছাড়িয়া দিয়া যুবক বাবুদের কথা ভাবিলেও মনে হয় তাঁহারাও যে দেশের কাজ করিবেন এমন লক্ষণ ত দেখা যায় না।

দ্বিতীয় বর্ষ 'কুশদহ'র উন্নতি দর্শনে অনেকে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কুশদহের স্থায়ীত্ব কামনাসূচক পত্রাদি লিখিতেছেন। এরূপ কামনা অধিকাংশের মনে হইলে সচ্ছন্দে কাগজখানি পরিচালিত হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে।

আমরা এবার যে সকল নূতন গ্রাহকের নামে কুশদহ পাঠাইতেছি, তাহা সকলেই গ্রহণ করিতেছেন, ইহাতে আমরা বুঝিতেছি, তাঁহারা গ্রাহক হইলেন; অন্যথা অনিচ্ছা থাকিলে একটু জানাইবেন। অগ্রিম চাঁদা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাঠা'ন সকলের পক্ষে ঘটে না, এজন্য আমরা পর পর ভিঃ, পী, করিতে চাই, আশাকরি ভিঃ, পী, ফেরত দিয়া আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। তবে, ঈশ্বরকৃপায় এই সামান্য চাঁদা দানে যাঁহাদের কষ্ট নাই, তাঁহারা মণি-অর্ডারে পাঠাইলেই ভাল হয়। নতুবা মাসিক ২৯৲ ৩০৲ ব্যয় নির্ব্বাহ আমরা কিরূপে করিব?

Printed by J. N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

দ্বিতীয় বর্ষ] পৌষ, ১৩১৬। [৩য় সংখ্যা।



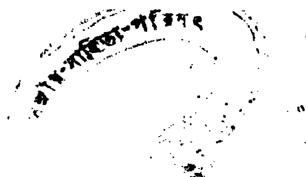
কুশদহ

গাঁটুরা গোবরডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়
সম্বলিত ধর্ম্ম, সমাজ ও
বিবিধ বিষয়ক
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

কুশদহ-কার্য্যালয়
২৮।১ সুকিয়াষ্ট্রীট কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১।০ মাত্র। প্রতি সংখ্যা নগদ মূল্য /৫ পয়সা।



২য় বর্ষ। পৌষ ১৩১৬। ৩য় সংখ্যা।

সঙ্গীত।

বেহাগ।—আড়া।

তোমারি করুণায়, নাথ সকলি হইতে পারে।
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে।
অবিশ্বাসীর অন্তর, সঙ্কুচিত নিরন্তর,
তোমায় না করে নির্ভর, সর্ব্বদা ভাবিয়া মরে।
তুমি মঙ্গল-নিদান, করিছ মঙ্গল বিধান,
তবে কেন বৃথা মরি, ফলাফল চিন্তা করে।
ধন্য তোমার করুণা, পাপীকেও করে না ঘৃণা,
নির্ব্বিশেষে সমভাবে, সবে আলিঙ্গন করে॥

শাস্ত্র সঙ্কলন।

১। ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

ঋকবেদ মং ১। অং ২২। মু ১৬৪। ঋ ৩৯।

যাঁহাতে সমুদায় দেবগণ অধিবাস করিতেছেন, সেই আকাশস্বরূপ অক্ষর পরব্রহ্মে ঋক্ সকল স্থিতি করে। যে ব্যক্তি তাঁহাকে না জানিল, সে ঋক্‌দ্বারা কি করিবে? যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা আত্মস্বরূপে অবস্থিত হন।

২। প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরূত
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনোবিদুঃ
তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যং মনসৈবাপ্তব্যম্॥

যজুর্ব্বেদ, প্রপাং ১৪। অধ্যায় ৭। প্রাং ২। য ২১।

যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মন বলিয়া জানেন; তাঁহারাই সেই পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে নিশ্চয় জানেন। কেবল মনের দ্বারাই তিনি গ্রাহ্য হয়েন।

৩। অকামো ধীরো অমৃতঃ সয়ম্ভুং রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোবাত্মানং ধীরমমরং যুবানম্।

অথর্ব্ববেদ ১০।৮।৪৪।

সেই পরমাত্মা কামনাপরিশূন্য, বিকারবিরহিত, অমৃত, স্বয়ম্ভু, নিজ আনন্দে নিজে পরিতৃপ্ত, কিছুতেই ন্যূন নহেন, অবিকারী অমর শ্রেষ্ঠ সেই পরমাত্মাকে জানিয়া মনুষ্য আর মৃত্যুকে ভয় করে না।

৪। অপরা ঋগ্বেদোযজুর্বেদঃ সামবেদো-
দথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং
নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যথা তদক্ষরম ধিগম্যতে

মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৫।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, এ সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যাহা দ্বারা সেই অবিনাশী পুরুষকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

৫। ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥

ঈশোপনিষৎ।১।

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ তৎসমুদায়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া ভোগ কর; কাহার ধনে লোভ করিও না।

৬। নাহং মন্যে সুবেদেতি, নো ন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ, নো ন বেদেতি বেদ চ॥

তলবকারোপনিষৎ।১০

আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না ; আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমাদিগের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।

৭। অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥

কঠোপনিষৎ। ২। ২০।

পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, এবং মহৎ হইতেও মহৎ। তিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন। বিগতশোক নিষ্কাম ব্যক্তি সেই ইন্দ্রিয়াতীত বিধাতা ও তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে দর্শন করেন।

৮। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥

কঠ ২। ২৩।

অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা মেধা দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। (ক্রমশঃ)

কুশদহ। (২)

ইছাপুর ও চৌবেড়িয়া।

"If after every tempest come such calms,
May the winds below till they have wakened death,"

(Shakespeare)

"উত্থান ও পতন" জগতের নিয়ম। যে মিশর, রোম, গ্রীস একসময়ে উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল আজ তাহা কোথায়? যে আর্য্যগণ বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও রণকৌশলে এক সময়ে সমগ্র জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল

আজ তাঁহাদের সে সমস্ত কীর্ত্তি অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যখন সবই সেই নিয়মের অধীন তখন একটা সামান্য কুশদহ সে নিয়মের অধীন হইবে না কেন? যেমন প্রবল ঝটিকার পর প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করেন, সেইরূপ "কুশদহ" বঙ্গদেশের মধ্যে উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া এক্ষণে অবনতির নিম্ন স্তরে সমাসীন হইয়াছে। কুশদহের অবনতির কারণ কি? যতদিন কুশদহ মধ্য প্রবাহিতা যমুনানদী খরস্রোতা ছিল ততদিন ইহার অবনতির কোন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যমুনানদীর অবনতির সহিত যে কুশদহের অবনতি ইহা অনেকে স্বীকার করিবেন।

কুশদহ পূর্ব্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে ইহার অধিকাংশ যশোহর ও ২৪ পরগণার অন্তর্গত, অল্প অংশ নদীয়ার মধ্যে অবস্থিত। এ প্রদেশের মধ্যে কোন পাহাড় নাই। প্রাকৃতিক দৃশ্যে ইহা একটী সুজলা সুফলা শ্যামল শস্যক্ষেত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার মধ্যে নদী, বিল, খাল, জঙ্গল প্রভৃতি সমস্তই আছে। নদীর মধ্যে যমুনা নদীই প্রধান। ইহা পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে কাঁচড়াপাড়ার নিকট ভাগিরথী হইতে বহির্গত হইয়া বাগের খালের মধ্যদিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বমুখী হইয়া, সোনাখালি, বীরুই, চৌবেড়িয়া, সাতবেড়িয়া, জলেশ্বর, গাইঘাটা, মাটিকোমরা, শ্রীপুর, নাইগাছি, মল্লিকপুর, বালিয়ানী, গৈপুর, গোবরডাঙ্গা, গয়েশপুর, ঘোষপুর ও চারঘাটের নিম্ন দিয়া চারঘাটের কিছু পূর্ব্বে ইছামতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। কুশদহের অনেকগুলি গ্রামই ইহার তীরে অবস্থিত। ইহার সহিত আরও দুইটী নদী মিলিতা হইয়াছে—একটী টেংরার খাল অপরটী চালুন্দিয়া। টেংরার খাল আজও বর্ত্তমান কিন্তু চালুন্দিয়া একেবারে মজিয়া গিয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে বিল ও খালে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। শুনা যায় পূর্ব্বে ইহা অত্যন্ত প্রশস্ত নদী ছিল। ইহা দিয়া অনেক বড় বড় নৌকাদি গমনাগমন করিত। এই চালুন্দিয়ার গর্ভে পুষ্করিণী খনন করিবার সময়ে অনেকে বড় বড় নৌকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইয়াছেন।

কুশদহের মধ্যে ইছাপুর একটী প্রাচীন স্থান। ইছাপুরের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া বড়ই কঠিন। অনেকে অনুমান করেন ইছাপুরের প্রাতঃস্মরনীয় ৺ রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের সময় হইতে ইহার উন্নতি। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের পূর্ব্বে ইছাপুরের কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাই না বলিয়া আমাদের এরূপ ধারণা।

১৫৭৫ খৃঃ অব্দে বাঙ্গার সুবাদার দাউদ খাঁ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে যখন দিল্লীর প্রধান সেনাপতি তোডরমল্ল উক্ত বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত হন তখন চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের (আধুনিক চৌবেড়িয়া) কায়স্থ রাজা সমর শেখর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন; ঠিক সেই সময়ে ইছাপুরে নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী নামে একজন সামান্য জমীদার ছিলেন। ইঁহাদিগের পর জলেশ্বরের রাজা কাশীনাথ রায়ের নাম পাওয়া যায়। কাশীনাথ রায়ের নিকট সিদ্ধান্তবাগীশ একজন সামান্য কর্ম্মচারীরূপে থাকিতেন। রাজা কাশীনাথের মৃত্যুর পর সিদ্ধান্তবাগীশ একজন বিখ্যাত যোগ-সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া খ্যাত হন। বঙ্গের শেষবীর যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্য সিদ্ধান্তবাগীশের অলৌকিক কার্য্যে তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। আবার বঙ্গের সুবাদার মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিল্লীনগরীতে লইয়া যাইতেছিলেন তখন ইছাপুরের নিকট শিবির সন্নিবিষ্ট করিয়া অবস্থান কালে নিজ অদ্ভুত ক্ষমতাবলে মানসিংহের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই বলে সিদ্ধান্তবাগীশ ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের দরবারে সম্মানিত হইয়াছিলেন। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ ইছাপুরের চৌধুরী বংশের আদি পুরুষ। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ, আদিশূর রাজার যজ্ঞে আনীত কান্যকুব্জবাসী দক্ষের সন্তান। ইঁহার সবিশেষ পরিচয় গৈপুর নিবাসী মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুশদহের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় দিয়াছেন।

চৌবেড়িয়া যমুনানদীর উপরেই অবস্থিত। যখন সমরশেখর চৌবেড়িয়ায় রাজত্ব করিতেন সেই সময়ে ও তৎপূর্ব্বে ইহার নাম চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ ছিল। তৎপরে ইহার নাম সংক্ষেপ করিয়া চৌবেড়িয়া হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যমুনা নদী ইহার প্রায় চারিদিকে বেষ্টিত বলিয়া ইহার নাম চৌবেড়িয়া হইয়াছে। চৌবেড়িয়া স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম স্থান। ইঁহার পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। ১৮৩১ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম ও ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হয়। ইনি শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়া পরে হুগলী কলেজে ও অবশেষে কলিকাতার হিন্দু কলেজে পাঠ সমাপ্ত করেন। ছাত্রজীবনে ইনি উৎকৃষ্ট বালক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন এবং ছাত্রবৃত্তি পুরস্কারাদিও প্রাপ্ত হন?

১৮৫৫ খৃঃ অব্দে দীনবন্ধু বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ডাক বিভাগের কার্য্যে প্রবিষ্ট হন। এবং অতি অল্প কাল মধ্যে শ্রমশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া ১৫০৲ টাকা বেতনে ডাক বিভাগের অন্যতম সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার কার্য্য দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন।

ছাত্রাবস্থা হইতে দীনবন্ধু বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিতেন। তাৎকালিক প্রসিদ্ধ প্রভাকর সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত ইঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। ইনি মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিয়া "প্রভাকর" পত্রে প্রকাশ করিতেন। ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে দীনবন্ধু "নীলদর্পণ" নাটক রচনা করেন। এই নাটক মহাত্মা লঙ্‌ সাহেব ইংরাজীতে অনুবাদ করায় দেশ মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। ইহার জন্য লঙ সাহেবের কারাদণ্ড পর্য্যন্ত হয়। নীলকর দিগের অত্যাচার এই "নীলদর্পণের" জন্য অনেক কমিয়া যায়। "নবীন-তপস্বিনী, "সধবার একাদশী" "লীলাবতী" প্রভৃতি নাটক এবং "জামাইবারিক" প্রভৃতি প্রহসন ও "দ্বাদশ কবিতা" এবং "সুরধনী কাব্য" নামক পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার রচনা ললিত ও মনোহর। হাস্যরসে দীনবন্ধুর সমকক্ষ বঙ্গভাষার লেখক দিগের মধ্যে নাই বলিলেও হয়। কুশদহ দীনবন্ধুর জন্য সম্মানিত।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়।
ভূতপূর্ব্ব 'প্রভা' সম্পাদক।

সত্য পরিত্যাগে—ভারতের পতন।

বহুকাল পূর্ব্বে গ্রীসাধিপতি—দিগবিজয়ী আলেকজান্দার দি গ্রেট্‌ ভারত জয় করিতে আসিয়াছিলেন। পুরুরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পুরু পরাজিত হইয়াছিলেন। সৈন্য সামন্তবিহীন পুরুরাজ বিজয়ী আলেকজান্দারের সম্মুখে নীত হইলে নির্ভিক ও অক্ষুদ্ধচিত্তে, বিজয়ীর সম্মুখে মৌন হইয়া রহিলেন। আলেকজান্দার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাজয় স্বীকার করেন কিনা। "না" এই উত্তর পাইয়া গ্রীসাধিপতি প্রশ্ন করেন,

"আপনার 'না' বলিবার কারণ কি।" পুরু উত্তর করিয়াছিলেন, "সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প থাকাতে আমি এক্ষণে সৈন্য শূন্য হইয়াছি; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহই এরূপ নিবীর্য্য ছিল না যে প্রাণ ভয়ে তাহাকে সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে হয়। ফলতঃ শত্রুপক্ষীয় দ্বিগুণ সৈন্যদিগকে সমন সদন দেখাইয়া আমার সৈন্য দল স্বর্গের প্রশস্ত সোপানে আরোহণ করিয়াছে। আমি এক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিত; কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শন কুলক্রমাগত আচরণের বিরুদ্ধ বলিয়াই—যবনজেতা—ক্ষত্রিয় বীরকে দেখিতে পাইতেছেন। যদ্যপি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তাঁহার অভিরুচি হয়,—তাহা হইলেই যবন ও ক্ষত্রিয় শোণিতের প্রভেদ কি—আমি তাহা যবনবীরকে বুঝাইয়া দিবার যত্ন করিতে পারি।"

ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে উভয়েই একইরূপ অস্ত্রে সুশোভিত হইলেন। মানসিক ও দৈহিক বলে এবং অস্ত্র সঞ্চালনে বোধ হয় উভয়েরই সমান নৈপুণ্য ছিল; কারণ তাহা না হইলে বাগযুদ্ধের দ্বারায় ক্রোধ বৃদ্ধির প্রয়োজন হইত। যাহা হউক এ যুদ্ধে আলেকজান্দারেরই পরাজয় হইয়াছিল। গ্রীসরাজ-কুলতিলক ইহার পর আর ভারত অধিকার করিতে যত্ন করেন নাই। তাঁহার মহানুভবতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই যে তিনি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন, "যদিও গৃহ-বিবাদে এক্ষণে ভারতের ক্ষত্রিয় সন্তান অবসন্ন, তত্রাচ কেহ যেন মনে কখন না ভাবেন যে ক্ষত্রিয় বীর বীর্য্য হীন। আমি ইহাও না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে বিশেষ অনুসন্ধানেও আমি বা আমার অনুচরবর্গের মধ্যে কেহই একজন ইতর হিন্দুকেও মিথ্যা কথা বলিতে শুনিলাম না।"

বহু বৎসর পরে চীন দেশের সুবিখ্যাত ও সুযোগ্য পরদেশ ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে দ্বাদশ বৎসর অবাস্থতির পর স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন, এ স্বর্ণ-প্রসূতির সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে কেহই কখন মিথ্যা কথা বলে না। প্রমাণ স্বরূপ তিনি অনেক কথাই লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যাপারটি বোধ হয় মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয় পুলকিত করে।

চীন মহোদয় এক দিবস কোন ভারতবর্ষীয় বিচারপতির নিকট উপবিষ্ট হইয়া বিচার শ্রবণ ও পদ্ধতি দর্শন করিতেছিলেন। জনৈক ইতর লোকের উপর অভিযোগ হইল। পরিষ্কাররূপে প্রমাণ হইলে প্রাণবধই তাহার দোষের সমুচিত দণ্ড। বিচারপতির সম্মুখে সে আনীত হইল। তিনি তাঁহাকে পরিষ্কাররূপে

বুঝাইয়া দিলেন যে, যদ্যপি সে উক্ত দোষ স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। অতিশয় কাতর ভাবে ও করযোড়ে সে নিবেদন করিল যে, সে তাহার শোক সন্তপ্তা বৃদ্ধা জননীর এক মাত্র অবলম্বন। বিচারপতি বিষণ্ণ-ভাবে বলিলেন, যে দোষ অস্বীকার করিলেই তাহার নিস্কৃতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; কারণ তাহার উক্তা বৃদ্ধা জননী ভিন্ন তাহার উক্ত অপরাধের অন্য সাক্ষী ছিল না। দোষী ইতর লোক কাঁদিয়া আকুল, সে বলিতে পারিল না যে সে সে কুকর্ম্ম করে নাই। তাহাকে অন্তরিত করা হইল। সাক্ষীরূপে তাহার জননী আহুত হইয়া কিছুতেই বলিতে পারিল না যে তাহার একমাত্র পুত্র সে দোষের কার্য্য করে নাই! বিচারপতি বৃদ্ধাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, এ মকর্দ্দমায় অন্য সাক্ষী ছিল না। তাহার সন্তান নির্দ্দোষী এই কথাটি মাত্র সে একবার তাহার মুখ নির্গত করিলেই তাহার পুত্রকে লইয়া অক্ষুব্ধচিত্তে গৃহে গমন করিতে পারে। কিন্তু চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে ভাসাইতে বৃদ্ধা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, "আমার অদৃষ্ট দোষে বাছা যে সে দোষ করিয়াছে"।

হিন্দু সন্তানগণ! একবার ভাবিয়া দেখ,—হিন্দুত্ব কি ছিল, আর এখনই বা হইয়াছে কি?

ভারতের অধঃপতনের পরিণাম, তাহাতে মুসলমান অধিকার স্থাপন। ছয় সাত শত বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইলে—ইংরাজাধিকার আরম্ভ হয়। রাজ বিপ্লবে বা পরিবর্ত্তনে যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে তাহা দূরীভূত হইলে, অর্থাৎ প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে, লোকমনোমুগ্ধকর ও আপামর সাধারণকে শিক্ষাপ্রদ কথকতা, চিরস্মরণীয় শ্রীশ্রীগদাধর শিরোমণি মহাশয় এই বঙ্গদেশেই সুপ্রকাশ করেন। তাঁহার এ কীর্ত্তি বোধ হয় চিরকালই জগতে অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া ঘোষিত হইবে; কারণ এরূপ প্রথা অন্য কোন দেশে কখন ছিল না— নাই এবং হইবে বলিয়াও অনুমান করা যায় না। যখন শিরোমণি মহাশয়ের যশে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি এক দিবস অপরাহ্নে কোন পথিক বিশ্রাম-বিপণি সম্মুখে বাহক দিগের বিশ্রামার্থে শিবিকা রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই কোন সুবেশ সম্পন্ন ভদ্রলোককে তাঁহার নিকট আগমন করিতে দেখিয়া শিবিকা হইতে

বহির্গত হন এবং সে আগন্তুককে নত শির দেখিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করেন। আগন্তুকও শিবিকাতেই গমনাগমন করেন, ইহা জ্ঞাত হইয়া শিরোমণি মহাশয় বিবেচনার সহিতই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, কিছুক্ষণ পরে উক্ত ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন "কৃপণের ধন কাহার প্রাপ্য।" সহাস্য বদনে শাস্ত্রের বচন প্রকাশ করিয়া শিরোমণি মহাশয় উত্তর করিলেন "তস্কর, রাজা ও অগ্নি, কৃপণের ধন অধিকার করিয়া থাকেন। একত্রিভূত হইয়া আসিলে প্রত্যেকেই উক্ত ধনের তৃতীয়াংশ পাইয়া থাকেন, কিন্তু যদি ঐ তিনজনের মধ্যে কেহ অনাগত থাকেন, তাহা হইলে অপর দুই জন উক্তধন সমানাংশে গ্রহণ করেন। যদ্যাপি ঐ তিন জনের মধ্যে একজন মাত্র আগমন করেন তাহা হইলে উক্ত ধনে তাঁহারই সম্পূর্ণ অধিকার হইয়া থাকে"। এ ব্যবস্থায় উক্ত ভদ্রলোক অতিশয় পুলকিত হইয়া শিরোমণি মহাশয়ের গুণ ব্যাখ্যায় তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া তুলিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ভদ্রলোকটি করযোড়ে শিরোমণি মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। বিশেষ লভ্যের প্রত্যাশায় শিরোমণি মহাশয় কোন ধনী লোকের আলয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতেছিলেন; সেই জন্য তিনি সে সময়ে উক্ত ভদ্রলোকের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলায়, ভদ্রলোকটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার কত টাকা সঞ্চিত হইয়াছে ও উক্ত ধনী লোকের নিকট তিনি কত টাকা প্রাপ্তির আশা করেন। সহাস্যবদনে শিরোমণি মহাশয়ের উত্তর হইল—"আপনার কল্যাণে পঞ্চলক্ষাধিপতি হইয়াছি এবং যে স্থানে গমনে উদ্যত হইয়াছি সেখানেও পঞ্চদশ সহস্রের ন্যূন লভ্যের প্রত্যাশা করিনা"। করযোড়ে ভদ্রলোক বলিলেন, "আপনি বহুগুণের আধার। সেই জন্য আপনাকে নিঃস্ব করিবার প্রযত্ন যুক্তিও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ! আপনি যে পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রার প্রত্যাশা করিতেছেন, তাহাতে একজন ভদ্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহের কষ্ট থাকিতে পারেনা। এদিকে আবার সে ধন এক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার করায়ত্ব হয় নাই; সুতরাং তাহাতে অন্য কাহার অধিকার উপস্থিত হইয়াছে বলা যায় না। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া আপনি যে পঞ্চলক্ষ মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, কারণ এক্ষণ পর্য্যন্ত রাজা বা অগ্নি সে ধনের জন্য উপস্থিত হন নাই। আমি তস্কর

এবং আপনি কৃপণ। আমার নাম রঘুনাথ। আপনি আপনার বিমাতার ভরণপোষণ করেন না বলিয়া কৃপণের মধ্যে গণ্য। পণ্ডিত হইয়া আপনি কখনই ধর্ম্ম বিগর্হিত কর্ম্ম করিবেন না, ইহা স্থির জানিয়াই আমি অনুরোধ করিতেছি, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে আমার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আমার অধিকার আমাকে অর্পণ করিয়াই আপনি পুনরায় ধন উপার্জ্জনে বহির্গত হইবেন। যদি অতঃপর কৃপণতা পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে উক্ত পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রারও হিসাব আমাকে পরে দিলেই হইবে।

শিরোমণি মহাশয়ের বদন শুষ্ক ও নয়ন স্থির। কিন্তু তিনি রঘুনাথের যুক্তি সঙ্গত ও শাস্ত্র-সম্মত কথায় দ্বিরুক্তি করিলেন না। মৌন হইয়াই তিনি শিবিকায় প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার বাহকগণ গুরু কার্য্যানুরোধ অনুমান করিয়াই সত্বরপদে তাঁহার গৃহের সম্মুখদ্বারে তাঁহাকে উপস্থিত করিল। বহির্গত হইয়াই রঘুনাথের বিনীত ভাব দর্শন ও মধুর বচন শ্রবণ করিতে করিতে তিনি গৃহপ্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সঞ্চিত ধন বহন করিয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন পূর্ব্বক তিনি ন্যূনপক্ষে পঞ্চবিংশতি বিভীষিকাপ্রদ বদন নয়নগোচর করিলেন এবং ভাবিলেন তস্করদিগের কি সুন্দর কার্য্যতৎপরতা। কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তিনি রঘুনাথকে কহিলেন, "তস্করপ্রবর! যে কথকতার প্রসাদে আমি এই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে তোমাদিগকে সেই কথকতা শ্রবণ করাইয়া তোমার করে এই সংগৃহীত অর্থ অর্পণ করি"।

এ সময়ে এ সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিতে রঘুনাথ অসম্মত হইলেন না; কারণ তখন পর্য্যন্ত যামিনীর প্রথম প্রহর অতিবাহিত হয় নাই। দুই প্রহরের পরও অন্য কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিবে ইহা স্থির বুঝিয়াই রঘুনাথ অনুচরবর্গকে সুরস কথকতা শ্রবণের আদেশ করিলেন! যখন শিরোমণি মহাশয় নিবৃত্ত হইলেন, তখন পরদিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে। স্বদলবলে অবাক হইয়া রঘুনাথ করযোড় করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে শিরোমণি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আপনার আশ্চর্য্য শক্তি। আমার অনুচরবর্গ হৃদয়-শূন্য এবং তাহাদিগকে একরূপ লৌহ বা প্রস্তরমূর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আপনার কথায় প্রস্তর দ্রবীভূত ও লৌহ জলবৎ তরল হইয়াছে। আপনার সঞ্চিত ধন আপনার প্রায়শ্চিত্তার্থে আমি গ্রহণ করিলাম কিন্তু আপনার মর্য্যাদা

রক্ষার্থে আমি তাহা আবার আপনার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতেছি। অদ্য হইতে বিমাতা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। পরদুঃখ মোচন যেন আপনার ব্রত হয়। আর যেন কৃপণতাকলঙ্ক আপনার নিষ্কলঙ্ক যশশশী স্পর্শ না করে এবং আমাকে যেন আর আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে না হয়"।

শিরোমণি মহাশয় দুইটি হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক গলদশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গদ গদ ভাবে কহিলেন, "রঘুনাথ! কালপ্রভাবে যদি বঙ্গদেশবাসির হৃদয়ে তস্কর প্রবৃত্তি প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহারা যেন তোমার মত তস্কর হয়। বাল্মিকী তস্কর ছিলেন, পরে তিনি আদি কবি হইয়া জগতের গুরু হইয়াছেন। আমার মনে হয় তুমি তাঁহারই অনুগ্রহকণাসম্ভূত। তুমি আমার গুরু হইলে। আজি হইতে আমার পাপনিবৃত্তির ভার তোমারই উপর রক্ষা করিলাম। আমাকে দেখিও।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

জাতীয় সঙ্গীত।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

জাগ জাগ ঋষিবংশধরগণ।
হের হের হের সবে মেলিয়া নয়ন॥
সমিধ কুশ লয়ে করে, কর গুরুর সন্ধান,
লভি মনোমত গুরু, পূজ দিয়ে মন প্রাণ।
লভ আত্মজ্ঞান সবে, হে অমৃতের সন্তান,
'পূর্ণ' মোরা 'শক্তিধর' সবে বুঝহ সন্ধান।
এ দারিদ্র্য মালিন্য মোদের, মাত্র আবরণ,
মোরা ভস্মাবৃত বহ্নি ধূলামাখা মণি সমান।

শ্রীবঙ্কুবিহারী পাল।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি।

(১)

গত এক শতাব্দীর মধ্যে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে কত উন্নতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ইহার উন্নতির জন্য কত কত মহাত্মা তাঁহাদের দেহ মন সমর্পণ করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানের উপর এখন প্রত্যেক সুশিক্ষিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি পড়িয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে মৃত্যুর হার হাজারে ৮০ ছিল; এখন তথায় মৃত্যুর হার তাহার পঞ্চমাংশেরও কম। প্রসবাগারের সংস্করণ ও প্রসবচিকিৎসার ক্রমোন্নতিতে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রসূতির মৃত্যুসংখ্যা অনেক কমিয়াছে। এক বসন্ত রোগের অত্যাচারে কত কত গ্রাম পল্লী জনশূন্য হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহাত্মা জেনার বসন্ত নিবারক টীকা আবিষ্কার করিয়া নিজ নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। এখন আমরা ঐ টীকা দ্বারা বসন্ত রোগ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছি। সম্প্রতি পণ্ডিত হাপ্‌কিনের ওলাওঠা নিবারক টীকা লইয়া যেরূপ পরীক্ষা চলিতেছে তাহা যদি সফল হয় তাহা হইলে আমরা শীঘ্রই আমাদের দেশ হইতে ওলাউঠাভীতিও দূর করিতে সমর্থ হইব। উক্ত মহাত্মা ওলাউঠা বিষ ক্ষীণ করিয়া লইয়া উদরের পার্শ্বে দুইবার হাইপোডার্মিকরূপে প্রয়োগ করেন। প্রথম বিষ প্রয়োগের পর দেহের উত্তাপ কিছু বৃদ্ধি হয়, শিরঃপীড়া এবং প্রয়োগ-স্থানে অল্প বেদনা ও স্ফীতি দৃষ্ট হয়। কাহার কাহার কয়েক দিবস পর্য্যন্ত উদরাময় হইয়া থাকে। ষষ্ঠ দিবসে বিষের অপেক্ষাকৃত উগ্রতর দ্রব্য দ্বিতীয়বার প্রবিষ্ট করান হয়। এ সময়েও শরীরের তাপ পুনরায় কিছু বৃদ্ধি হয়, স্থানীক বেদনা প্রকাশ পায় কিন্তু স্ফীতি দৃষ্ট হয় না। ঐ বেদনা তিন দিবসের অধিক থাকে না। উদরাময় বা কোন প্রকার পরিপাক বিকার উপস্থিত হয় না এবং সচরাচর ২৮ ঘণ্টার মধ্যে অসুস্থাবস্থা তিরোহিত হয়।

এনাটমি বা শারীরতত্ত্বের কথা চিন্তা করিলে কতই নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। যখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই তখন সুপ্রসিদ্ধ হার্ভি রক্তসঞ্চালন প্রণালীর আবিষ্কার করেন। সে সময়ে তিনি মনে করিতেন রক্ত ধমনী হইতে একেবারে শিরায় প্রবাহিত হয়। কিছু

দিন পরে মহাত্মা ম্যাল্‌পিঘি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্যাপিলারি সার্কুলেশন আবিষ্কার করিলেন। এখন আমরা প্রত্যেক শারীরযন্ত্রের সূক্ষ্মতত্ত্বও বলিতে অপারক নহি।

অস্ত্র-চিকিৎসার দিন দিন যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। অল্প দিন পূর্ব্বেও বিজ্ঞ বিচক্ষণ অস্ত্র-চিকিৎসকগণ ওভেরিয়ান বা ইউটারাইন্ টিউমার উৎপাটন করিতে ভীত হইতেন। এক্ষণে বীজাণুবিনাশ প্রণালীর (Antiseptic treatment) সাহায্যে নব্য চিকিৎসকগণ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে উদরের অভ্যন্তরে অস্ত্রচালনা করিতেছেন। ১৮৩০ সালে ডাক্তার জেমস্ সিম্‌সন্ ক্লোরফরম্ আবিষ্কার করেন। তদবধি বৃহৎ অস্ত্রচিকিৎসায় রোগীর কোন ক্লেশই নাই বলিলে চলে। ক্লোরফর্ম্মের আঘ্রাণ প্রয়োগ করিলে রোগী নিদ্রিত অবস্থায় স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে। সুতরাং অতি কঠিন অস্ত্রচিকিৎসাও অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়। এ ভিন্ন অস্ত্র হইবার পর অস্ত্রের জ্বালা অল্প অনুভব হয় এবং রক্তপাতও কম হয়। সন্ধিবিচ্যুতি সংস্থাপন, মূত্রাশয়স্থ অশ্মরী প্রভৃতি শলাকাদি দ্বারা পরীক্ষাকরণ, আবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি মুক্তকরণ ইত্যাদিতে রোগীকে ক্লোরফর্ম্মের আঘ্রাণে অচেতন করিয়া এখন অনায়াসেই কার্য্যসিদ্ধি হয়।

পূর্ব্বকালে উত্তপ্ত লৌহশলাকা অস্ত্রাহত স্থানে সংলগ্ন করিয়া ক্ষত আরোগ্যের চেষ্টা করা হইত। তখনকার রোগীর ক্লেশ মনে করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। বায়ুস্থ জীবাণু (Bacteria Germ) সংযোগে ক্ষত বিকৃত হয়। যে পর্য্যন্ত উহারা ক্ষত স্পর্শ না করে সে পর্য্যন্ত তাহাতে পূযোৎপত্তি হয় না। এই মতের পরিপোষক হইয়া মহামতি লিষ্টার মহোদয় তাঁহার জগদ্বিখ্যাত পচননিবারণী চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কার করেন। কার্ব্বলিক এসিড্ নামক জীবাণুনাশক ঔষধ ঐ মহাত্মাই আবিষ্কার করেন। তৎপরে পারক্লোরাইড্ লোসন প্রভৃতি অনেকানেক জীবাণুনাশক ঔষধ বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ক্ষতের কোন চিকিৎসা আবশ্যক হয় না। যাহাতে ক্ষতে ঐ সকল জীবাণু আদৌ প্রবেশ করিতে না পারে অথবা যে সকল জীবাণু প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহা করাই সকল চিকিৎসকের উদ্দেশ্য।

কিছুকাল পূর্ব্বে ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা প্রদাহের নাম শুনিলেই শিরা ছেদ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করাইতেন। কিন্তু এখন ঐরূপ চিকিৎসা পরিত্যক্ত

হইয়াছে। কারণ দেখা যায় রোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা না করিয়া রক্তমোক্ষণ করিলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হইয়া থাকে। তৎকালে জ্বর প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক পীড়াতেই চিকিৎসকেরা জলৌকা প্রয়োগ করিতেন। এইজন্য বিলাতে ডাক্তারদিগের অপর একটি নাম ছিল লীচ্ (Leech)!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। গোবরডাঙ্গা।

হিমালয় ভ্রমণ। (৩)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পথে,— গয়া, কাশী।

বেলা প্রায় ৩টার সময় গয়ায় পৌঁছিলাম। চন্দ্রবাবুর সহিত পূর্ব্বের আলাপ পরিচয় ছিল না বলিয়া একটু কেমন মনে হইল, কিন্তু তাঁহার বাসায় আসিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া যাহা মনে হইয়াছিল, তাহা 'ডায়েরীতে' এইরূপ লেখা ছিল,—"প্রবীন, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধু চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আলাপ পরিচয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে মনে আশ্চর্য্য ভাব হইল, যেন তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্বেও আলাপ পরিচয় ছিল, সঙ্কোচ ভাব চলিয়া গেল, সর্ব্বত্রই যেন মায়ের কোল মনে হইতে লাগিল"। গয়ায় আসিয়া আশ্চর্য্য রকমের আনন্দে, প্রাণ উৎসাহিত হইল, কেন জানি না।

১৯শে আশ্বিন শুক্রবার প্রাতের কার্য্যাদী সমাপ্ত করিয়া "বিষ্ণু-পাদ মন্দির" দেখিতে বাহির হইলাম। বেলা অনুমান ৯টার পর তথায় উপস্থিত হইয়া বোধ হয় ১২টা পর্য্যন্ত ছিলাম। বিষ্ণুপাদ মন্দিরে গিয়া প্রাণে কেমন একরকম ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল, কিছুক্ষণ বসিয়া কাঁদিলাম, কেন কাঁদিলাম ঠিক যেন তাহার কারণ জানি না; পিতৃপুরুষ এবং আত্মীয় স্বজনগণকে স্মরণ হইতে লাগিল। আবার মনে হইল, 'গৌরচন্দ্র' এইখানে কি দেখে কেঁদে আকুল হয়ে ছিলেন। বিস্তৃত মন্দির প্রাঙ্গনের একদিকে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন

বেলতলায় বসিয়া কিছুক্ষণ উপাসনা প্রার্থনা করিলাম। তৎপরে কিছুক্ষণ যদৃচ্ছা মতে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে, এক স্থানে দেখিলাম, শত শত নরনারী পিতৃ পুরুষগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিতেছে, পাণ্ডাগণ মন্ত্র বলাইতেছে ; ইহাতে আমার মনে হইল, ইহারা সাক্ষ্যাত ভাবে ভগবানের নিকট পিতৃলোকের জন্য প্রার্থনা ও শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করিতে জানে না, বলিয়াই 'পাণ্ডা'রা যা বলাইতেছে তাহাই বলিতেছে, তাহার অর্থ ও অনেকে বুঝে না, তবে বিশ্বাস এমনি বস্তু যে এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কত ক্লেশ ও অর্থব্যয় করিয়া এইরূপে তৃপ্ত হইতেছে, কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসে চরিত্র গঠন হয় না। বৈকালে রামশীলা প্রেতশীলা, ফাল্গুনদী ও তাহার পুল ইত্যাদি দেখিলাম।

২০শে শনিবার অতি প্রত্যুষে 'বুদ্ধগয়া' দেখিতে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে ৫ টা পয়সা মাত্র ছিল। হাঁটিয়া ৭ মাইল পথ যাইতে হইবে। কতক দূর গিয়া পুরাতন জুতা পায়ে বড়ই লাগিতে আরম্ভ হইল। তাহাতে চলিতে কষ্ট হইতে লাগিল। একটু পরে, পশ্চাতে একখানি অশ্ব শকটের শব্দ শুনিতে পাইলাম, যখন তাহা নিকটে আসিল তখন দেখিলাম তাহাতে প্রিয় সত্যেন্দ্র বাবু (ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেন) ও তাঁহার ভাগিনেয়,—গৌরীবাবুর পুত্র শ্রীমান্ হরিপ্রসাদ ; তাঁহারা আমাকে গাড়িতে তুলিয়া লইলেন। বুদ্ধগয়ায় পৌঁছিতে আমাদের ৯টা বাজিয়া গেল। প্রকাণ্ড বুদ্ধ-মন্দির ও দীর্ঘ বুদ্ধ মূর্ত্তি, এবং বোধি-দ্রুম, একে একে সমস্ত দেখা হইল ; বোধিদ্রুম অর্থাৎ যে বটবৃক্ষ মূলে বসিয়া বুদ্ধদেব ভজন-সাধন করিয়াছিলেন, তাহা ধারা বাহিক রূপে রক্ষা করা হইতেছে, বর্ত্তমান বৃক্ষ বৃহৎ না হইলেও শোনা যায় ইহাও সেই আদি বৃক্ষের বংশধর। চীন হইতে আনিত একটী কাঁচের বুদ্ধমূর্ত্তি ও মহন্তের বাড়ির সম্মুখ পর্য্যন্ত দেখিয়া আমরা ফিরিয়া আসিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলাম। প্রথমে আমার সঙ্কল্প ছিল যে সমস্ত দিন বুদ্ধগয়ায় থাকিয়া অপরাহ্ণে বাসায় ফিরিব, কিন্তু তাহা না করিয়া সত্যেন্দ্র বাবুর গাড়িতে আসিয়া গয়ায় ন্যাংটা বাবাজীর আশ্রমে যাইবার জন্য পথে নামিলাম। বেলা তখন বোধ হয় ১১-৩০ হইবে। আশ্রমের নিকটস্থ পুকুরে স্নান করিয়া কাপড় শুকাইয়া লইয়া আশ্রমে গেলাম। আশ্রমটী অতি মনোরম, ব্রহ্মযোনী পাহাড়ের পাদদেশে উচ্চ ভূমিতে আশ্রমের সৌন্দর্য্য আরো বৃদ্ধি করিয়াছে, একটী ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ও প্রকাণ্ড ইঁদারা

আশ্রয় ও সুনির্ম্মল সুশীতল পানীয় দান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ শ্রেণী আশ্রমের উত্তাপ নিবারণ ও শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। প্রমুক্ত বায়ু কি মধুর লাগিতেছিল, তাহা বর্ণনাতীত। গৃহ-ছায়া, এবং বৃক্ষ-ছায়া যুক্ত রোয়াকের এক প্রান্তে বসিয়া কিছুক্ষণ ধ্যান ধারণায় শান্তি উপভোগ করিতে চেষ্টা করিলাম, ধ্যানে উপলব্ধি হইল, "মাকে (অর্থাৎ ভগবানকে মাতৃভাবে) নিকট করিতে হইবে"! কিছুক্ষণ পরে এক সাধু আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা! ভোজন করেগা? আমি। হাঁ! কর্‌নে সক্তা, আর্থাৎ করিতে পারি বলিলাম। পুরি দুগ্ধ মিষ্টান্ন, আহার পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর, গৃহের উপরকার ঘরে বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনী শুনিয়া উপরে গেলাম; তথায় গিয়া দেখিলাম, ২।৩টী বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী গৃহে ফিরিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট এই আশ্রম-স্বামী ন্যাংটা বাবাজীর অনেক অমানুষী শক্তি ও সাধুতার কথা শুনিলাম এবং বলিলেন এক্ষণে বাবাজী হরিদ্বারে আছেন, কিছু দিনের মধ্যে এখানে আসিবেন এমত সম্ভাবনা আছে। যাঁহার সঙ্গে আমার কথা হইল তিনি মহেশপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায়চৌধুরী। ইহার কথায় জানা গেল, ইনি ধর্ম্ম এবং সাধুভক্ত সম্বন্ধে চর্চ্চা করেন, ন্যাংটা বাবাজীর সঙ্গে ইহার পূর্ব্বের পরিচয় আছে। অবিনাশ বাবু আমাকে আমার গন্তব্য স্থানের অনেক সন্ধান বলিয়া দিলেন। অপরাহ্ণে ব্রহ্মযোনি পাহাড় দেখিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় চন্দ্র বাবুর বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

গয়া সকল রকমেই ভাল লাগিল। শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র সমদারের গৃহে রাত্রে পারিবারিক উপাসনা করিলাম, বাগ আঁচড়ার সুশীল বাবু আমার বাগ্‌নানের শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর রসিকলাল রায়ের জামতা। রসিক বাবুর কন্যা (সুশীলের স্ত্রী) উপাসনায় যোগ দিলেন, এবং ঠিক মেয়ের মত যত্ন করে আমাকে আহার করাইলেন।

গয়া ব্রহ্মমন্দিরটীও ছোট খাটর মধ্যে বেশ সুন্দর! ২১শে আশ্বিন রবিবার মন্দিরে সন্ধ্যার পর সামাজিক উপাসনা হইল, চন্দ্রবাবুর একান্ত অনুরোধে আমাকেই বেদীর কার্য্য করিতে হইল, ৫।৭টী উপাসক উপস্থিত ছিলেন। রাত্রে আহারাদী করিয়া গয়া হইতে রওনা হইলাম, বিদায় কালীন চন্দ্রবাবু প্রীতির ভাবে আমার হাতে ২৲টী টাকা ট্রেণ ভাড়ার জন্য প্রদান করেন।

ষ্টেশনে আসিয়া কাশীর টিকিট করিয়া কিছুক্ষণ পরে গাড়িতে উঠিলাম, এবং অনেকক্ষণ পরে ট্রেণ ছাড়িল।

২২শে আশ্বিন সোমবার প্রাতে কাশীতে আসিলাম। সোমবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত ৬ দিন কাশীতে থাকা ঘটিল। প্রথমে বন্ধুবর শ্রীমন্ত সেনের গুরুদেব যোগানন্দ স্বামীর আশ্রমে উঠি, দুই রাত্রি তথায় শয়ন ও একদিবস মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়াছিলাম। তৎপরে প্রিয়বন্ধু ক্ষিতীশ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমাকে তাঁহার গৃহে লইয়া গিয়া বলিলেন, আমি এখানে সপরিবারে ছিলাম, দুঃখের বিষয় আর আমরা ২ দিন মাত্র এখানে আছি, যাহা হউক এই ২ দিনও আপনি এইখানেই থাকুন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে আমি তাঁহার গৃহে অতিথি হইলাম। তাঁহার বাড়ি উপাসনা হইল না, কেন না তাঁহারা হিন্দু পরিবার তবে ব্রহ্মসঙ্গীত হইল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আমার নিকট গল্প শুনিয়া খুব গা ঘেঁসা হইল। ১ দিবস সাহার ছত্রে মধ্যাহ্ন ভোজন, ও রাত্রে পরমহংস—অদ্বৈতাশ্রমে অবস্থিতি করি, অদ্বৈতাশ্রমের ভক্ত সঙ্গ বড় মিষ্ট বোধ হইয়াছিল।

এ সময়ে এখানে আমাদের আত্মীয় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দত্ত সপরিবারে তীর্থ দর্শনে আসিয়াছিলেন, এক দিবস তাঁহার বাসায় মধ্যাহ্ন-ভোজন, এবং দুই দিবস সন্ধ্যার পর ব্রহ্ম সঙ্গীত করিলাম। শ্রদ্ধেয় শিবানীদেবী প্রভৃতি অনেক-গুলি স্ত্রীলোক গান শুনিলেন, প্রথম দিনের গানে অতি উজ্জ্বলভাবে মাতৃভাব প্রকাশ হইয়াছিল। কাশীবাসী স্বদেশস্থ নরনারী অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কয়েকদিন বিশ্বেশ্বর মন্দির, মণিকর্ণিকার ঘাট, কেদার ঘাট, অন্নপূর্ণার ঘাট বেড়াইলাম, ইতিপূর্ব্বে আরও একবার এখানে আসিয়াছিলাম এজন্য এবার অধিক আর কিছু দেখিবার ইচ্ছা হইল না।

চুনার হইতে উমেশ বাবু (শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র দত্ত) মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রাধানাথ দেব সপরিবারে কাশী বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, এজন্য উমেশবাবুর সহিত আবার দেখা হইল, তাঁহার সহিত রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম দেখিতে গেলাম, সেবাশ্রমের কার্য্য প্রণালী বড় ভাল বোধ হইল। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য এবং বিবেকানন্দ-শিষ্যবৃন্দ বিপন্ন দুস্থ রোগীদিগের সেবা দ্বারা তাহাদের কষ্টের জীবনেও কথঞ্চিৎ শান্তিদান করিতেছেন, ইহাতে তাহারা

যেরূপ কৃতজ্ঞতা ও আশীর্ব্বাদ সূচক ভাব প্রকাশ করিতেছে, তাহা শুনিয়া কঠিন প্রাণও বিগলিত হয়। ভগবানের নামে যাঁহারা নরসেবা-ব্রত (যে প্রণালীতেই হউক) গ্রহণ করেন, তাঁহারা নিজে ত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেও সেবা কার্য্যে তাঁহাদের কখন অর্থাভাব হয় না; তথাপি একথা সত্য, যে আমাদের দেশের বর্ত্তমান ধনীগণের পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মার্থে মুক্ত-হস্ততার দিন দিন খর্ব্বতা ঘটিতেছে। একদিন সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজে স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা শুনিলাম। এখান হইতে কয়েক জনকে কয়েকখানা পত্র লিখিয়াছিলাম এবং খুলনা হইতে স্ত্রীর এক খানা দীর্ঘ পত্র পাইয়াছিলাম। ইতি মধ্যে যোগীন্দ্রবাবু সপরিবারে এলাহাবাদ প্রয়াগতীর্থ দর্শন করিয়া আসিলেন; তাঁহার শরীরে জ্বরভাব হইয়াছিল, কিন্তু সন্ধ্যার পর ভগবানের নামগান ও প্রার্থনাদি করিলাম, তাহার পর তিনি সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন, 'হরিনামে জ্বরও ছেড়ে যায়'। কাশী হইতে বিদায় কালিন যোগীন্দ্রবাবু আমার পায়ের জুতা ছেড়া দেখিয়া ২৷৹ টাকার ১ জোড়া জুতা ও ট্রেণ ভাড়ার জন্য নগদ ৪৷৷৹ টাকা দিয়াছিলেন। ২৭শে আশ্বিন শনিবার রাত্রি ৯টার পর বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট্ ষ্টেশনে আসিয়া লক্ষ্ণৌয়ের টিকিট করিয়া ট্রেণে উঠিলাম।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন! (৩)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

শিক্ষা ব্যতিরেকে মানব, নীতিশাস্ত্রজ্ঞও হইতে পারে না। অধুনা স্ত্রীজাতির মধ্যে বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় মহিলাসমাজে নীতিশাস্ত্রের বন্ধন শিথিল হওয়ায় নীতি-জ্ঞানের অভাবে কতকগুলি মজ্জাগত দোষ প্রবেশলাভ করিয়াছে। এক্ষণে তাহা দূরীকরণ করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাল্যকাল হইতে কি প্রকারে পিতামাতার সেবা, পতিভক্তি, অতিথি-সংকার, সন্তান লালন পালন ও তাহাদের সুশিক্ষাপ্রদান, এবং গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ সংসারের অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যসমুদায় সম্পাদন করিতে হয়, তাহা যদি শিক্ষা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ঐ সকল কার্য্য করিতে অক্ষম

হন। মাতা সুশিক্ষিতা হইলে, সন্তান যে ভালরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতির মধ্যে উত্তম শিক্ষা প্রচলিত না হইলে যে তাঁহাদের মধ্যে চরিত্রহীনার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, সে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এই সকল বিষয় আমরা (পুরুষগণ) যদি দৃক্‌পাত না করি তাহা হইলে আর অন্য উপায় নাই। এই অবনতির একমাত্র দায়ী পুরুষগণ। কারণ স্ত্রীজাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ভার পুরুষের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। পুরুষগণ স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া কর্ত্তব্যভ্রষ্টতারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতেছেন। এই স্ত্রীশিক্ষার অভাবে দেশে যে কত কত মহা-অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, চাত্‌রা।

জাপানী মহিলা ও তাহাদিগের নিত্যকর্ম।

জনৈক বঙ্গবাসী সুধীজন চীন ও জাপান দেশ ভ্রমণ করিয়া তাহার যে ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইতে আমরা জাপানী মহিলাদিগের নিত্যকর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা যাহা অবগত হইয়াছি তাহা বড়ই প্রীতিকর জ্ঞানে নিম্নে তাহার কতকটা সার সংগ্রহ করিয়া আমাদের বক্তব্যসহ প্রকাশ করিতেছি।

আমাদের দেশের মহিলাগণের সহিত জাপানী মহিলাগণের কত পার্থক্য। আমাদের দেশের মহিলাগণ ভাবেন, যদি তাঁহারা রান্নাবান্না করিয়া পরিজনের দশজনকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতে পারিলেন, তবেই নিত্যকর্ম্মের অধিকাংশই সম্পন্ন হইল। তাহার পর যাহা একটু অবসর মিলে সে সময়টা তাঁহারা বৃথা পরচর্চ্চায় সময় নষ্ট করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে এমন দেখা যায়, তাঁহারা তাহাতে এতই নিমগ্না যে, কোলের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে রীতিমত দুগ্ধপান করাইতে ভুলিয়া যান। তাহার পর ছেলেটির যদি ব্যারাম পীড়া কিছু হইল, গৃহিণী একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়েন ও ডাক্তার ডাকিতে পাঠান। পারিবারিক মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেকে যে একেবারেই অজ্ঞ, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহাদের মুখে প্রায়ই শুনা যায়, তাঁহারা গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত, কাজেই আপনাদের দেশের বা জাতির দশটা খবর রাখিবার অবসর পান

না। আপনাদের সুখস্বচ্ছন্দতা যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহাই যাঁহারা ভালরূপ জানেন না, তাঁহাদেরনিকট স্বজাতি বা স্বদেশের উপকারের প্রত্যাশা করা যায় কিরূপে? এদিকে তাঁহাদের জাপানী ভগিনীদের শিক্ষা, পারিবারিক পরিচর্য্যা, স্বদেশ প্রেম, সন্তান বাৎসল্য ইত্যাদি উচ্চ আদর্শ সম্যকরূপে দর্শন করিলে মনে হয়, ভারতের মহিলাগণ কোন্ গভীর অজ্ঞান-তিমিরে নিমগ্না।

জাপানী মহিলাগণ গৃহকর্ম্ম এমন মিতব্যয়িতার এবং সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করেন যে, পরিবার হাজার দরিদ্র হইলেও উহাকে দারিদ্র-ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। পুত্র কন্যাদিগকে কিরূপে মানুষ করিতে হয়, উহা তাঁহারা বেশ জানেন। গত যুদ্ধের সময় এই সব ক্ষুদ্র কুটিরবাসিনী মহিলাগণ স্বদেশকে যে বীররত্ন উপহার প্রদান করিয়াছেন, উহা ইতিহাসের পত্রে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। কেবল স্বদেশের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ কেন, এই কর্ম্মময় সংসারের জীবন-সংগ্রামে চারিদিকেই এই জননীদের চরিত্র প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের মাতাদের অমনোযোগিতার জন্য আশৈশব আমাদের মনে ভীরুতা ও কাপুরুষতার ভাব প্রশ্রয় পায়, আত্ম-নির্ভরের ভাব ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়। জুজুর ভয়ে কত বালকের সৎসাহসের লোপ পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। জাপানের জননীরা যাহাতে পুত্রকন্যাগণ স্বাধীনভাবে ছুটাছুটী করিয়া খেলিতে পারে, উহারই উপায় করেন এবং উহার জন্যই উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন—পুত্রকন্যাদিগকে কখনও তীব্র ভৎর্সনা বা তিরস্কার করেন না। কোনরূপ দোষ করিলে স্নেহ মমতার স্বরে ছেলেকে বুঝাইয়া দেন যে, তাহার ত্রুটি হইয়াছে। এই জন্যই জাপানে ছোট ছোট মেয়েদিগকে কেমন কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন দেখা যায়! সচরাচর এখানে ঝগড়া বিবাদ নাই, কচিৎ কখন ঘটিলেও উহারা নিজে আপোসে মিটাইয়া লয়। আমাদের দেশে পুত্রকন্যাদির মাতাতে মাতাতে ঝগড়া বিবাদ ও যুদ্ধাভিনয় দেখা যায়, জাপানে তেমনটী এ পর্য্যন্ত কখনও দেখি নাই। ছেলেদিগকে ক্রন্দন করিতেও সচরাচর দেখা যায় না। এই সবই মাতার সুশিক্ষার ফল। চারি-বৎসরের শিশুর নিকট মাতারা যে সব বীরত্ব ও পুণ্যকাহিনী বিবৃত করেন, উহা তাহার ধমনী মজ্জাতে গ্রথিত হইয়া যায়। শিশুরা অতি শৈশব হইতেই এক মহা উচ্চ লক্ষ্য লইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। এখানে

ছেলেদের ক্রীড়া—ব্যায়াম ও যুদ্ধ শিক্ষা, এবং মেয়েদের—শিল্পকার্য্য ও উদ্যান ভ্রমণ। এই সকল ছেলে মেয়েরা প্রকৃতিকে যেমন সমাদর করিতে জানে, এমন জগতে আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা অতি শৈশব হইতে স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ জ্ঞান শিক্ষা করে, এবং উহার বিষময় ফল সন্তানেরা যৌবনোন্মুখেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমাদের দেশেরদিকে তাকাইলেই দেখা যায় যে, সাধারণতঃ বালক বালিকা হইতে বৃদ্ধ নরনারী পর্য্যন্ত এই স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য লইয়া এত নিমগ্ন যে উহাঁদের মনে কোনও প্রকার উচ্চ চিন্তা স্থান পাইবার অবসর পায় না। ৩।৪ বছর হইতে ছেলে মেয়েদের মনে বিবাহের ভাব দেওয়া যায়। এদেশে (জাপানে) ১৭, ১৮ বৎসরের বালক, ১৪, ১৫ বৎসরের বালিকা স্ত্রী পুরুষের বিভিন্নতা ক্বচিৎ উপলব্ধি করিয়া থাকে। উহারা পরস্পরের সহিত এমন পবিত্র এবং স্বাধীনভাবে মিলিতে পারে যে, উহা দেখিলে মনে হয়, কেন এই জাতির উচ্চ চিন্তা ও উচ্চ ভাব জাতীয় উন্নতিরদিকে প্রসারিত হইবে না। যতই জাপানীদের সহিত মিশিতেছি, ততই দেখিতেছি উহাদের সহিত আমাদের কত বিভিন্নতা! এই বিভিন্নতা যে ভারত-বাসীদিগের পতনও অধীন অবস্থা-হেতু ঘটিয়াছে তাহা জানা কথা। প্রাচীন আর্য্যদিগের সময়ে সুশিক্ষিত ও সুসভ্য অবস্থায় ভারতের ও স্ত্রীজাতির কত না উন্নতভাব ছিল? কালে যখন তাহা লুপ্ত হইয়াছে, তখন ভারতবাসীগণের কর্ত্তব্য যে, জাপানীদের সহিত মিলে মিশে আত্ম-নির্ভর ও মহিলাদিগের উন্নতির বিষয় সকল শিক্ষা কল্পে বিশেষ যত্নবান হয়েন, ইহাই আমাদিগের বিনীত নিবেদন।

উদ্ধৃত—ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, ৯ম সংখ্যা।

চাত্‌রা।

গোবরডাঙ্গার অনতিদূরে চাত্‌রা নামে একটী পল্লীগ্রাম আছে। প্রশস্ত রাজপথাদির কিছুই এখানে বিদ্যমান নাই। কিন্তু এখানে যাহা আছে মানব মাত্রেরই তাহা স্পৃহনীয় বস্তু। প্রায় সমস্ত ভদ্রলোকের গৃহেই দেবী লক্ষ্মী বিরাজমানা। অতিথি কুটুম্ব বুভুক্ষু কেহই এখানে নিরাশ হৃদয়ে প্রত্যাখ্যাত

হয় না। প্রাচীন আর্য্যসম্মত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আজও এইস্থানে বর্ত্তমান সুতরাং গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও এ পক্ষে গণ্ডগ্রাম বা নগরের শিরোধার্য্য অমূল্যরত্ন।

কিন্তু বলিতে হৃদয় ব্যথিত হয় লক্ষ্মীর এতাদৃশ কৃপা সত্ত্বেও জ্বর, আমাশয় প্রভৃতি দুরন্ত রোগের প্রভাবে চাত্‌রা ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে। সবিশেষ সাবধান না হইলে অচিরাৎ উৎসন্ন হইবে। যাঁহারা এখন আছেন তাঁহাদের অধিকাংশই রুগ্ন ও দুর্ব্বল; বাহ্যাকৃতি দেখিলে বোধ হয়, নিতান্ত দীনদরিদ্র অপেক্ষাও ইঁহারা দুঃখে দেহভার বহন করিতেছেন।

ভদ্র পল্লীর দক্ষিণে হৃৎকারজনক দুর্গন্ধময় জলপূর্ণ পুষ্করিণী, উত্তরে খানা ডোবা সংকুল নিবিড় বাঁশ বাগান। পরিষ্কৃত জলবায়ুর নিতান্ত অভাবে বৎসরের কোন ঋতুতেই এখানে সুস্থ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অধিবাসীর অবস্থা খুবই সচ্ছল, মনে করিলেই তাঁহারা বাঁশবাগান নন্দনকাননে এবং নরকের পুষ্করিণী অমৃতসরে পরিণত করিতে পারেন কিন্তু কি জানি কি মোহে তাঁহাদের চৈতন্য চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া আছে !!

সাধারণের মোহনিদ্রা ভঙ্গের জন্য সময়ে সময়ে শক্তিমান লোকসংগ্রহপটু ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে, এখানেও এখন তাহাই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ এবং তদীয় সহোদর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিশ্র প্রভৃতিকে যেরূপ জানি এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ এবং শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন মিশ্র মহাশয়-দিগের যেরূপ পরিচয় পাই তাহাতে আশা করিতে পারি, উৎসাহী যুবকসম্প্রদায়, পরিণত বয়স্ক মহাশয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে গ্রামের স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিতে পারেন। জীবন ও বংশরক্ষারূপ মহাস্বার্থের জন্য সাধারণ লোককে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করাইতে তাঁহাদের কতক্ষণ লাগে ? ভদ্র পল্লীর অতি দূরে উন্মুক্ত বায়ুসেবিত দরিদ্র কৃষক পল্লীর সুস্থ ও সবলশরীর লোকদিগের প্রতি একটু মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়, ভদ্র পল্লীর সুশিক্ষিত ধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আপনাদের বিবেচনার দোষে কেমন ভীষণ বিড়ম্বনার জীবন যাপন করিতেছেন; আশা করি সুরেন্দ্রনাথ মিশ্র প্রভৃতি সক্ষম ও উদ্‌যোগী যুবকদলের কৃতকার্য্যতার সংবাদ পাইয়া অচিরেই, পরম পরিতোষ লাভ করিব।

শ্রীবরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়, গোবরডাঙ্গা।

রামকৃষ্ণ-দাতব্য চিকিৎসালয়।

(সৎকার্য্যে প্রতিযোগীতা।)

বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে খাঁটুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত রামগোপাল রক্ষিত মহাশয় গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনের সন্নিহিত একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির মধ্যস্থলে, চিকিৎসালয়টী সুদৃশ্য, সুযোগ্য চিকিৎসক, অবাধে ঔষধদান, সকল রকমেই উহা ভাল হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয় উহার পার্শ্বে জমি লইতে সচেষ্ট হন। বাধাবিঘ্নের পর, জায়গা লওয়া তাঁহার হইল। শোনা গেল তিনি সাধারণের ব্যবহারের জন্য পুষ্করিণী খনন করিবেন। পুষ্করিণী ত হইলই অধিকন্তু একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ের বাড়ী নির্ম্মাণ হইতেও লাগিল। তাহাতে অধিকাংশ লোকেই বলিতে লাগিলেন পাশাপাশি ২টা ডাক্তারখানার প্রয়োজন কি? আর কোন ভাল কাজ করিলেই ত হইত? একখানা দোকানের পার্শ্বে আর একখানা দোকান করার ন্যায় সৎকার্য্যেও প্রতিযোগীতা কেন? ইতিমধ্যে রামগোপাল রক্ষিত মহাশয় পরলোকগত হইলেন, অল্পদিনের ভিতর ডাক্তারখানাও বন্ধ হইয়া গেল; তখন দেখা গেল ভাগ্যে রামকৃষ্ণ-দাতব্য চিকিৎসালয় হইয়াছিল, নতুবা যাহারা এতকাল বিলাতী ঔষধ অবাধে সেবন করিত না—তাহারা কিছুদিন ঔষধ সেবন করিয়া এখন ঔষধ না পাইলে উপকারের পরিবর্ত্তে বিষম অপকারই হইত।

রামগোপাল বাবুর সময়েও কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন এই কাজ চিরস্থায়ী করিবার জন্য ট্রাষ্টী করা উচিত। কিন্তু অনভ্যাস বা অনভিজ্ঞতা বশতঃ ব্যবসায়ীর হাতের টাকা ট্রাষ্ট্ সম্পত্তি করা হইয়া উঠিল না।

রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয় পরলোক গমন করিলে তাঁহার সুপুত্র শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র সুচারুরূপে "রামকৃষ্ণ-দাতব্য চিকিৎসালয়ের" কার্য্য চালাইতেছেন। উহা বাঙ্গালা ১৩০৬ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ব্যয় বার্ষিক ১৮০০৲ শত টাকা। বিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ রক্ষিত মহাশয়, সহকারী শ্রীমান গোষ্ঠবিহারী রক্ষিত, কম্পাউণ্ডার অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী ইহার কার্য্যে আছেন। প্রতিদিন গড়ে ৮০ জন রোগীকে ঔষধ দান করা হয়।

এখন আমরাও শরৎবাবুকে বলিতেছি, তিনি এই কার্য্যকে চিরস্থায়ী

করিতে একটী ট্রাষ্ট্ সম্পত্তি করুন। ৫ জনকে কিরূপে ট্রাষ্টী করিয়া ট্রাষ্টডিড্ লেখাপড়া করিতে হয় তাহা ১ম বর্ষ কুশদহের পৌষ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ট্রাষ্টী ডিডের অনুলিপী আছে তাহা দেখিবেন এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিলে জানিতে পারিবেন। ট্রাষ্টী সম্পত্তি না করিলে এ সৎকার্য্য চিরস্থায়ী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, যদি তিনি এই কার্য্যকে স্থায়ী না করেন, তবে (ঈশ্বর কৃপায় এমত না হউক) তাঁহার অবর্ত্তমানে যখন এই কার্য্য বন্ধ হইবে, তখন দেশের একটী ঘোর অনিষ্ট ঘটিবে। এ বিষয়ে শরৎবাবু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখেন ইহাই আমাদের অনুরোধ।

স্থানীয় সংবাদ।

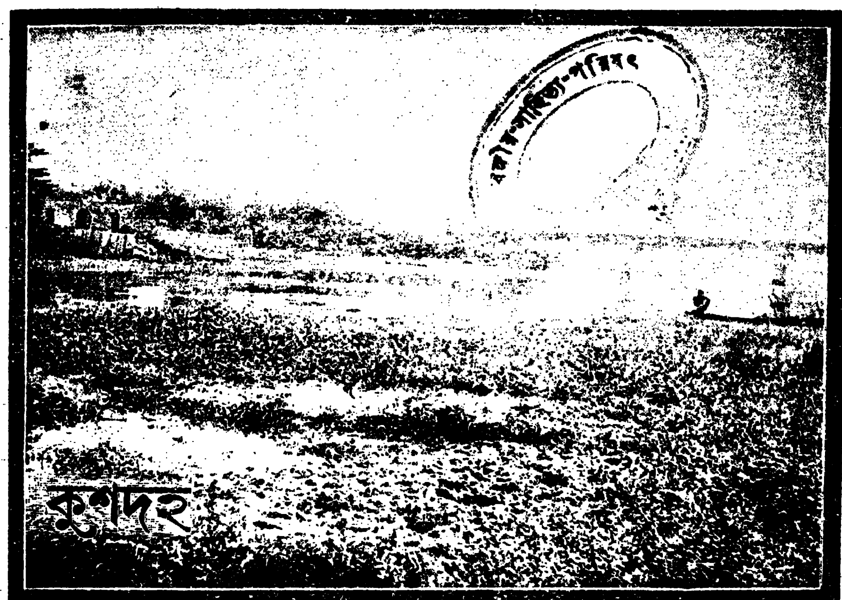
জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন ;—গত ৬ই পৌষ মঙ্গলবার চারঘাট নিবাসী ধনঞ্জয় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। চারঘাট একজন ভাললোক হারাইলেন।

সম্প্রতি চাঁদপাড়া ষ্টেশনে এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় সিঁদ দিয়া চুরি হইয়া গিয়াছে।

বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ।—"তত্ত্বপ্রসূন" নামক একখানি ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক সদ্গ্রন্থ ৩৬ নং রামকান্ত বসুর লেন হইতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল মহাশয় বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। ৴১০ আনার টিকিট সহ লিখিলে গ্রন্থ প্রাপ্ত হইবেন। উপস্থিত হইয়া লইতেও পারেন। গ্রন্থখানিতে কয়েকটী গভীর তত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে। ধর্ম্মপিপাসু জন এ গ্রন্থ পাঠে তৃপ্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা এবার যে সকল নূতন গ্রাহকের নামে "কুশদহ" পাঠাইতেছি, তাহা সকলেই গ্রহণ করিতেছেন, ইহাতে আমরা বুঝিতেছি তাঁহারা গ্রাহক হইলেন। অন্যথা অনিচ্ছা থাকিলে একটু জানাইবেন। নূতন বা পুরাতন গ্রাহকগণ দয়া করিয়া এই সামান্য চাঁদা মণিঅর্ডারে পাঠাইলেই ভাল হয়। অগ্রিম চাঁদা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া পাঠান সকলের পক্ষে ঘটে না, সুতরাং আমরা পর পর ভিঃ, পী, করিতে চাই, আশাকরি ভিঃ, পী, ফেরত দিয়া কেহ আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

Printed by J. N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.



গাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়

সম্বলিত, ধর্ম্ম, সমাজ ও

বিবিধ বিষয়ক

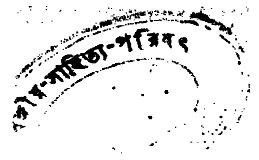
সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

কুশদহ-কার্য্যালয়

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১।০ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য /১০ পয়সা।



বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সহরের গ্রাহকগণের অধিকাংশেই "কুশদহর" অগ্রিম চাঁদা প্রদান করিয়াছেন, মফঃস্বলের গ্রাহকগণের অধিকাংশেই এখনও চাঁদা দেন নাই। এই সংখ্যা প্রাপ্তির পর সকলে দয়া করিয়া ক্ষুদ্র চাঁদাটী পাঠাইলে ভাল হয়। গ্রাহকগণের যত্নই যে কাগজের অন্যতম জীবন তাহা কে না জানেন।

২য় বর্ষ। মাঘ, ১৩১৬। ৪র্থ সংখ্যা।

সঙ্গীত।

আলেয়া—একতালা।

নাথ! কি ভয় ভাবনা তার।
তুমি যার যে তোমার,
ঐ অভয়পদ দিয়ে প্রহরী হইয়ে,
রক্ষা কর যারে নিরন্তর। (তুমি)
মাতৃকোলে শিশু সন্তান যেমন,
তেমনি সে আনন্দে করে বিচরণ
নাহি ডরে কালে, তব নামের বলে,
করে স্বর্গরাজ্য অধিকার।
তোমার বরেতে পেয়েছে যে জন,
অক্ষয় অমর অনন্ত জীবন,
ওহে দয়াময়, তুমি যার সহায়,
বধে তারে সাধ্য কার। (প্রাণে)
ধন্য সে মানব অতি ভাগ্যবান্,
তোমার হাতে যার আছে হে পরাণ,
সুখী তার হৃদয়, নিশ্চিন্ত নির্ভয়,
লয়েছ যার সকল ভার। (তুমি নিজে)

নমস্কার।

মধুর পাখীর গান বনে উপবনে,
রবির উদয় রাঙ্গা পূরব গগণে,
চঞ্চলা বিজলী-ক্রীড়া মেঘ শিরে শিরে,
শস্যের শ্যামল ক্ষেত্র নদী তীরে তীরে,
তৃণের কোমল শয্যা হরিৎ প্রান্তরে,
উচ্চ-শির গিরি শোভে চুম্বিয়া অম্বরে,
মেঘের নীরদ কান্তি আকাশের তলে,
অমল-কমল শোভা সরসীর জলে,
আঁধারে তরুর শিরে জোনাকির মণি,
নদীর জলের স্রোতে কল কল ধ্বনি,
ক্লান্ত-দেহ শান্তকারী সুবাস পবন,
পর্ব্বতের শির হতে জলের পতন ;—
প্রকৃতিকে দেন যিনি হেন অলঙ্কার
নমি তাঁর পদে আমি শত শত বার।

প্রভাতের বিন্দু বিন্দু শিশির-কণায়,
বিশাল বারিধি-বক্ষে তরঙ্গ ক্রীড়ায়,
শ্যামল-তরুর প্রতি পাতায় পাতায়,
তারকার চাহনিতে আকাশের গায়,
বরষার ঝর্ ঝর্ বারিধারা পাতে,
চাঁদের বিমল করে পূর্ণিমার রাতে ;—
জগতের ছোট বড় সমুদয় কাজে,
প্রকৃতির মনোরম সমুদয় সাজে ;
যাঁহার বিরাটরূপ শোভিছে সতত
নমি তাঁর পদে আমি হইয়ে প্রণত।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাস্ত্র সঙ্কলন।

৯। ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

কঠোপনিষৎ ৬। ৯।

ইহাঁর স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে, সুতরাং ইহাঁকে কেহ চক্ষুঃ দ্বারা দেখিতে পায় না। ইনি হৃদ্‌গত সংশয়রহিত জ্ঞান দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। এইরূপে যাঁহারা ইহাঁকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন।

১০। নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে ॥

কঠ ৬। ১২।

তিনি বাক্য দ্বারা, কি মনের দ্বারা, কি চক্ষুঃ দ্বারা কাহারও কর্তৃক প্রাপ্ত হয়েন না। তিনি আছেন, এই কথা যে বলে তদ্ভিন্ন তিনি অন্য ব্যক্তি দ্বারা কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন।

১১। ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২। ৮।

জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ ভেলা দ্বারা ভবসাগরের ভয়াবহ স্রোত হইতে উত্তীর্ণ হয়েন।

১২। অপানিপাদো যবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥

শ্বেত ৩। ১৯ ॥

তাঁহার হস্ত নাই, তথাপি তিনি গ্রহণ করেন; তাঁহার পদ নাই, তথাপি তিনি দূরগামী; তাঁহার চক্ষুঃ নাই, তথাপি তিনি দর্শন করেন। এবং তাঁহার কর্ণ নাই, তথাপি তিনি শ্রবণ করেন। তিনি যাবৎ বেদ্য বস্তু তৎসমুদায় জানেন, কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই; ধীরেরা তাঁহাকে সকলের আদি ও মহান্ পুরুষ বলিয়াছেন।০

১৩। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ।
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা ॥
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩। ৪। ৮।

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম যে এই পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় ও আর সকল হইতে প্রিয়।

১৪। ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিন্ সত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মাধ্যাত্মং সত্যস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং ॥
বৃহ ৪। ৫। ১২।

এই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর সমুদয় প্রাণীর মধুস্বরূপ, সমুদয় প্রাণীও এই সত্যের নিকট মধুরূপে প্রকাশবান্। যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ সত্যেতে বিদ্যমান এবং যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরই এই পরমাত্মা, তিনি অমৃত, তিনিই ব্রহ্ম।

১৫। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ন্তগোঃ সর্ব্বাপৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি। নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাম্ জীবিতং তথৈব তে জীবিতম স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্। যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥
বৃহ ৪। ৪। ২। ৩।

মৈত্রেয়ী বলিলেন "হে ভগবন্, যদি ধনেতে পরিপূর্ণ এই সমুদায় পৃথিবী আমার হয়, তবে তদ্দ্বারা কি আমি অমর হইতে পারি?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন "না, ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ, তোমার জীবন সেইরূপ হইবেক। ধন দ্বারা অমৃতত্বলাভের আশা নাই।" মৈত্রেয়ী বলিলেন "যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব!" এ বিষয়ে আপনি যাহা জানেন তাহাই আমাকে বলুন। (ক্রমশঃ)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।*

দিদিমা (আমার পিতামহী) আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। শৈশবে তাঁহাকে ব্যতীত আমিও আর কাহাকেও জানিতাম না। আমার শয়ন, উপবেশন, ভোজন, সকলই তাঁহার নিকট হইত। তিনি কালীঘাটে যাইতেন, আমি তাঁহার সহিত যাইতাম। তিনি যখন আমাকে ফেলে জগন্নাথক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন আমি বড়ই কাঁদিতাম। ধর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতেন। এবং প্রতিদিন শালগ্রামের জন্য স্বহস্তে পুষ্পের মালা গাঁথিয়া দিতেন। কখনো কখনো তিনি সংকল্প করিয়া উদয়াস্ত সাধন করিতেন—সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যের অস্তকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যকে অর্ঘ দিতেন। আমিও সে সময়ে ছাতের উপরে রৌদ্রেতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। এবং সেই সূর্য্য অর্ঘের মন্ত্র শুনিয়া শুনিয়া আমার অভ্যাস হইয়া গেল। "জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং"। দিদিমা এক এক দিন হরিবাসর করিতেন, সমস্ত রাত্রি কথা হইত এবং কীর্ত্তন হইত; তাহার শব্দে আমরা আর রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিতাম না।

---

* "ব্রহ্মজ্ঞান" ও "ঋষির" জন্য ভারত চির গৌরবান্বিত। নানা কারণে বর্ত্তমান ভারতের পতন হইলেও, যে দেশে একবার ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছে সে দেশের—সে জাতির চিরপতন অসম্ভব। তাই বুঝি আবার আমরা ব্রহ্ম-জ্ঞান এবং ঋষি-বার্ত্তা শুনিলাম। যদি কেহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঋষিত্বে সন্দেহ করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, ঋষি কে? কাহাকে ঋষি বলা যায়? উত্তর। যিনি "মন্ত্র দ্রষ্টা," অর্থাৎ যিনি বেদ দর্শন করেন, অথবা যাঁহার ভিতর হইতে বেদ-মন্ত্র প্রকাশ পায়। এই বাক্যের প্রমাণ আমরা আমাদের নিজের কথায় কিছু না বলিয়া, তাঁহার "স্বরচিত জীবন চরিত" হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলাম। তাঁহার নিজ মুখের ৪১ বৎসরের বৃত্তান্ত, কেমন সরল সত্য এবং মধুর বর্ণনা, তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

১১ই মাঘের ব্রহ্মোৎসব ইহাও মহর্ষি জীবনের ফল স্বরূপ; পঞ্চকাল সহরের ব্রহ্মোৎসবের প্রভাব, বৎসরের পর বৎসর ধর্ম্মার্থির প্রাণে যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তিনি সংসারের সমস্ত তত্ত্বাবধারণ করিতেন এবং স্বহস্তে অনেক কার্য্য করিতেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার জন্য তাঁহার শাসনে গৃহের সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিত। পরে সকলের আহারান্তে তিনি স্বপাকে আহার করিতেন। আমিও তাঁহার হবিষ্যান্নের ভাগী ছিলাম। তাঁহার সেই প্রসাদ আমার যেমন স্বাদু লাগিত, তেমন আপনার খাওয়া ভাল লাগিত না। তাঁহার শরীর যেমন সুন্দর ছিল, কার্য্যেতে তেমনি তাঁহার পটুতা ছিল, এবং ধর্ম্মেতেও তাঁহার তেমনি আস্থা ছিল। * * *

দিদিমা মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে আমাকে বলেন, আমার যা কিছু আছে আমি তাহা আর কাহাকেও দিব না, তোমাকেই দিব। পরে তিনি তাঁহার বাক্সের চাবিটা আমাকে দেন। আমি তাঁহার বাক্স খুলিয়া কতকগুলি টাকা ও মোহর পাইলাম, লোককে বলিলাম যে আমি মুড়ি মুড়কি পাইয়াছি। ১৭৫৭ শকে দিদিমার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত, তখন আমার পিতা এলাহাবাদ অঞ্চলে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন, বৈদ্য আসিয়া কহিল রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না। অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ীর বাহিরে আনিল। কিন্তু দিদিমা আরও বাঁচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাঁহার মত নাই। তিনি বলিলেন যে "যদি দ্বারকানাথ বাড়িতে থাকিত, তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস্‌নে।" কিন্তু লোকে তাহা শুনিল না। তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাতীরে চলিল। তখন তিনি কহিলেন, "তোরা যেমন আমার কথা না শুনে আমাকে গঙ্গায় নিয়ে গেলি; তেমনি আমি তোদের সকলকে খুব কষ্ট দিব, আমি শীঘ্র মরিব না।" গঙ্গাতীরে লইয়া একটি খোলার চালাতে তাঁহাকে রাখা হইল। সেখানে তিনি তিন রাত্রি জীবিত ছিলেন। আমি সেই সময়ে গঙ্গাতীরে তাঁহার সঙ্গে নিয়ত থাকিতাম। দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আমি ঐ চালার নিকটবর্ত্তী নিমতলার ঘাটে একখানা চাঁচের উপরে বসিয়া আছি। ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি—চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, "এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে।" বায়ুর সঙ্গে তাহা অল্প অল্প আমার কাণে আসিতেছিল। এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য্য উদাস-ভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই। ঐশ্বর্য্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল। যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি, তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল, গালিচা দুলিচা

সকল হেয় বোধ হইল, মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। আমার বয়স তখন ১৮ আঠারো বৎসর।

এত দিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়াছিলাম। তত্ত্বজ্ঞানের কিছুমাত্র আলোচনা করি নাই, ধর্ম্ম কি, ঈশ্বর কি, কিছুই জানি নাই, কিছুই শিখি নাই। শ্মশানের সেই উদাস আনন্দ, তৎকালের সেই স্বাভাবিক সহজ আনন্দ মনে আর ধরে না। ভাষা সর্ব্বথা দুর্ব্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব? তাহা স্বাভাবিক আনন্দ। তর্ক করিয়া, যুক্তি করিয়া সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন। সময় বুঝিয়াই তিনি আমাকে এ আনন্দ দিয়াছিলেন। কে বলে ঈশ্বর নাই? এই তো তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি তো প্রস্তুত ছিলাম না, তবে কোথা হইতে এ আনন্দ পাইলাম? এই ঔদাস্য ও আনন্দ লইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমি বাড়ীতে আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার আর নিদ্রা হইল না। এ অনিদ্রার কারণ আনন্দ! সারা রাত্রি যেন একটা আনন্দজ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল। রাত্রি প্রভাত হইলে দিদিমাকে দেখিবার জন্য আবার গঙ্গাতীরে যাই। তখন তাঁহার শ্বাস হইয়াছে। সকলে ধরাধরি করিয়া দিদিমাকে গঙ্গার গর্ভে নামাইয়াছে এবং উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" নাম ডাকিতেছে। দিদিমার মৃত্যু হইল। আমি নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, তাঁহার হস্ত বক্ষঃস্থলে, এবং অনামিকা অঙ্গুলিটি উর্দ্ধমুখে আছে। তিনি "হরিবোল" বলিয়া অঙ্গুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরলোকে চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া আমার বোধ হইল, মরিবার সময় উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে দেখাইয়া গেলেন "ঐ ঈশ্বর ও পরকাল।" দিদিমা যেমন আমার ইহকালের বন্ধু ছিলেন, তেমনি পরকালেরও বন্ধু।

মহা সমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল। আমরা তৈল হরিদ্রা মাখিয়া শ্রাদ্ধের বৃষকাষ্ঠ গঙ্গাতীরে পুঁতিয়া আসিলাম। এই কয় দিন খুব গোলযোগে কাটিয়া গেল। পরে, দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রে যেরূপ আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহা পাইবার জন্য আমার চেষ্টা হইল। কিন্তু তাহা আর পাইলাম না। এই সময়ে আমার মনে ঔদাস্য আর বিষাদ। সেই রাত্রিতে ঔদাস্যের সহিত আনন্দ পাইয়াছিলাম, এখন সেই আনন্দের অভাবে ঘন বিষাদ আসিয়া আমার মনকে

আচ্ছন্ন করিল। কি রূপে আবার সেই আনন্দ পাইব, তাহার জন্য মনে বড়ই ব্যাকুলতা জন্মিল। আর কিছুই ভাল লাগে না। * * *

এইরূপে তাঁহার জীবনে বিষয়-বিরাগ, ও ঈশ্বরকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল; তিনি আর একস্থানে বলিতেছেন—

এক এক দিন কৌচে পড়িয়া ঈশ্বর বিষয়ক সমস্যা ভাবিতে ভাবিতে মনকে এমনি হারাইতাম যে, কোচ হইতে উঠিয়া, ভোজন করিয়া আবার কৌচে কখন পড়িলাম তাহার আমি কিছুই জানি না—আমার বোধ হইতেছিল, যেন আমি বরাবর কৌচেই পড়িয়া আছি। আমি সুবিধা পাইলেই দিবা দুই প্রহরে একাকী বোটানিকেল উদ্যানে যাইতাম। এই স্থানটী খুব নির্জ্জন। ঐ বাগানের মধ্যস্থলে যে একটা সমাধিস্তম্ভ আছে, আমি গিয়া তাহাতে বসিয়া থাকিতাম। মনে বড় বিষাদ। চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছি। বিষয়ের প্রলোভন আর নাই কিন্তু ঈশ্বরের ভাবও কিছুই পাইতেছি না, পার্থিব ও স্বর্গীয় সকল প্রকার সুখেরই অভাব। জীবন নীরস, পৃথিবী শ্মশানতুল্য। কিছুতেই সুখ নাই, কিছুতেই শান্তি নাই। দুই প্রহরের সূর্য্যের কিরণ-রেখা সকল যেন কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত। * * * আমার ব্যাকুলতা দিন দিন আরও বাড়িতে লাগিল, এক একবার ভাবিতাম আমি আর বাঁচিব না। * * *

তিনি যখন জ্ঞানপিপাসু হইয়া শাস্ত্রাধ্যায়নের অভিলাষে, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তখন তিনি বলিতেছেন,—

সংস্কৃত ভাষার উপর আমার বালক-কালাবধিই অনুরাগ ছিল। তখন সংস্কৃত শিখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল। আমাদের বাটীতে একজন সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম কমলাকান্ত চূড়ামণি, নিবাস বাঁশবেড়ে। তিনি সুপণ্ডিত ও তেজস্বী; তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। আমি তাঁহাকে ভক্তি করিতাম। একদিন বলিলাম, আমি আপনার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যকরণ পড়িব। তিনি কহিলেন, ভালই তো, আমি তোমাকে পড়াইব। তখন চূড়ামণির নিকট মুগ্ধবোধ আরম্ভ করিলাম এবং ঝ ঢ ধ ঘ ভ, জ ড় দ গ ব, কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলাম। একদিন চূড়ামণি তাঁহার হাতের লেখা একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন, কহিলেন, এই লেখাতে সহি করিয়া দেও। আমি বলিলাম কি লেখা? পড়িয়া দেখি, তাহাতে লেখা আছে যে, 'তাঁহার পুত্র

শ্যামাচরণকে চিরকাল আমায় প্রতিপালন করিতে হইবে। আমি তাহাতে তখনি সহি করিয়া দিলাম। কিছুদিন পরে আমাদের সভাপণ্ডিত চূড়ামণির মৃত্যু হইল। তখন শ্যামাচরণ আমার সেই স্বাক্ষরটুকু লইয়া আমার নিকট আসিলেন, কহিলেন যে, "আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আমি নিরাশ্রয়, এখন আপনার আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। এই দেখুন আপনি পূর্ব্বেই ইহা লিখিয়া দিয়াছেন।" আমি তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইলাম এবং তদবধি শ্যামাচরণ আমার নিকটে থাকিতেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কিছু অধিকার ছিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঈশ্বরের তত্ত্বকথা কিসে পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, মহাভারতে। তখন আমি তাঁহার নিকটে মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এই গ্রন্থ খুলিবামাত্র একটি শ্লোক আমার চক্ষে ঠেকিল। তাহা এই—"ধর্ম্মে মতির্ভবতুবঃ সততোত্থিতানাং সহ্যেকএব পরলোকগতস্য বন্ধু। অর্থাস্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানা নৈবাপ্তভাবমুপয়ন্তি ন চ স্থিরত্বং॥" তোমাদের ধর্ম্মে মতি হউক, তোমরা সতত ধর্ম্মে অনুরক্ত হও, সেই এক ধর্ম্মই পরলোকগত ব্যক্তির বন্ধু। অর্থ, স্ত্রীদিগকে নিপুণরূপে সেবা করিলেও তাহাদিগকে আয়ত্ত করা যায় না এবং তাহাদের স্থিরতাও নাই। মহাভারতের এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া আমার বড়ই উৎসাহ জন্মিল। আমি এই মহাভারতের অনেক অংশ পাঠ করি।

ধৌম্যঋষির উপাখ্যানে উপমন্যুর গুরুভক্তির কথা আমার বেশ মনে পড়ে। আমি ধর্ম্মপিপাসায় উহার অনেকাংশ পাঠ করি। একদিকে যেমন তত্ত্বান্বেষণের জন্য সংস্কৃত, তেমনি অপরদিকে ইংরাজী। আমি য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিস্তর পড়িয়াছিলাম, কিন্তু এত করিয়াও মনের যে অভাব, তাহা কিছুতেই ঘুচাইতে পারিলাম না। সেই বিষাদের অন্ধকার, সেই অশান্তি, হৃদয়কে অতিমাত্র ব্যথিত করিতেছিল।

এই বিষাদ অন্ধকারের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যুতের ন্যায় একটা আলোক চমকিত হইল। দেখিলাম, বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের যোগে বিষয়-জ্ঞান জন্মে। 'কিন্তু এই জ্ঞানের সহিত আমি যে জ্ঞাতা তাহাও তো জানিতে পারি। দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ ও মননের সহিত আমি যে দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, ঘ্রাতা ও মন্তা এ জ্ঞানও তো পাই। বিষয়-জ্ঞানের সহিত বিষয়ীর বোধ হয়,

শরীরের সহিত শরীরীকে জানিতে পারি। আমি অনেক অনুসন্ধানে সর্ব্বপ্রথমে এই আলোকটুকু পাই। যেন ঘোর অন্ধকারাবৃত স্থানে সূর্য্যকিরণের একটি রেখা আসিয়া পড়িল। বিষয়-বোধের সহিত আমি আপনাকে আপনি জানিতে পারি, ইহা বুঝিলাম। পরে যতই আলোচনা করি, জ্ঞানের প্রভাব বিশ্বসংসারে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। আমাদের জন্য চন্দ্র সূর্য্য নিয়মিতরূপে উদয়াস্ত হইতেছে। আমাদের জন্য বায়ু বৃষ্টি উপযুক্তরূপে সঞ্চালিত হইতেছে। ইহারা সকলে মিলিয়া আমাদের জীবন পোষণের একটি লক্ষ্য সিদ্ধ করিতেছে। এইটি কাহার লক্ষ্য? জড়ের তো লক্ষ্য হইতে পারে না—চেতনেরই লক্ষ্য। অতএব একটি চেতনাবান পুরুষের শাসনে এই বিশ্বসংসার চলিতেছে। দেখিলাম, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাতার স্তন্যপান করে, ইহা কে শিখাইয়া দিল? তিনিই, যিনি ইহাকে প্রাণ দিয়াছেন। আবার মাতার মনে কে স্নেহ প্রেরণ করিল? যিনি তাঁহার স্তনে দুগ্ধ দিলেন, তিনি। তিনিই সেই প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্ ঈশ্বর, যাঁহার শাসনে জগৎসংসার চলিতেছে। যখন এতটুকু জ্ঞাননেত্র আমার ফুটিল, তখন একটু আরাম পাইলাম। বিষাদ-ঘন অনেক কাটিয়া গেল। তখন কিছু আশ্বস্ত হইলাম।

বহুপূর্ব্বে প্রথম বয়সে আমি যে অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইয়াছিলাম, একদিন ভাবিতে ভাবিতে তাহা হঠাৎ আমার মনে পড়িয়া গেল, আবার আমি একাগ্র মনে অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র খচিত এই অনন্ত আকাশের উপরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম এবং অনন্তদেবকে দেখিলাম, বুঝিলাম যে অনন্তদেবেরই এই মহিমা। তিনি অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ, যাঁহা হইতে আমরা পরিমিত জ্ঞান ও তাহার আধার এই অবয়ব পাইয়াছি, তাঁহার কোন অবয়ব নাই। তিনি শরীর ও ইন্দ্রিয় রহিত। তিনি হাত দিয়া এ বিশ্ব গড়ান নাই। কেবল আপনার ইচ্ছার দ্বারা এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। সৃষ্টির কৌশল-চিন্তায় স্রষ্টার জ্ঞানের পরিচয় পাই। নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখিয়া বুঝি তিনি অনন্ত। এই সূত্রটুকু ধরিয়া তাঁহার স্বরূপ মনের মধ্যে আরও খুলিয়া গেল। দেখিলাম, যিনি অনন্তজ্ঞান, তাঁহার ইচ্ছাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। আমরা, সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রচনা করি, তিনি তাঁহার ইচ্ছায় সকল উপকরণ সৃষ্টি করিয়া রচনা করেন। তিনি জগতের কেবল রচনাকর্ত্তা নহেন,

তাহা হইতে উচ্চ, তিনি ইহার সৃষ্টিকর্তা। এই সৃষ্ট বস্তু সকল অনিত্য, বিকারী, পরিবর্ত্তনশীল ও পরতন্ত্র। ইহাদিগকে যে পূর্ণজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছেন ও চালাইতেছেন তিনিই নিত্য, অবিকৃত, অপরিবর্ত্তনীয় ও স্বতন্ত্র। সেই নিত্য সত্যপূর্ণ পুরুষ সকল মঙ্গলের হেতু এবং সকলের সম্ভজনীয়। কতদিন ধরিয়া এইটি আমার বুদ্ধির আলোচনায় স্থির করিলাম; কত সাধনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। তথাপি আমার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। জ্ঞান-পথ অতি দুর্গম পথ, এ পথে সাহস দেয় কে? আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তাহাতে সায় দেয় কে? * * *

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতার অদ্বিতীয় ধনী প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সহিত দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতা ছিল, মহর্ষিও বালক-কালাবধি রাজা রামমোহন রায়কে অবলোকন করিয়া আসিয়াছিলেন, তাই তিনি আর একস্থানে বলিতেছেন,—

শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। তখন হিন্দু কলেজ ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটি হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে প্রতিষ্ঠিত। আমি প্রায় প্রতি শনিবার দুইটার সময় ছুটি হইলে রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত রামমোহন রায়ের মাণিকতলার বাগানে যাইতাম। অন্য দিনও দেখা করিয়া আসিতাম। কোন কোন দিন আমি তথায় গিয়া বড়ই উপদ্রব করিতাম। বাগানের গাছের নিচু ছিঁড়িয়া, কখনো কড়াইশুঁটি ভাঙ্গিয়া মনের সুখে খাইতাম। রামমোহন রায় একদিন কহিলেন, ব্রাদার! রৌদ্রে হুটাপাটি করিয়া কেন বেড়াও, এইখানে বোসো। যত নিচু খেতে পার এখানে বসিয়া খাও। মালিকে বলিলেন, যা, গাছথেকে নিচু পেড়ে নিয়ে আয়। সে তৎক্ষণাৎ এক থালা ভরিয়া নিচু আনিয়া দিল। তখন রামমোহন রায় বলিলেন, যত ইচ্ছা নিচু খাও। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর। আমি বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁহাকে দেখিতাম। বাগানে একটা কাঠের দোলা ছিল। রামমোহন রায় অঙ্গচালনার জন্য তাহাতে দোল খাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে তিনি আমাকে সেই দোলায় বসাইয়া আপনি টানিতেন, ক্ষণেক পরে আপনি তাহাতে বসিয়া বলিতেন ব্রাদার! এখন তুমি টান।

যখনই আমি বুঝিলাম যে ঈশ্বরের শরীর নাই, তাঁহার প্রতিমা নাই, তখন হইতে আমার পৌত্তলিকতার উপর অবিশ্বাস জন্মিল। রামমোহন রায়কে স্মরণ হইল—আমার চেতন হইল, আমি তাঁহার অনুগামী হইবার জন্য প্রাণ ও মন সমর্পণ করিলাম।

যে শাস্ত্রে দেখিতাম পৌত্তলিকতার উপদেশ, সে শাস্ত্রে আমার আর শ্রদ্ধা থাকিত না। আমার তখন এই ভ্রম হইল যে, আমাদের সমুদায় শাস্ত্র পৌত্তলিকতার শাস্ত্র। অতএব তাহা হইতে নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের তত্ত্ব পাওয়া অসম্ভব। আমার মনের যখন এই প্রকার নিরাশভাব, তখন হঠাৎ একদিন সংস্কৃত পুস্তকের একটা পাতা আমার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিলাম। ঔৎসুক্যবশতঃ তাহা ধরিলাম। কিন্তু তাহাতে যাহা লেখা আছে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য আমার কাছে বসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম, তুমি এই পাতার শ্লোক গুলানের অর্থ করিয়া রাখ, কুঠী হইতে আইলে আমাকে সব বুঝাইয়া দিবে। এই বলিয়া আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলাম। ঐ সময়ে আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করিতাম। আমার ছোট কাকা রমানাথ ঠাকুর তাহার ধন-রক্ষক। আমি তাঁহার সহকারী। ১০টা হইতে যতক্ষণ না কাজ নিকাশ হয়, ততক্ষণ তথায় আমার থাকিতে হইত। ক্যাশ বুঝাইয়া দিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া যাইত। কিন্তু সেদিন শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে পুঁথির পাতা বুঝিয়া লইতে হইবে, অতএব ক্যাশ বুঝাইয়া দিবার গৌণ আর সহ্য হইল না। আমি ছোট কাকাকে বলিয়া কহিয়া দিন থাকিতে থাকিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। আমি আমার বৈঠকখানার তেতালায় তাড়াতাড়ি যাইয়াই শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সেই ছাপার পাতাতে কি লেখা আছে, আমাকে বুঝাইয়া দাও। তিনি বলিলেন, আমি এতক্ষণ এত চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ইংরাজ পণ্ডিতেরা তো ইংরাজি সকল গ্রন্থই বুঝিতে পারে। তবে সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতেরা সকল সংস্কৃত গ্রন্থ বুঝিতে পারেন না কেন? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে কে বুঝিতে পারে? তিনি বলিলেন, এ তো সব ব্রহ্ম-সভার কথা—ব্রহ্ম-সভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বুঝিতে পারেন। আমি বলিলাম তবে তাঁহাকে ডাক। বিদ্যাবাগীশ খানিক পরেই আমার

নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পাতা পড়িয়া বলিলেন, এ যে ঈশোপনিষৎ। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্য সিদ্ধনং।" যখন বিদ্যাবাগীশের মুখ হইতে "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" ইহার অর্থ বুঝিলাম, তখন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিল। আমি মানুষের নিকট হইতে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী আসিয়া আমার মর্ম্মের মধ্যে সায় দিল—আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল। আমি ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিতে চাই, উপনিষদে কি পাইলাম? পাইলাম যে "ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন কর।" ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন করিতে পারিলে আর অপবিত্রতা কোথায়? তাহা হইলে সকলেই পবিত্র হয়, জগৎ মধুময় হয়। আমি যাহা চাই তাহাই পাইলাম। এমন আমার মনের কথা আর কোথাও হইতে শুনিতে পাই নাই। মানুষে কি এমন সায় দিতে পারে? সেই ঈশ্বরেরই করুণা আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইল, তাই "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" এই গূঢ় বাক্যের অর্থ বুঝিলাম। আহা! কি কথাই শুনিলাম—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর। তিনি কি দান করিয়াছেন? তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। সেই পরম ধনকে উপভোগ কর—আর সকল ত্যাগ করিয়া সেই পরম ধনকে উপভোগ কর। আর সকল ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাকে লইয়াই থাক। কেবল তাঁহাকে লইয়া থাকা মানুষের ভাগ্যে কি মহৎ কল্যাণ। আমি চির দিন যাহা চাহিতেছি ইহা তাহাই বলে।

আমার বিষাদের যে তীব্রতা, তাহা এই জন্য ছিল যে, পার্থিব ও স্বর্গীয় সকল প্রকার সুখ হইতেই আমি বঞ্চিত হইয়াছিলাম। সংসারেও আমার কোন প্রকার সুখ ছিল না এবং ঈশ্বরের আনন্দও ভোগ করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু যখন এই দৈববাণী আমাকে বলিল যে, সকলপ্রকার সাংসারিক সুখভোগের কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরকেই ভোগ কর, তখন, আমি যাহা চাহিতেছিলাম তাহা পাইয়া আনন্দে একেবারে নিমগ্ন হইলাম। এ আমার নিজের দুর্ব্বল বুদ্ধির কথা নহে, এ সেই ঈশ্বরের উপদেশ। সে ঋষি কি ধন্য যাঁহার হৃদয়ে এই সত্য প্রথমে স্থান পাইয়াছিল। ঈশ্বরের উপরে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, আমি সাংসারিক সুখের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাইলাম।

আহা! সে দিন আমার পক্ষে কি শুভদিন—কি পবিত্র আনন্দের দিন। উপনিষদের প্রতি কথা আমার জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিতে লাগিল। উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া আমি দিন দিন আমার গম্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমার নিকট সকল গূঢ় অর্থ ব্যক্ত হইতে লাগিল। আমি বিদ্যাবাগীশের নিকট ক্রমে ঈশা, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য উপনিষৎ পাঠ করি এবং অন্যান্য পণ্ডিতের সাহায্যে অবশিষ্ট আর ছয় উপনিষৎ পাঠ করি। প্রতিদিন যাহা পড়ি, তাহা অমনি কণ্ঠস্থ করিয়া তাহার পর দিন বিদ্যাবাগীশকে শুনাইয়া দেই। তিনি আমার বেদের উচ্চারণ শুনিয়া বলিতেন যে, "তুমি এ উচ্চারণ কার কাছে শিখিলে? আমরা তো এ প্রকার উচ্চারণ করিতে পারি না।" আমি বেদের উচ্চারণ একজন দ্রাবিড়ী বৈদিক ব্রাহ্মণের নিকট শিখি। যখন উপনিষদে আমার বিশেষ প্রবেশ হইল এবং সত্যের আলোক পাইয়া যখন আমার জ্ঞান ক্রমে উজ্জ্বল হইতে লাগিল, তখন এই সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আমার মনে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এইটুকু আভাস দিতেই প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গেল, তৎপরে তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী প্রণয়ন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার চেষ্টা, উপনিষদ—উদ্ধার ও ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তকে তাহার সংস্কার, তৎপরে পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ ও সত্যের মহিমায় ঋণ পরিশোধ এবং সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্তি, সুদীর্ঘকাল একাকী শৈলাদি ভ্রমণ, গভীরধ্যান, যোগসাধন, প্রচুররূপে ঈশ্বর-সম্ভোগ, এবং তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে বৃহৎ ধর্ম্ম পরিবার গঠন। তাঁহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মহত্ব প্রায় ৯০ নব্বই বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ রসপানে মত্ত থাকা—এ বিস্তৃত বর্ণনা এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় স্থানাভাব। এজন্য ধর্ম্মপিপাসুবৃন্দ তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিত পাঠ করুন ইহাই আমাদের নিবেদন।

হিমালয় ভ্রমণ। (৪)

পথে,—লক্ষ্ণৌ, বেরিলি।

২৮শে আশ্বিন রবিবার প্রাতে লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়া, শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের পুত্র ডাক্তার বিনয়ভূষণ বসুর বাসায় আসিলাম। অনেক দিনের পর বিনয়বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয়ের মধ্যেই আনন্দানুভূত

হইতে লাগিল। স্নানাদি করিয়া, মধ্যাহ্নে পারিবারিক উপাসনা আমাকে করিতে হইল, কিন্তু আজ রবিবারে মন্দিরে সামাজিক উপাসনা বিনয়বাবু করিলেন। লক্ষ্ণৌ ব্রহ্মমন্দিরটী বেশ সুন্দররূপে সুগঠিত।

২৯শে সোমবার প্রাতে বেড়াইতে বাহির হইয়া "মচ্চিভবন" "তস্‌বিরখানা" প্রভৃতি দেখিয়া আসিলাম। মচ্চিভবন প্রকাণ্ড প্রাসাদ, কতই কারুকার্য্যে বিনির্ম্মিত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তস্‌বির খানাও একটী প্রকাণ্ড ভবন, নবাব সাহেবদিগের বড় বড় অয়েলপেইণ্ট প্রতিকৃতি একটী প্রশস্ত গৃহে সজ্জিত রহিয়াছে। চিত্রগুলি এমন সুন্দর চিত্রিত ও জীবন্ত ভাব প্রকাশক যে দেখিলেই বুঝা যায়, কোন্‌টী ধর্ম্মভাবের মূর্ত্তি, কোন্‌টী বীরত্বের মূর্ত্তি। লক্ষ্ণৌ সহর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও খুব বিস্তৃত। নবাবী চিহ্ন সকল এখনও দেদীপ্যমান, তন্মধ্যে কতকগুলি বিলাসিতার ব্যাপার -শতাধিক বেগম গৃহ ইত্যাদি দেখিয়া মনে হইল, ইহাই মুসলমান রাজত্বের পতনের কারণ। বৈকালে, বিনয়বাবু আমার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করার পর যখন বুঝিলেন, আমার নিকট পাথেয় নাই, তখন প্রকারান্তরে অন্যের দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতে লাগিলেন, "এরূপে ভ্রমণ করা সঙ্গত নহে।" আমি সংক্ষেপে বোধ হয় তাঁহার কথার এইরূপে উত্তর দিয়াছিলাম। "আমিত কিছু অসঙ্গত দেখিতেছি না, এই ভ্রমণ আমার জীবনে প্রয়োজন ছিল এবং ইহাতে আমার অনেক উপকার হইবে বুঝিয়াছি, আর আমি যে কিছু পাথেয় ও আহারীয় সাধারণের নিকট গ্রহণ করিতেছি, তাহার বিনিময়ে ভগবানের নাম গান এবং সৎপ্রসঙ্গের দ্বারা অমূল্য পদার্থ কিছু না কিছু দিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। জগতে বিনিময় ব্যতীত কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে না, তবে বিনিময় ব্যাপারটা খুব কঠিন, কোন কোন সময় মানুষ তাহার অপব্যবহারে পরস্পরের অপকার করে"। আমি আর অধিক কিছু না বলিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। খুঁজিয়া খুঁজিয়া পুরাতন বন্ধু শ্রদ্ধেয় অঘোরবাবুর বাসায় গেলাম। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক সময় বাগআঁচড়ায় থাকিয়া তথাকার অনেক হিতসাধন করিয়াছিলেন। অনেক দিনের পর তাঁহার সহিত সাক্ষাতে উভয়েরই বিশেষ আনন্দ হইল। ইতিমধ্যে আমাদের উভয়ের জীবনে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহার বিষয়ে কিছু কিছু কথাবার্ত্তা কহিয়া তখন আমি বাসায় ফিরিবার জন্য উঠিলাম।

অঘোরবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে এখান হইতে যাবেন"? আমি বলিলাম, "আগামী কল্য রাত্রের ট্রেণে এ সহর ছাড়িব ভাবিয়াছি"। তিনি বলিলেন, "কল্য ৫টার সময় বিনয়বাবুর বাসা'য় গিয়া আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিব"।

৩০শে মঙ্গলবার প্রাতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিলাম। অনেকটা দূর ছিল বলিয়া একটু পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম। স্নানাদি করিয়া বিনয়বাবুর সহিত পারিবারিক উপাসনা করিলাম। ঈশ্বর কৃপায় শান্তভাবে বিনয়বাবুর পারিবারিক মঙ্গলকামনা আন্তরিকভাবে প্রার্থনাদি করিতে পারিয়া সুখী হইলাম। বৈকালে বিনয়বাবু আমাকে এবং আর একটী যুবককে, একখানি সেকেণ্ড ক্ল্যাশ গাড়িতে করিয়া বেড়াইতে লইয়া গেলেন। বোধ হয়, "আরামবাগ" নামক একটী স্থানে গিয়া আমরা কথাবার্ত্তায় বেশ আনন্দানুভব করিলাম। সেইদিন একটু গরমও ছিল, সুতরাং এই ভ্রমণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া তৃপ্ত হইলাম। বাসায় আসিয়া আমি যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময় অঘোরবাবু আসিয়া "গরীব বন্ধুর সামান্য সেবা" এই কথা বলিয়া আমার হাতে ১৲ টাকা দিলেন।

আহারাদি করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া বোধ হয় রাত্রি ১০ টার পর ট্রেণে উঠিয়া ৩১শে আশ্বিন, বুধবার প্রাতে বেরিলী পৌছিলাম।

একেবারে হরিদ্বার যাওয়াই আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ট্রেণ ভাড়া কম হওয়ায় বেরিলী পর্য্যন্ত আসিলাম। "ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য"। ষ্টেশন হইতে একা গাড়িতে চড়িয়া সহরের দিকে আসিতে লাগিলাম। বেরিলীতে আমার কোন পরিচিত ব্যক্তি না থাকায় একা ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে এখানে এমন কোন বাঙ্গালী বাবু আছেন, যাঁহার বাসায় আমি থাকিতে পারি? একা ওয়ালা বলিল "মহারাজ" (মহারাজ শব্দ এখানে সাধুদিগের প্রতি প্রয়োগ করিয়া থাকে, আমারও অনেকটা সাধুদিগের ন্যায় বেশ হইয়াছিল তাই বলিল মহারাজ।) "বাবু প্রিয়নাথ বকিল (উকিল) কা বাগিচা মে চলিয়ে, যেত্‌নে বাবুলোক আতেহেঁ হুয়ি ঠারতেহেঁ।" অর্থাৎ প্রিয়নাথ উকিল বাবুর বাসায় অনেক বিদেশী ভদ্রলোক আসিয়া থাকেন।

একা ওয়ালা আমাকে বাবু প্রিয়নাথ উকিলের উদ্যানবাটীর ফটকের নিকট নামাইয়া দিয়া গেল। আমি ভিতরে গেলাম, তখনও বাড়ীর সকলে উঠেন নাই।

একজন দ্বারবান্ আসিয়া বলিল মহারাজ! "বৈঠিয়ে, বাবু সাহেব কোঠিমে হ্যায় নেহি, লেকেন্ আপ্‌কা টাহার্নেকো কুছ্ হরজ নেহি ; ছেলিয়া বাবু কোঠিমে হ্যায়, ম্যায় খবর দেতেহেঁ।" একটু পরে ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক বালক, প্রিয়নাথ বাবুর পুত্র আসিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া গিয়া বারাণ্ডায় বসাইল। তৎপরে আমার ইঙ্গিত মত স্নানাগার (বাথ্‌রুম) দেখাইয়া দিলে, আমি হাত মুখ ধুইয়া আসিলাম, তাহার পর দেখি, আমার জন্য এক পেয়ালা চা ও কিছু খাবার আসিল, তাহা পান আহার করিলাম। ঐ খানে বসিয়া আর একটী যুবক হারমোনিয়মে সুর দিতেছিল। আমি তাহাতে গলার স্বর সংযোগ করিয়া সঙ্গীত করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাদের চঞ্চলচিত্ত অন্যদিকে গেল দেখিয়া, আমি আর সঙ্গীত করিলাম না। এইরূপে কিছুক্ষণের মধ্যে ইহাও জানিলাম, যে, বাবু প্রিয়নাথ উকিল—প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস বালী, উত্তরপাড়া, কিন্তু এখন এইখানেই এক রকম বসবাস হইয়া গিয়াছে। তাঁহার আর দুই কনিষ্ঠ সহোদরের মধ্যে একজন ঝান্সীর সব্‌জজ, আর একজন উপস্থিত বক্সারের মুনসেফ্, তাঁহারাও ছুটীতে এখানে আসিয়াছেন, তিন ভ্রাতায় একত্রে নৈনিতাল গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।

এই গৃহে যে প্রকারে আশ্রয় পাইলাম তজ্জন্য প্রাণে যে ভাব হইয়াছিল তাহা ডায়েরীতে এইরূপে লেখা ছিল,—"যেখানে নিরুপায় সেইখানেই 'মায়ের কোল' নিকট হইতেছে ; মা, মা বলে কবে বিগলিত হ'ব"। বুধবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত এইস্থানে অবস্থান করিয়াছিলাম এবং এখানে বেশ স্বচ্ছন্দে ছিলাম। প্রিয়নাথ বাবুর বাঙলায় একটী স্বতন্ত্র ঘর অতিথি অভ্যাগতের জন্য আছে, তথায় শয্যা, আলোক, জল, বসিবার জন্য চেয়ার, টেবিল, লেখনী, সজ্জা সমস্তই প্রস্তুত থাকে, কোন বিষয়ের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না।

প্রিয়নাথ বাবুর বাঙলায় থাকিয়া সহরের ভিতর বেড়াইতে গেলাম। প্রথমে বাবু সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত আলাপ হইল। তাঁহার ঘরে সঙ্গীত-বাদ্যের চিহ্ন দেদীপ্যমান! নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রযোগে তিনি এবং তাঁহার বন্ধুগণ সঙ্গীতের চর্চ্চা নিয়মিতরূপে করেন। আরো শুনিলাম পার্শ্বের বাড়িতে মুকুন্দবাবু, একজন ভাল সঙ্গীতজ্ঞ আছেন। আমি তো সঙ্গীত শাস্ত্রে নিতান্ত অজ্ঞ, তথাপি একটু ভয়ে ভয়ে জানাইলাম, আমি সঙ্গীত বিদ্যায় অভিজ্ঞ নহি,

কিন্তু ভগবানের নাম গান করা একটু আধটু অভ্যাস আছে ; যদি আপনারা অনুগ্রহ করে শোনেন, তাহা হইলে আমি প্রস্তুত আছি। প্রথম দিন সন্ধ্যার পর সারদাবাবুর বাড়িতে আমার সঙ্গীত হইবে স্থির হইল। সঙ্গতের সঙ্গে সর্ব্বদা আমার সঙ্গীত করা অভ্যাস না থাকায় ভাবিলাম তালে ঠিক হইবে কি না, অথচ বাদ্যযন্ত্র উপস্থিত সত্বেও সঙ্গতের সহিত না গাহিলে রসভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক একটু ব্যাকুল ভাবে ভগবানের স্মরণ করিয়া বাসা হইতে সারদাবাবুর বাড়ী আসিলাম। যথা সময়ে আমার সঙ্গীত আরম্ভ হইল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গত হইতে লাগিল, আমি একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম ; ডায়েরীতে এইরূপ লেখা আছে—"প্রথম দিন সঙ্গীত খুব হইল, সত্যই 'তাঁর' শক্তিতে হইল। স্মরণ লয়েছিলাম, প্রকাশিত হইলেন ; তালে ঠিক হইয়া গেল।"

এইদিনেই রাত্রিতে প্রিয়নাথ বাবুরা বাসায় আসিলেন। আমি বৃহস্পতিবার প্রাতে বাঙলার নিকট দাঁড়াইয়া প্রভাতী কীর্ত্তন করিলাম, প্রিয়নাথ বাবুর জামাতা—গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কেবল মনোযোগের সহিত শুনিয়াছিলেন, প্রিয় বাবুরা তিন ভ্রাতায় নির্ব্বাক ছিলেন। আহারের সময়ে আমাকে লইয়া, একঘরে একত্রে, (আমি স্বতন্ত্র পংক্তিতে) বসিয়া সকলের আহার হইত।

অযোধ্যানিবাসী রামপেয়ারে স্মরণ নামক জনৈক প্রাচীন ভক্তের সহিত আলাপ করিয়া বড়ই তৃপ্তি বোধ হইয়াছিল। রামপেয়ারের স্ত্রী পরিবার নাই, এখানে এক ভাই ছিল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে, ভাইপোদের দেখিতে আসিয়াছেন, বাজারে তাহাদের দুগ্ধ দধির দোকান আছে।

সারদাবাবুরা আমাকে কিঞ্চিৎ পাথেয় দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, "কয়েকদিন আপনি এখানে থাকুন আমরা আপনার পথ খরচের জন্য কিছু চাঁদা তুলিয়া দিব।" তাহাতে বোধ হয় আমি এইরূপই বলিয়াছিলাম "আমি এখন হরিদ্বারে যাইব, এবং কিছুদিন সেখানে থাকিব এমন ইচ্ছা আছে, এখন আমার আর কোন অর্থের প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ আমি আর বিলম্ব করিব না।"

বেরিলী ছাড়িবার সময় ক্ষিতীশবাবু আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "হরিদ্বার তীর্থস্থান, তথায় কেবল যাত্রির ভিড় হয়, আপনি সেখানে থাকিবেন না, কণ্খলে থাকিবেন, কণ্খল বেশ নির্জ্জন স্থান এবং সাধুদিগের অনেক আশ্রম আছে।

তথায় থাকিলে আপনার কোন অসুবিধা হইবে না। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের যে সেবাশ্রম আছে বোধহয় সেখানেও থাকিতে পারিবেন।"

৩রা কার্ত্তিক শনিবার রাত্রি ১২টার সময় প্যাসেঞ্জার ট্রেণে উঠিলাম, গাড়িতে বেজায় ভিড় ছিল, কিন্তু এমনি মনে উৎসাহ ও আনন্দ ছিল, যে, সে কষ্ট কিছুমাত্র বোধ হইল না—৪ঠা কার্ত্তিক প্রাতে হরিদ্বারে পৌছিলাম। (ক্রমশঃ)

কেন ?

কেন উঠে চাঁদ নীলিম আকাশে
ফুটে থাকে তারা শত ঠাঁই হাসে,
কেন রবিকর নিশীথ নীরব
কাহার আদেশ, কাহার বিভব ?

কেন ডাকে পাখী, কি মহিমা কয়
কাহার ইঙ্গিতে বহিছে মলয়,
কেন নর হাসে কেন কাঁদে তারা
মোহের স্বপনে থাকি আত্মহারা ?

কিসের লাগিয়া হরষিত মনে,
থাকে ফুটে ফুল সজনে বিজনে,
মধুর নিনাদে নদী কল্লোলিত,
কল কল রব কেন উল্লাসিত ?

অথবা বিজলি কালমেঘ কোলে
চমকি চমকি কেন নভে দোলে,
কেন বা ধরাতে আসে যায় আর ?
মানব জনম কি সাধন তার ?

সকলি বুঝিবা এক আজ্ঞা হতে
জগতের মহা অভাব পুরাতে,
সাধিছে মঙ্গল মহৎ-মহান
তাই নিজ কর্ম্মে, নহে কিছু আন।

শ্রীপৃথ্বীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গোবরডাঙ্গা হাইস্কুল।

গোবরডাঙ্গা হাইস্কুলের জন্ম কোষ্ঠী অবশ্যই আছে কিন্তু আমি তাহা দেখি নাই। না দেখিলেও অনুমান খণ্ডের জ্ঞানপ্রভাবে বলিতে পারি ইহা বয়সে পাঁচের কোটার মাঝামাঝি সংখ্যায় আসিয়াছে। প্রাচীন নিয়মানুসারে এখন বানপ্রস্থের সময় উপস্থিত হইলেও আমরা ইহার আরও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

গোবরডাঙ্গার স্কুল বাল্যে স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন বাবুর অপত্যনির্ব্বিশেষ যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল। ইহাকে সুস্থ, সবল এবং কর্ম্মক্ষম করিবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক হইত, তিনি সর্ব্বান্তকরণে তৎসমুদায়ই সরবরাহ করিতেন, তদানীন্তন গবর্ণমেণ্টও ইহার প্রতি সতত কৃপাদৃষ্টি রাখিতেন।

ক্রমে ইহা যৌবনসীমায় উপস্থিত হইল, কালবশে ইহার একমাত্র প্রতিপালক বাবু সারদাপ্রসন্ন পৃথিবীর মায়া কাটিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন, তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের হস্তে ন্যস্ত হইল; কোর্ট অব্ ওয়ার্ড তাঁহার পরিজনের ন্যায় স্কুলের জন্যও একটা বাঁধাবাঁধি মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন, কিন্তু ইহাতে তাহার ভরণপোষণের কোন প্রকার কষ্ট হয় নাই, কেন না ইহার কিছু দিনের পর হইতে মিউনিসিপালিটীও কিছু কিছু সাহায্য করিতেছিলেন।

হতভাগ্যের লক্ষণই এই, তাহার প্রথমে সুখ এবং শেষে দুঃখ ঘটিয়া থাকে, এই স্কুলের পক্ষেও ঠিক তাহাই ঘটিল। মিউনিসিপালিটী সাধারণের সম্পত্তি, সাধারণের মঙ্গল উদ্দেশ্যেই ইহার সৃষ্টি ও স্থিতি; কিন্তু কিজন্য জানি না আজও বুঝিতে পারিলাম না, যে কি বিচারে কোন্ মঙ্গল সাধন উদ্দেশ্যে স্কুলের এই মিউনিসিপাল এড্ বন্ধ হইল। এদিকে গবর্ণমেণ্ট এড্ ক্রমশঃ কমিতে আরম্ভ করিল, বাবুরাও কিঞ্চিৎ ন্যূনহারে মাসিক সাহায্য দিতে আরম্ভ করিলেন। আয় এইরূপে খুব কমিয়া গেল বটে, কিন্তু তখনও মোটাভাত ও মোটাকাপড়ের অভাব-ক্লেশ হয় নাই, স্কুল একরকম সুখে দুঃখে চলিতে লাগিল।

তারপরই একেবারে সর্ব্বনাশ। অকস্মাৎ অচিন্তনীয়ত্রপরিণাম। এই দারুণ অনাটনের সময় এবং বৃদ্ধাবস্থায় স্কুল হঠাৎ সৌখীন হইয়া বসিল। অনেক

সময়ে সামাজিকতার খাতিরে পেটে না খাইয়াও বৃদ্ধকে হেয়ারব্রাশ্ ব্যবহার করিতে হয়, প্যাণ্টলুন কোট দিয়া নিজের বার্দ্ধক্যসুলভ হাড়্ গোড় ঢাকিতে হয় নতুবা আত্মরক্ষা অসাধ্য হইয়া উঠে। অন্তরে সখ না থাকিলেও কালের গতিতে এবং সামাজিকতার অনতিক্রমনীয় প্রভাবে বিদ্যালয়কে এখন বাহ্য সৌখীনতা দেখাইবার প্রয়োজন হইল।

সে, পূর্ব্বে পর্ণাচ্ছাদিত আটচালা গৃহে কেমন সুখে সচ্ছন্দে, কেমন মনের সুখে—কেমন অনন্যসাধারণ সম্ভ্রমের সহিত কালযাপন করিত। এখন বিল্‌ডিংএর মধ্যে থাকিয়াও সতত সন্ত্রস্ত,—কখন কে কিরূপ রিমার্ক করিবে এই শংকায় নিরন্তর উদ্‌বিগ্ন। এখন প্রাচীরপরিবেষ্টিত সুপ্রশস্ত বাস্তুভূমিতে প্লেগ্রাউণ্ড চাই, বিনোদকানন চাই, পাইখানা ও ফিল্‌টার্ড ওয়াটার্ চাই, বাজারের মিষ্টদ্রব্য ভোজনে রসনা পরিতৃপ্ত হইলেও তাহা আনিতে সাহস হয় না কারণ নিশ্চয়ই তাহাতে রোগের বীজাণু্ আছে। এ সমস্ত ব্যতীত সভ্য জনোচিত একটী লাইব্রেরীরও প্রয়োজন। ইহার যে কোন একটীর অভাবে ভদ্র সমাজে মুখ দেখাইবার উপায় নাই।

সখ এই পর্য্যন্ত হইলেও ততটা ভাবিবার বিষয় ছিল না। কিন্তু ইহার মাত্রা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেকালে ইন্দুর ধরিতে পারিলেই বিড়ালের কার্য্যদক্ষতা সপ্রমাণ হইত, কিন্তু এখন আর তাহা হয় না, এখনকার দিনে ইন্দুর ধরা বিড়ালের কোয়ালিফিকেশন্ নহে, গাত্রে দুই তিনটা ডোরা ডোরা দাগ থাকিলেই হইল। এই স-কলঙ্ক বিড়াল শূন্য গৃহ অরণ্যের নামান্তরমাত্র। এখন কার্য্য পরিচালনার জন্য অন্ততঃ দুজন গ্র্যাজুয়েট্ এবং দুজন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট্ চাই, অন্যান্য শিক্ষকদিগেরও অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্গল দ্বার মুক্ত করিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। দরিদ্র পল্লীগ্রামের স্কুলে এত বাড়াবাড়ি সহিবে না বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে সে চিন্তা বিড়ম্বনামাত্র যাহা হউক, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ তল্লাস করা উচিত "যত্নে কৃতে যদি সিধ্যতে কোঽত্র দোষঃ।"

এখন কথা এই যত্ন করে কে? এক বাবুরা ব্যতীত এ বিপত্তি সাগরের অন্তরণী দেখি না। গোবরডাঙ্গা স্কুলের সন্তান সন্ততি ডাক্তার, উকীল, মোক্তার, পোষ্টমাষ্টার, স্কুলমাষ্টার, কেরাণী, নায়েব, গোমস্তা, মার্চেণ্ট আর কতই বা বলিব৹ অসংখ্য বর্ত্তমান, কিন্তু কখন এক পয়সার মিছরি দিয়াও জননীর কুশল

জিজ্ঞাসা করেন না। বৃদ্ধা, বিপন্না জননী অদ্যাপি হাঁটকুড়ীর মত তাঁহার পিতৃকুলের মুখ পানে চাহিয়া আছেন। মাননীয় 'কুশদহ' সম্পাদক মহাশয় ইঙ্গিতে বলিয়াছেন "কাহাকেও কিছু না বলাতে স্কুলের সন্তানদিগের কিছু অভিমান হইয়াছে, মাননীয় জমীদার মহাশয়গণ আহ্বান করিলে তাঁহারা সানন্দে মাসিক চাঁদা দিতে প্রস্তুত আছেন"।* দেশের লোকের মনের ভাব এমন হইলে বাবুরাও সানন্দে সকলকে আহ্বান করিবেন বলিয়া ভরসা করিতে পারি।.........দ্বিতীয় উপায় বারোয়ারি,বারোয়ারির টাকায়, ভদ্র সমাজে এখন বিস্তর সৎকার্য্য সংসাধিত হইয়া থাকে। শুদ্ধ তামসিক প্রকৃতি লোকের প্রীতির নিমিত্ত দুদিনের মধ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা যেন কেমন বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়, সেই জন্য মাননীয় জমীদার মহাশয়দিগকে এ বিষয়ে সূক্ষ্ম বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি, দেশের মঙ্গলের জন্য, সাত্ত্বিক ও রাজসিক প্রকৃতি মহানুভব মহাশয়গণের প্রীতিবর্দ্ধনার্থ, যেন বারোয়ারির অর্দ্ধেক টাকা ব্যয়িত হয়, অপরার্দ্ধ আমোদ আহ্লাদের জন্য ব্যয় করিয়া যেন সর্ব্বসাধারণকে সুখী করা হয়। যাঁহারা বারোয়ারির কেবল গান বাজনার পক্ষপাতী তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে দেশে স্কুলের প্রয়োজন নাই অথবা স্কুল থাকাতে দেশের একটী মহান্ অকল্যাণ হইতেছে? যদি তাহা না হয়, তবে বারোয়ারির কতক টাকা দিয়া স্কুল রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। কেন যে এত দিন বারোয়ারির টাকায় কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় নাই ভদ্রসমাজ বলিয়া তাহা ভাবিয়া দেখিবার কথা। এরূপ হইলে দেশের সকলকেই বারোয়ারির চাঁদা দেওয়া সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বিদ্যাশিক্ষা ও আমোদ প্রমোদ উভয়ই প্রার্থনীয়। এখন হইতে বারোয়ারির

* "স্কুলের সন্তানদিগের অভিমান হইয়াছে, * * * সানন্দে মাসিক চাঁদা দিতে প্রস্তুত আছেন।" এরূপ কথা তো কোথাও আমরা বলি নাই। বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনজন্য বনগ্রাম সহযোগী বলিয়াছিলেন, "আশা করি সাধারণে এ বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন"। তাই আমরা বলিয়াছিলাম (অগ্রহায়ণ সংখ্যায়) আপন হইতে দেশের লোক যত্নবান্ হইবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। বরং বড় বাবু যত্নবান্ হইয়া দেশের কৃতবিদ্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী "স্কুল কমিটী" গঠন করিয়া, অগ্রে স্কুলের প্রতি সাধারণের যত্ন আকর্ষণ করাই প্রকৃষ্ট উপায়। শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয়কে আর একবার ঐ লেখাটা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। (কুঃ সঃ)

কার্য্য দেখিয়া সর্ব্বপ্রকার লোকই যেন আনন্দ লাভ করে এবং সকলেই যেন বারোয়ারির পক্ষপাতী হয়। গোবরডাঙ্গার বারোয়ারি ও স্কুলের কর্ত্তৃত্ব একই শক্তিশালীহস্তে ন্যস্ত, তাই ভরসা আছে, গুটিকতক তুচ্ছ টাকার জন্য স্কুলের হঠাৎ অনশনমৃত্যু ঘটিবে না।

শ্রীবরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়, গোবরডাঙ্গা।

হয়দারপুর।

গোবরডাঙ্গার অন্তর্গত হয়দারপুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। একটি পল্লী বলিলেও বলা যায়। গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও অধিকাংশ ব্যবসায়ী ধনীর বাস। তন্মধ্যে তৃতীয় পুরুষ, পরলোকগত রামজীবন আশ, ভগবতিচরণ দে এবং রামচন্দ্র কোঁচের নাম উল্লেখ যোগ্য। তৎপরে, পরলোকগত সৃষ্টিধর কোঁচ, রামগোপাল আশ, শ্রীরাম আশ, রামগোপাল রক্ষিত, মঙ্গলচন্দ্র আশ, গোপালচন্দ্র আশ, প্রভৃতি ধনীগণের জন্য গ্রামখানি এক সময়ে সমৃদ্ধির গৌরব ঘোষণা করিয়াছিল। সেও অধিক দিনের কথা নহে, অন্যূন ৪০।৫০ বৎসরের কথা। কিন্তু তখনও ঐ গ্রামের যুবকদলের নৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না; কেন না ধনের সঙ্গে শিক্ষাবিহীনতা হইলে সচরাচর যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছিল। অন্যদিকে, সর্ব্বত্রই বিধাতার বিচিত্র লীলা, তাই বুঝি, ঘন আঁধার রাত্রির মধ্যে খদ্যোতিকার সদৃশ, ঐ দুর্নীতি পরায়ণ যুবকদলকে সুপথ দেখাইবার জন্য এবং ভবিষ্যতে গ্রামের নামকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিবার জন্য তাহার মধ্যে পরলোকগত রাসবিহারী চেল, বি, এ, ভূতনাথ পাল, বি, এ, বিহারীলাল আশ এবং লক্ষ্মণচন্দ্র আশ, উদ্ভব হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্ধ চক্ষু দেখিয়াও দেখে না, অসাড় হৃদয় জাগিয়াও জাগে না। ফলে কি হইল? কয়েকটী যুবকের অকালমৃত্যু, ধনক্ষয়, কেহ বা চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্য হারাইয়া জীবন্মৃতাবস্থায় থাকিয়া কিছু কালের মধ্যে ইহলীলা শেষ করিল। অবশেষে একটী বালকের একটু জাগ জাগ ভাব দেখিয়া আমাদেরও মনে হইল, বুঝিবা শুভদিন আসিল, কিন্তু গ্রামখানির এমনি দুর্ভাগ্য, যে সেই বালক বা যুবক হরিবংশও প্রভাতকুসুম, প্রভাতেই ঝরিয়া পড়িল। এখন ধনে, স্বাস্থ্যে, নীতিতে বা ধর্ম্মে, সকল রকমেই যেন হয়দারপুর গ্রামের অবনতির অবস্থা দেখা যাইতেছে।

সম্প্রতি আমরা একখানি পত্র পাইয়াছি—জনৈক যুবক এই গ্রামের নৈতিক অবস্থার দিন দিন অবনতি দেখিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আমরা এই পত্র প্রাপ্তে দুঃখের মধ্যেও সুখী হইলাম, এই জন্য যে, দেশের দুর্গতি দূরের একটী প্রধান উপায় "ব্যথিত হৃদয়।" কোন দেশ, কোন জাতি অথবা কোন ক্ষুদ্র পল্লীর দুর্দ্দশার জন্যও যদি অন্যের হৃদয় কাঁদে, আর সেই বেদনা বোধ ক্রমে ঘনীভূত হয়, তবে তাহা হইতেই মহৎ মঙ্গল ফল উৎপন্ন করে। আমরা বলি, গ্রামে যে ২।৪ টী চরিত্রবান্ যুবক আছেন, তাঁহারা একত্র হইয়া বিনীতভাবে জ্ঞান আলোচনা করুন, এবং সাময়িক পত্রিকা ও ভাল ভাল পুস্তক পাঠ দ্বারা, যাহাতে অপরেও জ্ঞান পথে—সৎপথে আকৃষ্ট হয় তাহার চেষ্টা করুন। শুভ চেষ্টার ফল স্বরূপে ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করিবেন। আর এ পথের সম্বল বিশ্বাস ও দৃঢ়তা। অন্যথা পাশব বলে মানুষকে ভাল করা যায় না।

স্থানীয় সংবাদ।

আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি,—

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ রক্ষিত সংগৃহীত "কুশদ্বীপ কাহিনী ও খাঁটুরার ইতিহাস" নামক সপ্তগ্রাম বিবরণী সম্বলিত, সুবৃহৎ গ্রন্থ, কুশদহ নিবাসী নরনারীকে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। ডাকে লইলে তিন আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে।

শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত।

১৫৩।১ কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের রুদ্রপুরের একটী বন্ধু অযাচিতভাবে ১০৲ দশ টাকা দান করিয়া 'কুশদহের' মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। দাতার একান্ত অনিচ্ছায় নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তবে দাতা এইটুকু অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "কুশদহ সম্পাদককে অসুস্থ শরীরেও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে দেখিয়া, এই সামান্য সাহায্য প্রদত্ত হইল, সুবিধা থাকিলে ১০০৲ একশত টাকা দিতাম, যদি তাহাতে কিঞ্চিৎ কষ্টের লাঘব হইত।" ভগবান্ দাতার হৃদয়কে দিন দিন আরো উন্নত করুন।

Printed by J. N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

দ্বিতীয় বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩১৬। [৫ম সংখ্যা।



খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়

সম্বলিত, ধর্ম্ম, সমাজ ও

বিবিধ বিষয়ক

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

কুশদহ-কার্য্যালয়

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১।০ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য /১০ পয়সা।

শাস্ত্র সঙ্কলন।

১৬। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম্পথস্তত্ কবয়ো বদন্তি॥

কঠোপনিষৎ ৩,১৪

হে জীবসকল, উত্থান কর, অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগ্রত হও, এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতেরা এই পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম বলিয়াছেন।

১৭। এষ সর্ব্বেষু ভুতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যায়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥

কঠ ৩।১২

এই চিৎস্বরূপ পরমাত্মা সমুদায় প্রাণীর মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে স্থিতি করিতেছেন। অধ্যাত্মদর্শী সাধকগণ একাগ্র মনে তাঁহাকে দর্শন করেন।

১৮। নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানে নৈনমাপ্নুয়াৎ॥

কঠ ২।২৪

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, এবং কর্ম্মফলকামনাপ্রযুক্ত যাহার মন স্থির হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

১৯। স্বর্গে লোকে ন ভয়ঙ্কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং, ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাশনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥

কঠ ১।১২

স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, হে মৃত্যু, তুমিও সেখানে নাই, জরাকে কেহ

ভয় করে না, ক্ষুধা পিপাসা এ উভয়কেই অতিক্রম করিয়া শোক হইতে মুক্ত ব্যক্তি স্বর্গলোকে আনন্দিত হন।

২০। য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামঙ্কামম্পুরুষোনির্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥

কঠ ৫।৮

যখন তাবৎ প্রাণী নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পূর্ণ পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করেন, তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপে উক্ত হয়েন, তাঁহাতে লোকসকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

২১। যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

তলবকারোপনিষৎ।৪

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

২২। অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥

কঠ ৪।২

অল্পবুদ্ধি লোকসকল বহির্ব্বিষয়েতেই আসক্ত হইয়া মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়; ধীর ব্যক্তিরা ধ্রুব অমৃতকে জানিয়া সংসারের তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না।

কৃষ্ণকুমার বাবুর কারাবৃত্তান্ত।

ছাত্রসমাজের আমার কয়েকটী অতি প্রিয় বন্ধু, আমার কারাবাস কালে ঈশ্বরের যে কৃপা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং সেখানে কিরূপে আমি জীবন

যাপন করিতাম সে সকল কথা শুনিবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।

কয়েকখানি সংবাদপত্রের রিপোর্টার আমাকে পুনঃ পুনঃ সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগের নিকট সে সকল কথা বলিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিয়াছি। আপনারা এখানে আমার ধর্ম্মবন্ধুগণ উপস্থিত হইয়াছেন, বিশেষতঃ যুবকগণ যখন এই সকল কথা বলিতে অনুরোধ করিতেছেন তখন আজ সেই কথা—আমার প্রাণের কথা আমি আপনাদিগের নিকট বলিব।

যখন কলিকাতা সহরে সর্ব্বাগ্রে একটা নির্জ্জন ঘরে আমাকে আবদ্ধ করে, তখন রাত্রি প্রায় ৭টা। যখন সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম তখন ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ হইল। আমি দেখিতে পাইলাম, ঈশ্বর সেই গৃহে বিদ্যমান রহিয়াছেন। আমি দেখিতে পাইলাম, তাঁহার প্রেমের জ্যোতিতে সেই গৃহ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আমি বলিলাম একি! তোমার সন্তান যখন বিপদের মধ্যে পতিত হয় তখন কি তুমি এমন করিয়াই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাক? ঈশ্বরের এমন জীবন্ত, এমন প্রত্যক্ষ অনুভূতি আমি পূর্ব্বে আর কখনও অনুভব করি নাই। আমি দেখিলাম তিনি আমার হৃদয়ের মধ্যে—তিনি আমার চতুর্দ্দিকে। তিনি আমার প্রাণ মন পূর্ণ করিয়া রহিলেন। সারারাত্রি কাটিয়া গেল, এক মিনিটও ঘুম হইল না।

তারপর যখন আমি রেলগাড়ীতে উঠিলাম, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের যে কি দয়া তখন তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। যখন টুণ্ডলা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম তখন আমার প্রাণ হইতে এই প্রার্থনা উত্থিত হইল, "হে ঈশ্বর! ৫৫ বৎসর বয়স হইয়াছে, কিন্তু আমি এখনও তোমার নিকট সম্পূর্ণ ধরা দিতে পারি নাই, তাই কি প্রভু তুমি আমাকে দয়া করে ধরে নিয়ে এলে? তাই কি তুমি এই কারাবাসকে আমার উদ্ধারের উপায় করিবার জন্য এমন আয়োজন কর্‌লে? এমন কৌশল কর্‌লে? আমাকে নিয়ে চল্লে? তুমি যে আমার তা'ত প্রভু আমি জানি। কিন্তু এবার আমি সে কথা কারাগার হতে অনুভব করে যেন বাহির হই। এবার যেন তোমার কাছে সম্পূর্ণ ধরা না দিয়ে আমি না ফিরি। এবার এই দয়া তুমি কর।"

যে তিনজন জেলের কর্ত্তৃপক্ষ—একজন জেলার, একজন এসিষ্টাণ্ট জেলার

ও একজন ওয়ার্ডার—তিন জনেই ইংরেজ—ইঁহারা যে আমাকে কি আদর যত্ন করেছিলেন তা' আর আমি বল্‌তে পারি না। তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। যিনি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ছিলেন তিনি একজন Indian Medical Serviceএর লোক; তিনি যে কত স্নেহ করেছেন তা আমি বলে উঠ্‌তে পারি না। তার পর আগ্রার ম্যাজিষ্ট্রেট্ যিনি, তাঁহার সদ্ব্যবহারের কথা ভাষায় বর্ণনা হয় না। যিনি কমিশনার—আমি তাঁহার নামটা ঠিক জানি না—তিনিও অতিশয় সদ্ব্যবহার করেছেন।

এ সকল কাহার করুণা? কার কৃপায় তাঁহারা আমার প্রতি এরূপ সদ্ব্যবহার করেছেন? আমি তাঁহাদের এক এক জনের মুখে পিতা পরমেশ্বরের ছবি দেখ্‌তেম। দেখ্‌তেম, তিনি তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান থেকে, তাঁহাদিগকে সুমতি দিচ্ছেন।

আমি প্রতিদিন প্রাতে ৪টার সময় শয্যাত্যাগ করতেম। ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত, প্রাত্যহিক উপাসনা কর্‌তেম। আজ আপনারা এখানে যত লোক উপস্থিত আছেন, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, আপনাদের অনেককেই উপাসনার সময় দেখ্‌তে পেতেম, অনেকের জন্যই প্রাণ হতে প্রার্থনা উঠ্‌ত। এখানে যত প্রচারক উপস্থিত আছেন, বা নাই, সব যায়গায় সকল প্রচারকের জন্য আমার প্রাণে এই প্রার্থনা উঠ্‌ত—'প্রভু তুমি তোমার সেবকদিগকে বল দাও, যাতে আমাদের দেশের সকল প্রকার কল্যাণ হয়।' এখানে যত ব্রাহ্ম আছেন, যত ধর্ম্মবন্ধু আছেন, সকলের কথা স্মরণ কর্‌তাম। যাঁরা রোগার্ত্ত তাঁদের জন্য প্রাণে এই প্রার্থনা আস্‌ত—"ভগবান, ইঁহাদের দ্বারা যে তোমার আরো অনেক কাজ করাইতে হইবে—ইঁহাদিগকে এখান হইতে নিয়ে যেয়ো না।" এইরূপ প্রার্থনা সঙ্গত কি অসঙ্গত, ভাল কি মন্দ, এতে ফল হয় কিনা তা মনে আস্‌ত না, প্রার্থনা আস্‌ত, তাই প্রার্থনা কর্‌তেম।

ভগবান কি প্রার্থনা শোনেন না? শোনেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়েছে এই, মানুষ সরল হৃদয়ে যে প্রার্থনা করে তিনি সে সব প্রার্থনা শুনেন। পূর্ব্বে আমি শুনেছি যে, তিনি সকলের সকল প্রার্থনা শোনেন না। এক একবার প্রার্থনা ক'রে আমার ভয় হ'তো কিন্তু আমি দেখেছি এই, আমার সকল প্রার্থনাই পূর্ণ হয়েছে। এখানে কেহ হয়তো বল্‌তে পারেন যে তোমার সব

প্রার্থনা যখন ঈশ্বর শোনেন, তবে আরও আগে মুক্তি লাভের জন্য কেন প্রার্থনা কর নাই? না, আমি মুক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করি নাই, আমি প্রার্থনা করেছি, "তুমি যেজন্য আমাকে কারাগারে আন্‌লে—তার চিহ্ন না নিয়ে আমি এখান থেকে যাব না।" ঈশ্বর সেই প্রার্থনা শুনেছেন।

লোকে বলত একটা ঘটনা উপলক্ষে আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে—রাজার জন্মদিন উপলক্ষে আমার মুক্তি হতে পারে, আমার মন বল্‌ত—না, তা হলে লোকে বল্‌বে এ মানুষের কৃপা, ঈশ্বরের কার্য্য নয়। আমি প্রার্থনা কল্লেম "ঈশ্বর, আমাকে এমন করে মুক্তি দাও যে তাতে তোমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকে।" আমি সর্ব্বশেষ প্রার্থনা কর্‌তেম, "ঈশ্বর, আমার জন্মভূমির কল্যাণ যাতে হয় তা' তুমি কর।" আমি বেশ জানি, আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ হবে—অনেক পরিমাণে হয়েছে।

প্রার্থনার পর, যখন ৬টা বেজে যেত,অন্যান্য কাজ শেষ করে, ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত বাহিরে বেড়ান নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমি নিয়ম কল্লেম, এই এক ঘণ্টা যেমন শরীর চল্‌বে, মনকেও তেমনি সাধন, তেমনি একটা Disciplineএর মধ্যে আন্‌তে হবে। ঈশ্বরের এক একটা স্বরূপ মনে আন্‌তেম, আর তাই নিয়ে সাধন কর্‌তেম। "সত্যং"—ঈশ্বর "সত্যং"; শরীর চালনার সঙ্গে সঙ্গে মন জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরের বিদ্যমানতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ত।

এইরূপে এক ঘণ্টা সাধনের পর ঘরে এসে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে, উপাসনায় প্রবৃত্ত হতেম। এই উপাসনাতেও পরিবারের জন্য, ব্রাহ্মসমাজের জন্য, দেশের জন্য প্রার্থনা কর্‌তেম।

৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে বই পড়্‌তেম। আমি কতকগুলি বই চেয়েছিলেম; জেলের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে সেগুলি দিয়েছিলেন। আমার উদ্দেশ্য ছিল, কি অপরাধে আমাদের পতন হল, এই প্রাচীন জাতি কিরূপে বড় হয়েছিল আর কেন, কি অপরাধে তাহাদের পতন হল, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করা। বিনা অপরাধে ত কাহারও পতন হয় না; আর ঈশ্বরের রাজ্যের এই এক অখণ্ড নিয়ম যে অপরাধ করে কেহ নিষ্কৃতি পায় না, যে পাপ করে তাহার পতন হবেই। তাই আমি এই তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়েছিলাম যে, প্রাচনী জাতি সমূহ ধ্বংস হ'ল কেন? আমি শিখদের উত্থান ও পতনের বিবরণ পাঠ

করিতে প্রবৃত্ত হলেম। এইরূপ মারহাট্টা জাতির পতনের কারণও জানিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু এদেশে এবং ইংলণ্ডে অনুসন্ধান করেও বই পাওয়া গেল না। এসিরিয়া, বেবিলনিয়া, ঈজিপ্ট—এক সময়ে যারা এত উন্নত হয়েছিল তারা এমন পতিত হল কেন? এই সকল পতিত জাতির পতনের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে আমি দেখ্‌লেম, প্রত্যেক জাতির মধ্যে সময় সময় কতকগুলি পাপ এসে প্রবেশ করে; মানুষের পাপের ফলে জাতির মধ্যে কতকগুলি পাপ এসে পড়ে; তার পর সেই পাপ দূর কর্‌বার জন্য যদি একদল লোক জীবন উৎসর্গ করে তখন আবার তাদের উত্থান হয়।

২টার সময় আবার পড়্‌তে বস্‌তেম। এইরূপে আমি অনেকগুলি বই পড়িয়াছি, যা জীবনে হবার আর উপায় ছিল না। তার পর জলযোগ ক'রে ৪টায় আবার বাহির হ'তেম। আবার ১ ঘণ্টা সেই ঈশ্বরের স্বরূপের সাধনায় মনকে নিযুক্ত কর্‌তেম। ৫টার সময় ফিরে এসে এক ঘণ্টা পড়্‌তাম। ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত উপাসনা, প্রার্থনা করতেম, কেবল যে ব্রাহ্মসমাজের লোকদের জন্য প্রার্থনা কর্‌তেম, তা নয়, ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে যাঁরা নানাস্থানে নানা সৎকর্ম্মে নিযুক্ত রয়েছেন তাঁদের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতেম। ৯টায় শয্যায় গমন কর্‌তেম।

নানা বই পড়ে, জাতি সমূহের উত্থান পতনের ইতিহাস পড়ে, আমার এই দৃঢ় ধারণা জন্মেছে—পূর্ব্বেও বরাবর আমার এই ধারণা ছিল—যে মানবের ইতিহাসে ঈশ্বর অবিনশ্বর অক্ষরে এই আদেশ প্রচার করেছেন যে, যে জাতি ধর্ম্ম পথে চলে সে জাতির কল্যাণ হয়, আর যে জাতি অধর্ম্ম পথে চলে সে জাতির অকল্যাণ হয়। একজন যদি পাপ করে, সমাজ দুর্গন্ধময় হ'য়ে যায়, সে জাতির পতন অনিবার্য্য হয়। আমি একথা বুঝেছি, ভাল করেই বুঝেছি, তাই বলি, কেহ একজনও পাপের পথে যেয়োনা, তোমার পাপের ফলে সমাজ কলুষিত হবে, তোমার দেশের অধোগতি হবে।

ট্রেণে যখন আস্‌ছি, আমার একজন পূর্ব্বতন ছাত্র আমাকে বল্‌লে—"শুনেছেন, আলিপুরের উকিল, আশুবিশ্বাসকে গুলি ক'রে মেরেছে।" শুনে আমার প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ হ'ল। আশুবাবু ও আমি অনেক দিন একসঙ্গে স্বদেশের সেবা করেছি! তাই মনে হল, কেন আমার দেশের লোক এমন

কুকর্ম্ম কর্‌লে—এতে যে আমার দেশে পাপের সঞ্চার হল, দেশ যে উৎসন্ন যাবে। আমার মনে হল, এই আমার কারাবাসে যদি আমার পুত্র কেঁদে আকুল হয়, তবে আশুবাবুর ছেলেদের পরিবারের কি যাতনা হয়েছে!

কেহ হয়ত বলিতে পারেন, বলিদান ব্যতীত জাতির কল্যাণ হয় না। ঠিক কথা। কিন্তু সে বলিদান কি এমনি করে কর্‌বে? আর, ঐ যে দেশের রাজনৈতিক দুর্গতি, সামাজিক অত্যাচার, ধর্ম্মের গ্লানি—উহা দূর করিবার জন্য তিল তিল করে রক্ত দান করিবে না (আত্ম) বলিদান করিবে না?

এদেশের মধ্যে দেখি কয়েক জন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক স্বার্থ সুখের চিন্তা ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়া দেশের সকল কল্যাণ সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এস না, দেশের কল্যাণ যাঁরা চাও, তাঁদের মত সকল ভয় ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়ে দেশের কল্যাণকর কার্য্যে যোগ দাও।

কেহ কেহ আমাকে বলেছেন, শিক্ষিত যুবকেরা ডাকাতি করিতেছে। আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। আমি শুনিয়াছি, কোন কলেজের ছেলে ডাকাতি করিয়াছে বলিয়া ধরা পড়ে নাই। ভদ্রলোকের ছেলেরা দুই একজন ধরা পড়েছে বটে; কিন্তু অনেকে মুক্তিলাভও করেছে। আমি জানি না ভদ্রলোকের ছেলে কেহ, একজনও ডাকাতি করেছে কি না। যদি দুই একজন এমন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'য়ে থাকে, সমস্ত শিক্ষিত যুবকদের প্রতি ডাকাত বলিয়া যে সন্দেহ জন্মেছে, যে অপবাদ রটেছে, তা' দূর কর্‌তে হবে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, যাঁরা আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল, তাদের সম্বন্ধে আমি কি মনে করি। আপনারা ত আমাকে জানেন, আমার সুকার্য্য দুষ্কার্য্য, ভালমন্দ, আপনারা সবই জানেন। আপনারা আমাকে যেরূপ জানেন এমন আর কেহ জানে না। আপনারা যদি জান্‌তেন যে ব্রাহ্মসমাজের যে মাহাত্ম্য তা হ'তে আমি বিচ্যুত হয়েছি—কোন সত্য হ'তে আমি বিচ্যুত হয়েছি—আমাকে আজ আপনারা লাথি মেরে দূর করে দিতেন। আমি জানি, ব্রাহ্মসমাজের লোক কোন মানুষ দেখে না, সত্যকে দেখে। সুতরাং আপনারা যে আমাকে কোন গর্হিত দুষ্কর্ম্মকারী বলে মনে করেন না, তা' আমি আজ বুঝেছি—আগেও বুঝেছি—কারণ ব্রাহ্মসমাজ হ'তে জেলে আমার নিকট সহানুভূতি জানাইয়া পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠান হয়েছে।

কিন্তু আমাকে যাঁরা কারাগারে প্রেরণ করিয়াছিলেন আজ বলছি তাঁদের প্রতি আমার ঘৃণা নাই। ঈশ্বর কারাগারে আমার কাছে আপনাকে প্রকাশ করেছেন, সুতরাং যাঁরা আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেছিলেন তাঁদের জন্য আজ আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—ভগবান দয়া করে তাঁদের সুমতি দিন্। আর আমাকে যে তাঁরা দয়া করেছেন সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ দিই।

জীবাত্মার ব্যাকুলতা।

"পূজিব প্রাণেশে বলি জীবাত্মা ব্যাকুল!"

ওরে জীব! দেখরে অন্তরে প্রবেশিয়া,
কি চায় তোমার আত্মা পরাণ ভরিয়া।
অপূর্ণ পূরণ করি পূর্ণে গতি তার,
পূজিতে প্রাণেশে করে ইচ্ছা অনিবার।
ভবাগারে আঁধার দেখিয়া জ্যোতি চায়,
জ্যোতির্ম্ময় কৃপাকরি দেন তাহা তায়।
লভিয়া আলোক সেই কত সুখী হয়,
স্বভাবে এভাব হয় আপনি উদয়,
যেমতি আঁধার ঘরে শিশু দীপালোক
পেয়ে, কান্না ভুলে খেলে পাইয়া পুলক,
তেমতি জীবাত্মা নিরখিলে স্বপ্রকাশ,
হয় তার হৃদে কত আনন্দ-বিকাশ।
তিনি হন চির-পূজ্য সকলের মূল,
"পূজিব প্রাণেশে বলি জীবাত্মা ব্যাকুল!"

পরিব্রাজক

কুশদহ। (৩)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"কুশদহ" সম্বন্ধে এ দেশে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে ভীমসেন দিগ্বিজয়ে, বহির্গত হইয়া কুশদহ জয় করিয়া ইহাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত করেন। এ কারণ কুশদহকে পৌণ্ড্রদেশ কহে। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ,—গোপ, গোপাঙ্গনাগণ সহ এ দেশে আসিয়া কুশদহকে পবিত্র করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গিগণ এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এ দেশে বাস করিতে লাগিলেন। গয়েশপুর, ঘোষপুর, গোপিনীপোতা, কানাইনাট্যশালা, গোবরডাঙ্গা, গোপীপুর (গৈপুর), গোপালপুর প্রভৃতি স্থানের নাম তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে কানাই নাট্যশালা গ্রামের ভূমি খনন কালে অনেক উৎকৃষ্ট মন্দিরের ভিত্তি, সুবৃহৎ বৃক্ষ ও বৃহৎ বৃহৎ মনুষ্য কঙ্কাল দেখা গিয়াছিল। ইহাতে বোধ হয় বহু পূর্ব্বকালে এই স্থানে ধনজন পূর্ণ মহা সমৃদ্ধ জনপদ ছিল।

এই কুশদহের পূর্ব্ব সীমায় যেখানে ইছামতী নদীর সহিত যমুনা নদীর মিলন হইয়াছে সেই স্থানে যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের সহিত রাজা মানসিংহের যুদ্ধ হইয়াছিল; এবং সেই যুদ্ধে মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া মানসিংহ দিল্লীতে লইয়া যাইতেছিলেন, এবং পথিমধ্যে প্রতাপাদিত্য মৃত্যুমুখে পতিত হন। কুশদহের দক্ষিণ সীমায় যে পথ "গৌড়বঙ্গ" বলিয়া খ্যাত, সেই পথ দিয়া মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে জয় করিতে গিয়াছিলেন, উক্ত পথের চাপ্‌ড়া নামক স্থানে মানসিংহ যখন সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন দারুণ বর্ষাকাল। সৈন্যদিগের মধ্যে খাদ্যাভাব হওয়ায় মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ভবানন্দ মজুমদার রাশি রাশি খাদ্যদ্রব্য এই কুশদহের মধ্য দিয়া লইয়া মানসিংহের চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে মানসিংহ যদি ভবানন্দ মজুমদার, চাঁচড়ার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবেশ্বর রায়, ও গৃহ শত্রু কচুরায়ের সাহায্য না পাইতেন তাহা হইলে বঙ্গদেশের ইতিহাস আজ আমরা অন্যরূপ দেখিতাম।

ইছাপুরের রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের বিবরণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার বংশাবলীর বিবরণের সহিত ইছাপুরের বিবরণ বর্ণনা করিব।

রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের ৪ পুত্র ও ১টী কন্যা। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের পৌত্র রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী চতুর্দ্ধুরীণের সময়ে ইছাপুরের বিখ্যাত ৫টী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই ৫টী মন্দিরের নাম নবরত্ন, যোড়বাঙ্গালা, নাটমন্দির, দোলমঞ্চ ও মঠমন্দির।

এই ৫টী মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিয়া অনেকে ইহাদিগকে দেবশিল্পি বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া থাকে। বাস্তবিক ইহারা তাৎকালীন ঢাকাই শ্রেষ্ঠশিল্পী দ্বারা রঘুনাথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি যে কয়েকটী মন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি সেই অবস্থায় আছে। রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ ও তাঁহার বংশের অনেকে কুলীন ব্রাহ্মণ আনাইয়া ইছাপুরে বাস করান; এবং অনেকে এই সকল ব্রাহ্মণদিগকে কন্যা দান করিয়াছিলেন। এই চৌধুরী বংশের পঞ্চানন চৌধুরীর এক কন্যার সহিত কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজা শিবচন্দ্রের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের বিবাহ হয়। এবং রামচরণ চৌধুরীর কন্যার সহিত সারষা নিবাসী শ্যামরাম মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। এই শ্যামরাম মুখোপাধ্যায়ই গোবরডাঙ্গার বর্ত্তমান জমীদার বংশের পূর্ব্বপুরুষ। গোবরডাঙ্গার বিবরণ লিখিবার সময়ে তাহা বর্ণিত হইবে।

শ্রীযুক্ত সুরনাথ চৌধুরীর পিতামহ নবকুমার চৌধুরীর কন্যা পীতাম্বরী দেবীর সহিত কৃষ্ণনগরের রাজা গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হয়। ইছাপুর ও গৈপুরের মধ্যে যে খাল আছে, সেই খালের ধারে কৃষ্ণনগরাধিপতির কাছারি বাড়ী ছিল। আজও লোকে ফকির পাড়ার ঘাটকে কাছারি বাড়ীর ঘাট বলিয়া থাকে। এই কাছারির ম্যানেজার একদা নৌকাযোগে স্থানান্তরে যাইবার সময়ে যমুনানদীতে অবগাহমানা পীতাম্বরী দেবীর অলোকসামান্যারূপ মাধুরী দেখিয়া রাজরাণী হইবার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া নবকুমার চৌধুরীর নিকট মহারাজার সহিত বিবাহ সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন। পীতাম্বরী দেবীকে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ী লইয়া গিয়া তথায় উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। শুনা যায় তাঁহার করতল প্রকৃতিদত্ত অলক্তক রঞ্জিত ছিল এবং কথোপকথনের সময়ে সমাগত স্ত্রীলোকেরা মনে ভাবিতেন আমার সহিত স্বয়ং লক্ষ্মী কথা কহিতেছেন। উক্ত নবকুমার চৌধুরীর ঈশ্বরচন্দ্র ও বৈদ্যনাথ নামে দুই পুত্র ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র স্বর্গীয়

পরেশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এবং বৈদ্যনাথের পুত্র শ্রীযুক্ত সুরনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। এই চৌধুরী বংশের কালীপ্রসাদ চৌধুরীর কন্যার সহিত নলডাঙ্গার রাজা শশিভূষণ রায়ের বিবাহ হয়। ইনি নলডাঙ্গার বর্ত্তমান রাজা প্রমথভূষণ রায়ের পিতামহ এবং রাজা প্রমথভূষণ রায়ের সহিত রতন চৌধুরীর পৌত্রী শ্রীমতী পতিতপাবনী দেবীর বিবাহ হয়। এই চৌধুরী বংশের ভুবন চৌধুরীর ভগ্নী সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর সহিত ভূকৈলাসের স্বর্গীয় কুমার সত্যজীবন ঘোষালের বিবাহ হয়। এই সর্ব্বমঙ্গলা দেবী ইছাপুর মধ্য-বঙ্গ বিদ্যালয়ে আর্থিক সাহায্য দ্বারা ইহার উন্নতি করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ইছাপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের সম্মুখে একখানি প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে ঃ—

"ভূকৈলাসের স্বর্গীয় কুমার সত্যজীবন ঘোষালের সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী কর্ত্তৃক স্বীয় জন্মভূমির হিতার্থে প্রদত্ত হইল। ১২৮৯ সাল।"

ইছাপুরের বিখ্যাত বিগ্রহ গোবিন্দদেব প্রথমে কাহার দ্বারা খোদিত হইয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই, তৎপরে উক্ত প্রস্তর-বিগ্রহ ভঙ্গ হইলে মুলুকচাঁদ চৌধুরীর স্বপ্ন হয় যে "শিবনিবাসের রাজার বাড়ী যে প্রস্তর আছে সেই প্রস্তর আনাইয়া আমার মূর্ত্তি খোদাই কর," সেই স্বপ্ন অনুযায়ী তাঁহারা শিবনিবাসের রাজবাড়ী হইতে উক্ত প্রস্তর চুরি করিয়া আনিয়া গোবিন্দদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করান। প্রতি বৎসর দোলপূর্ণিমার পরদিবস এই গোবিন্দদেবের দোল হয় এবং সেই উপলক্ষে একটী বৃহতী মেলা হয়।

চুঁচড়ার প্রাণকৃষ্ণ হালদারের, এই ইছাপুরে নীলকণ্ঠ চৌধুরীর বাড়ীর এক কন্যা জগদম্বার সহিত বিবাহ হয়। উক্ত প্রাণকৃষ্ণ হালদার গোবিন্দদেবের গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। নোট জাল করা অপরাধে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা হয়। তাঁহার সুদৃশ্য বাড়ীতে এক্ষণে চুঁচড়ার কলেজ স্থাপিত আছে।

দেবী ঠাকুরুণ—ইছাপুরের সুদৃশ্য পৈতা, রন্ধনকার্য্য ও শিল্পীর জন্য বিখ্যাত। একদা প্রাণকৃষ্ণ হালদার শ্বশুরবাড়ী আসিলে দেবী ঠাকুরুণ পঞ্চবর্ণের গুঁড়ির দ্বারা এমন আসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে প্রাণকৃষ্ণ হালদার উহা প্রকৃত আসন বলিয়া বসিয়াছিলেন, এবং হলকসা (দ্রোণ জাতীয়) পুষ্প দ্বারা এমন অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যে তিনি উহা প্রকৃত অন্ন বলিয়া আহার করিতে উদ্যত

হইলে, দেবী ঠাকুরুণের হস্তস্থিত পাখার বাতাসের দ্বারা ফুল সকল উড়াইয়া দিলে, সমাগত স্ত্রীলোকগণ হাসিয়া উঠিলে তিনি নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এবং দেবী ঠাকুরুণের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশেষ পারিতোষিক দিয়াছিলেন। এই দেবী ঠাকুরুণ পৈতা বিক্রয় করিয়া দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। দেবী ঠাকুরুণ যমুনার ঘাটে স্নান করিবার জন্য জাঙ্গাল বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন, আজও লোকে সেই জাঙ্গালকে "দেবী ঠাকুরুণের জাঙ্গাল" বলিয়া থাকে। এই "কুশদহ" লেখক কর্ত্তৃক এডুকেশন গেজেটে "দেবী ঠাকুরুণের জীবনী" লিখিত হইয়াছিল।

যেখানে মল্লিকপুরের ঘাট সেই স্থানে যমুনার দক্ষিণ পারে "গুহ" উপাধিধারী একজন জমীদার বাস করিতেন। তাঁহার বাস্তু ভিটায় অনেকে টাকা পড়িয়া পাইয়াছেন শুনা যায়।

ইছাপুরে এক সময়ে এত বসতি ছিল, যে স্থানান্তর হইতে একটী ভদ্র লোক ইছাপুরে বাস করিতে ইচ্ছুক হইয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু এমন একটু স্থান পান নাই যে তথায় বাস করেন। যে মহামারী গদখালী, শ্রীনগর, দেবগ্রাম, উলা (বীরনগর) প্রভৃতি গ্রাম ধ্বংস করিয়াছিল, সেই মহামারী ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে কুশদহে প্রবেশ করিয়া ইছাপুরকে জনশূন্য করে। ইছাপুরের যাহা কিছু ছিল তাহা মাননীয় সুরনাথ চৌধুরী মহাশয় ইছাপুর পরিত্যাগ করায় অন্তর্হিত হইয়াছে। এক্ষণে ইছাপুর জনশূন্য জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং দিবাভাগে—"ফেরু পাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর।" জ্বরে, ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে। স্থানীয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘোষ দরিদ্র ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত রোগীদিগকে ঔষধ বিতরণ দ্বারা কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষা করিতেছেন।

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব "প্রভা" সম্পাদক।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি। (২)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শত বৎসরের মধ্যে রোগ-বিজ্ঞানেরও কত উন্নতি হইয়াছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। পুরাকালে উন্মাদ্ রোগের কোন চিকিৎসাই ছিল না।

তখন উন্মাদ্ রোগীকে দুর্গন্ধময় অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ করিয়া ঔষধের পরিবর্ত্তে প্রহার ব্যবস্থা করা হইত। স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্করোগ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে বর্ত্তমান সময়ে উন্মাদাগারের এবং উন্মাদ্ রোগীর চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ফুস্‌ফুস্ রোগ ও হৃদ্‌রোগ তখন নির্ব্বাচিত হইত না। এখন পরিদর্শন, সংস্পর্শন, মেন্‌সুরেশন্, পার্কশন্ এবং অস্কল্টেশন্ প্রভৃতি উপায়ে ঐ সকল রোগ আমরা অনায়াসে পরীক্ষা করিতেছি। ষ্টেথেস্ কোপ্ নামক যন্ত্রের সাহায্যে জরায়ুমধ্যস্থ শিশু-হৃদয়ের টিক্ টিক্ শব্দ অথবা ক্ষুদ্র শ্বাসনালী মধ্যস্থ সঞ্চিত শ্লেষ্মার বুড়্ বুড়্ শব্দ শ্রবণ এখন সহজসাধ্য হইয়াছে। পূর্ব্বকালে শোথ একটি স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া গণ্য হইত। এখন শোথকে স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া স্বীকার করা হয় না। তখন শোথের একই প্রকার চিকিৎসা ছিল, অধুনা মূল কারণ নির্দ্ধারিত করিয়া তদনুসারে ইহার চিকিৎসা করা হয়। তখন প্রস্রাবের বহুবিধ পীড়া নির্ণয় করা বাতুলের কল্পনা বলিয়া বোধ হইত। ব্রাইটাময় (Bright's disease) নামক পীড়া ১৮২৭ সালে ডাক্তার রিচার্ড ব্রাইট কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন রাসায়নিক এবং অণুবীক্ষণিক পরীক্ষার সাহায্যে সর্ব্বপ্রকার প্রস্রাবের পীড়াই নির্ব্বাচিত হইতেছে। পূর্ব্বকালে কোষ্ঠবদ্ধ ও অন্ত্রাবরোধ (Obstruction of bowels) নামক রোগে অনেক চিকিৎসক অর্দ্ধ সের বা আরো অধিক মাত্রায় রোগীকে পারদ সেবন করাইতেন। তাঁহারা মনে করিতেন পারদের ভার দ্বারা মল নিঃসৃত ও অন্ত্রমুক্ত হইবে। এক্ষণে এইরূপ কুসংস্কার পূর্ণ চিকিৎসা পরিত্যক্ত হইয়াছে। তৎকালে আমাশয় রোগের কিরূপ চিকিৎসা হইত তাহা ডাক্তার গুডিভ সাহেবের লিখিত "প্রাচ্য ভূখণ্ডে পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রসার" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। তিনি বলেন, "তখন আমাশয় রোগে রোগীর বল রক্ষা করা অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া চিকিৎসকেরা মদ্য ও মাংস উপযুক্ত পথ্যরূপে ব্যবস্থা করিতেন। রোগীকে ইচ্ছামত কালিয়া, পোলাও, ব্রাণ্ডি এবং প্রচুর পাকা ফল খাইতে বলা হইত।"

ভৈষজ্যবিদ্যার উন্নতির কথা ভাবিলেও অবাক্ হইতে হয়। দিন দিন কত নূতন নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। ঔষধের আকার প্রকারেরও, অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রোগ, পাত্র ও প্রয়োজন ভেদে

অনেক নূতন প্রয়োগপ্রণালীও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রোগী ঔষধ সেবনে অক্ষম হইলে চর্ম্মভেদ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ, মর্দ্দন, শ্বাসদ্বারা ঔষধদ্রব্য কণ্ঠনালী এবং ফুস্‌ফুসের অন্তর্গতকরণ প্রভৃতি বিবিধ উপায় অবলম্বন করা যায়। যদবধি ভিয়ানানগর নিবাসী ডাক্তার কোলার, কোকেইন্ আবিষ্কার করিয়াছেন, তদবধি চক্ষুরোগ চিকিৎসার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এণ্টিপাইরিণ্, ফিনাসিটিন্ প্রভৃতি আবিষ্কারের পর হইতে অল্প সময়ের মধ্যে জ্বর হ্রাস করা অনেকটা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত ঔষধ যে প্রকারে আবিষ্কার হইয়াছিল তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, এক সময়ে কতকগুলি নির্ব্বোধ লোক দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিস্ পর্ব্বত শ্রেণীর পূর্ব্ব অঞ্চলে পিরু, বলিভিয়া ও কলম্বিয়া প্রভৃতি প্রদেশজাত মহামূল্য সিঙ্কোনাবৃক্ষ সকল কর্ত্তন করিয়া অর্থলোভে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে কিন্তু তাহারা নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত ঐ বৃক্ষ রোপণ করিত না। ইহাতে কুইনাইন অত্যন্ত দুর্মূল্য হইয়া উঠিল এবং অনেক মহাত্মা নানাপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্রস্তুত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই চেষ্টার ফলে কেহ এণ্টিপাইরিণ্, কেহ ফিনাসিটিন্ কেহ বা সেলিসিলিক্ এসিড্ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন।

বীজতত্ত্বের (Bacteriology) উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অদৃশ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণুই ওলাউঠা, যক্ষা, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগের কারণ তাহা আমরা জানিয়াছি। আজ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ সকল অদৃশ্য সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম জীবাণু আমরা পরিষ্কাররূপে চক্ষে দেখিতেছি। ধন্য বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান! (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, (ডাক্তার)
গোবরডাঙ্গা।

হিমালয় ভ্রমণ। (৫)

হরিদ্বার-কঙ্খল।

হরিদ্বার ষ্টেশন হইতে এক্কাগাড়ি করিয়া এক মাইল দক্ষিণে কঙ্খল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে আসিলাম। তখন বেলা ৭-৩০ হইবে। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী

কল্যাণানন্দের নিকট আমি ২।১ দিনের জন্য এই স্থানে কেবল আশ্রয় পাইতে পারি কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "এস্থান রোগীদিগের জন্য আছে, কখন রোগী আসিবে তাহার স্থিরতা নাই, রোগী না আসিবার সময় পর্য্যন্ত থাকিতে পারেন।" বোধ হয় দুইটী ঘর একেবারে খালি ছিল, আমি তাহার একটীতে রহিলাম। ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটী বড় হল্ ঘরে পরমহংসদেবের এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। বোধ হইল এই ঘরে নির্জ্জন সাধন-ভজনাদি লইয়া থাকে। তারপর আর একটী ঘরে ডিস্‌পেন্সেরী, একটী ঘর ডাক্তার বাবুদের জন্য, আর একটী ঘরে স্বামী কল্যাণানন্দ থাকেন। এই ঘরগুলি একশ্রেণীতে একটী একতালা এমারৎবাড়ী বিশেষ, সমস্ত ঘরের সম্মুখে টানা বারাণ্ডা। ইহার একটু দূরে আর একটী একতালা দুইটী ঘর, তাহাতে সাধারণ রোগীসকল থাকে। এতদ্ব্যতীত পাকা পায়খানা, কাঁচা বড় বড় ২ খানি ঘরের একখানা রশুই ও আহারের জন্য আর একখানিতে মহিষ, গরু থাকে। আশ্রমের মধ্যস্থলে একটা বড় পাকা ইঁদারা আছে। এক বিস্তৃত চতুর্ব্বেষ্টিত ময়দানের মধ্যে এই আশ্রম।

আমি এখানে থাকিয়া ছত্রে মাধুকরী করিয়া আহার করিতে লাগিলাম। ক্রমে ডাক্তার বাবু, কম্পাউণ্ডার যুবক ব্রহ্মচারী তিনকড়ি মহারাজ এবং কল্যাণ স্বামীর সহিত আমার আলাপ হইল, তাঁহারা আমার গান শুনিলেন। ছত্রে যেরূপ রুটী ও দাউল ভিক্ষা পাওয়া যায় তাহাতে আমার মনে হইল, প্রত্যহ একবার আহারই যথেষ্ট, ইহাতে শরীরও ভাল থাকিবে এবং সাধন ভজনের পক্ষে একটু অল্পাহারই সুবিধা হইবে, কিন্তু রাত্রে আশ্রমে আহারের সময় আমাকে ডাকিয়া সকলে যত্ন করিতে লাগিলেন, সুতরাং আমি রাত্রে অতি অল্প পরিমাণে আহার করিলাম। এইরূপে একবেলা ছত্রে ও একবেলা আশ্রমে আহার করিতে লাগিলাম।

এখানে এখন অল্প অল্প শীতবোধ হইয়াছিল। আমার নিকট একখানি রঙ্গিণ কম্বল ও একখানি গরম গায়ের কাপড় ছিল, তাহাতেই চলিতে লাগিল। আমার ঘরে একখানি খাটিয়া ছিল, তাহাতে শয়ন করিতাম। ভোর ৪টার সময় উঠিয়া অন্যান্য কাজ সারিয়া উপাসনা, প্রার্থনায় ও ধ্যান-ধারণায় প্রবৃত্ত হইতাম। প্রথম দিনের বিষয় ডায়েরীতে এইটুকু লেখাছিল, "এখানে থাকিবার এবং আহারের

ভাবনা নাই, এখানে কিছুদিন থাকিয়া সাধন ভজন করিবার পক্ষে বেশ অনুকূল। আজকার ধ্যানে অন্তরে বড়ই সুন্দর ভাবের উদয় হইয়াছিল, ধর্ম্ম জীবনের যেন একটা নূতন পথের আলোক পড়িল, নবজীবনের আভাস পাইয়া প্রাণ ভক্তি-বিগলিত হইল, তখন স্বতঃই এই প্রার্থনা হইল, হে মাতঃ! তুমিই সকলের মূলাধার, তোমার একি করুণা, ব্যাকুলতা দাও আরও ব্যাকুলতা দাও।"

৫ই কার্ত্তিক সোমবার। কয়েকখানা পত্র লিখিলাম, তাহার মধ্যে খুলনায় স্ত্রীকে একখানা। ৬ই এইসকল নামে পত্র লিখিলাম, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, উপেন্দ্র ও বিনয়কে। ৭ই বুধবার ত্রৈলোক্য এবং জনার্দ্দনকে পত্র লিখিলাম। অর্থাৎ প্রাণের যতই উচ্ছাস হইতে লাগিল, ততই আত্মীয় অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবগণকে সেই ভাবের আভাস না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আজকার ধ্যানে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব—ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যাত ব্রহ্মবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি হইতে লাগিল। প্রাণে আনন্দ ও ভক্তি, কৃতজ্ঞতার ভাব খেলিতে লাগিল।

হরিদ্বার পৌঁছিবার পূর্ব্বে ট্রেণে একটী পরমহংসের সহিত অল্প আলাপ হইয়াছিল, আজ হটাৎ তাঁহার সঙ্গে বাজারে দেখা হইল। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া "ঘণ্টাকুটীরে" লইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ অন্যান্য বিষয়ে আলাপের পর ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে বলিয়াছিলেন "স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ বেদান্ত প্রচারে বর্ত্তমান পরমহংস সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তনের ভাব আসিয়াছে, অনেকের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে।" আমাকে তাঁহার স্বরচিত একখানি হিন্দী গ্রন্থের ম্যানাস্ক্রিপট্ হইতে কিছু পড়িয়া শুনাইলেন। অবশেষে আমাকে বলিলেন, "আপনি এই আশ্রমে আসিয়া থাকুন।" তাহাতে আমি বলিলাম, আমি আপনাদের মত দশনামী, (গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি) কোন শ্রেণীর সাধু নহি, আমি বাঙ্গালী ব্রহ্মজ্ঞানী পন্থী, সুতরাং আমার এখানে থাকিবার কি সুবিধা হইবে? আশ্রমের মহান্ত মহারাজ আসিলে (সে সময় তিনি অন্যত্র গিয়াছিলেন) তাঁহার সহিত আমার মত ও ভাবের মিল না হইলে যদি তিনি নারাজ হন্? তাহাতে রামানন্দ স্বামী (সাধুর নাম রামানন্দ স্বামী) বলিলেন, (আমাদের সকল কথাই হিন্দী ভাষায় হইয়াছিল,

কেন না তিনি হিন্দুস্থানী সাধু) "আপনার কোন চিন্তা নাই, মহান্ত মহারাজ বিদ্বান ব্যক্তি। এই পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তার পর সে দিন আমি ঘণ্টাকুটীর হইতে চলিয়া আসিলাম।

প্রথম দিন হইতেই গঙ্গায় স্নান করিয়া এবং গঙ্গা দেখিয়া আমার যে কি আনন্দ হইয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে পারি না। গঙ্গার গভীরতা অধিক নহে কিন্তু বিস্তৃতি অনেক। নানা প্রকারের ছোট বড় গোলাকার প্রস্তররাশির উপর দিয়া, সুনির্ম্মল সুশীতল সলিল ধারা প্রবাহিতা। এমন স্বচ্ছ, নির্ম্মল, ও সুশীতল জলরাশি আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। দূরে পর্ব্বতমালা; ঐ গিরিরাজ নিঃসৃতা গঙ্গা বহু বিস্তৃত, এইরূপ কতদূর ইহার বিস্তৃতির সীমা তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। যাহা হউক "গোমুখী" "ঋষিকেশ" "লছমনঝুলা"র কথা পরে বলিব। এক্ষণে স্নান করিয়া অতিশয় আরাম বোধ করিলাম। তৎপরে ৯॥০।১০ টার মধ্যে ছত্রে (মাধুকরী) ভিক্ষা করিতে হইত। এখানে এখন ৬টী ছত্র খোলা আছে, প্রত্যেক ছত্র হইতে দুইখানি করিয়া বড় বড় রুটি ও কিছু দাউল প্রদত্ত হয়। যে কোন পন্থীর সাধু হউন,—দেখিলাম, সাধু বেশধারী মাত্রকেই ভিক্ষা দেওয়া হয়, সাধুর সংখ্যা যতই হউক কেহ বিমুখ হন্ না। আমি একটি গেরুয়া বস্ত্র-খণ্ডের ঝুলি করিয়া তাহাতে রুটি ও বাটুয়া ঘটীতে দাউল লইতে লাগিলাম।

প্রথম দিনেই দুইটী বাঙ্গালী পরমহংস সাধুর সহিত (এখানে প্রায় সকল সাধুই পরমহংস, অল্পই ২।৪ জন দণ্ডী ও ব্রহ্মচারী দেখা যায়) আমার আলাপ হয়, আমি এখানে কিছুদিন থাকিতে ইচ্ছা করি, শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, "কোন আশ্রমে বা মঠে থাকিতে গেলে কিছু না কিছু তথাকার অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, এজন্য সাধারণতঃ ছত্রে মাধুকরী করিয়া সুবিধা মত কোন স্থানে আসন করিয়া থাকাই ভাল, বিশেষতঃ আপনার পক্ষে। আপনি আমাদের সঙ্গে গিয়া ছত্র সকল দেখিয়া লইবেন, এবং থাকিতে থাকিতে সকলই অভ্যাস হইয়া যাইবে।" এইরূপে তাঁহারা অনেক সৎকথা বলিয়া আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। আমিও তাঁহাদের কথাই ঠিক মনে করিয়া,প্রথম দিন হইতেই মাধুকরী করিতে লাগিলাম। প্রথমে ২।১ দিন আমাকে ভিক্ষা গ্রহণে অনভ্যস্তের ন্যায় দেখিয়া ছত্রের জনৈক পাচক বলিয়াছিল "মহারাজ নয়া সাধু হায়।"

আমি সকল ছত্রে যাইতাম না, কেন না তত আহার্য্য আমার আবশ্যক হইত না, ৩।৪টী ছত্রে গেলেই আমার যথেষ্ট হইত। আমি মাধুকরী লব্ধ ভিক্ষা-অন্ন লইয়া গঙ্গাতীরের কোন ঠাকুর বাড়ী—এখানে অনেক ঠাকুর বাড়ীও আছে তথায় থাকা যায় কিন্তু এরূপ স্থানে শুনিলাম চোরে ও বাঁদরে কিছু বিরক্ত করে, যাহা হউক আমি প্রত্যহ একটী স্থানে বসিয়া আহার করিতাম, ইতিমধ্যেও বাঁদরদের প্রতি উপেক্ষা করা চলিত না, একটু অন্যমনস্ক দেখিলেই, এমন ভাবে সম্মুখের রুটী আত্মসাৎ করিত যে, মানুষকেও বাঁদরের নিকট নির্ব্বোধের ন্যায় হইতে হইত। সুতরাং আমি তাহাদিগকে রুটীর মোটা মোটা ধারগুলি দিতাম। তৎপরে গঙ্গায় অসংখ্য মৎস্য দেখা যাইত, সমস্ত মাছই রোহিত মৎস্যের ন্যায়, কেবল লম্বা কিছু বেশী। তাহাদেরও অবশিষ্ট একটু আধটু রুটী দিয়া ঝুলি ও লোটা পরিষ্কার এবং জলপান করিয়া কিছুক্ষণ তথায় বিশ্রাম করিতাম। ক্রমে একটী ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ ও সদ্ভাব হইয়া গেল, সে প্রায়ই ঐখানে অপনার সরঞ্জাম লইয়া খাটীয়া ব্রাহ্মণের ব্যবসা করিত। স্ত্রীলোকেরা স্নান করিয়া তাহার নিকট ঠাকুরজল ও প্রসাদ লইয়া সময় সময় এক আধ পয়সা কিম্বা একমুষ্টি আতপচাউল দিত। কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে বলিয়াছিলাম, আমি সন্ন্যাসী সাধু নহি, বাঙ্গালী গৃহী, আমি যদি এখানে সপরিবারে বাস করি, তাহার জন্য ঘর বাড়ী পাওয়া যায় কি না? তাহাতে সে বলিয়াছিল, "আমার মা আছেন, আমার বাড়ীতে আপনাকে ঘর দিতে প্যারি, অথবা এখানে মাসিক ।৶০ আনা বা ৷৷০ আনা ভাড়া দিলে দুই একটা ঘর যুক্ত বাড়ী পাইবেন।

এইদিন অপরাহ্নে আমি ঘণ্টাকুটীরে, থাকিবার জন্য আসিলাম। আসিবার পূর্ব্বে কল্যাণস্বামীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন, "ঘণ্টাকুটীর গঙ্গারধারে বেশ নির্জ্জনস্থান, মন্দ কি, দেখুন না সেখানে কেমন লাগে।" কল্যাণস্বামীর বয়স অনুমান ৩৫ পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে হইবে, একহারা দেহখানি অথচ দৃঢ় কর্ম্মঠ; কুমার-সন্ন্যাসী অত্যন্ত অল্পভাষী, দেখিলে যেন ভয় হয় কিন্তু দাড়িম্ব ফলের অবরণ মধ্যে যেমন মিষ্টরস, তাঁহার স্বভাবও তদ্রূপ। কল্যাণানন্দ স্বামীর কথা আমার নিয়ত মনে আছে।

ঘণ্টাকুটীরে আমাকে একটী স্বতন্ত্র ছোট ঘর ও একখানি খাটীয়া দিয়া, রামানন্দ স্বামী বলিলেন, "আপনি বাঙ্গালী সাধু, কষ্ট করিয়া ছত্রে মাধুকরী

কেন করিবেন, এই আশ্রমেই দুইবেলা ভোজন করিবেন। এই আশ্রমের স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠাতা এমন আয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে সেই অর্থে এই আশ্রমের সাধুসেবার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।" আমি তাহাতে অমত প্রকাশ করিলাম না। এই আশ্রমের মধ্যস্থলে একটী ছোট মন্দিরের ন্যায় ঘরে প্রতিষ্ঠাতার প্রতিমূর্ত্তি আছে, এবং ঐ ঘরের উপরের চূড়ার নিম্নে একটি বৃহৎ ঘণ্টা বাঁধা আছে—বোধ হয় এইজন্য আশ্রমের নাম "ঘণ্টাকুটীর"। যাহা হউক, শুনিলাম, ভোজনের পূর্ব্বে ঐ ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া যত সাধু শান্ত উপস্থিত হইবেন সকলেই ভোজন করিতে পাইবেন, ইহাই প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে বাহিরের সাধু শান্ত উপস্থিত হইতে দেখিলাম না, কেবল যাঁহারা সময় সময় আশ্রমে থাকেন, তাঁহারাই উপস্থিত হইলেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গী হইলাম।

ঘণ্টাকুটীরে প্রথম রাত্রি শেষে অর্থাৎ ৯ই কার্ত্তিকের প্রত্যুষের ধ্যানে প্রাণে এমন একটি পবিত্রতার জ্যোতি প্রকাশিত হইল যে, তখন মনে হইল, অপবিত্রতা তো কিছুতেই নাই, জগতময় সকলই পবিত্র। তার পর ভাবিলাম, মানব মনে কতই লজ্জা, সঙ্কোচের কারণ উপস্থিত হয়, উহা মনের বিকার মাত্র, এই যে মানব শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গসকল, ইহার মধ্যে কোনটীই ত অপবিত্র বা অনাবশ্যকীয় নহে, ইহার অঙ্গবিশেষের মূলভাবে লজ্জাস্করই বা কেন? সকলই ত মহাকার্য্য সাধক যন্ত্রমাত্র —স্ত্রী জাতির স্তন, লজ্জাস্কর অঙ্গ জন্য আবৃত থাকে, আহা! স্তন কি পবিত্র আধার; মাতৃস্নেহ—মাতার বক্ষের রক্ত, ক্ষিরধারে জীবপ্রবাহ-রক্ষা-কারিণী-শক্তি, দুগ্ধরূপে ঐ আধারে প্রবাহিতা; এই স্তনের পবিত্রতার বিষয় ধ্যান করিতে করিতে নিষ্পাপ অন্তঃকরণে—বালকের ন্যায় বিচরণ করাইতো স্বাভাবিক।

(ক্রমশঃ)

গ্রিপডাম্বেল (Grip dumb-bell.)।

আমার ধারণা, যাঁহারা গ্রিপডাম্বেল একসার্সাইজ করিয়া অপরিমিত দৈহিক বলসঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল পথ অবলম্বন করিয়াছেন। গ্রিপডাম্বেল একসার্সাইজ করিয়া কেহ কোথাও অসাধারণ শক্তিশালী হইতে পারিয়াছেন কিনা, সে বিষয়ে আমার মনে ঘোর সন্দেহ আছে। যদি বলেন, গ্রিপডাম্বেল একসার্সাইজ করিয়াই তো পাশ্চাত্য সমাজের মিঃ ইউজেন স্যাণ্ডো (Mr. Eugen Sandow) আজ জগত মধ্যে শক্তিশালী পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু প্রকৃতই কি তাই? গ্রিপডাম্বেলই কি মিঃ স্যাণ্ডোকে শক্তিশালী করিয়াছে? সত্য বটে, তাঁহার Body Building পুস্তকের একস্থানে দেখিতে পাই, "It is not my own powers of weight lifting that I wish anyone to emulate, But that it is the practice of light and gradual exercise that I have obtained my great strength," অর্থাৎ ওয়েটলিফ্‌টিং (ভার তেলা) দ্বারা আমি শক্তিশালা হই নাই, লঘু ও ক্রমিক পরিশ্রমই আমাকে শক্তিশালী করিয়াছে। পাঠকগণ ইহাতেই আত্মহারা হইবেন না। তিনি প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁহার Physical Culture নামক পুস্তকের ১৩৭ পৃষ্ঠায় আবার কি বলিতেছেন দেখুন, "When I was a young man I was a mere stripling, and thought to strengthen my frame by a little exercise like a wooden wand or a light iron bar; it loosened my muscles and made them pliant, but no great amount of development came from the exercise. This set me thinking. So I began to increase my weight and found that I could easily put up a 100lb. dumb-bell."

অর্থাৎ কাষ্ঠদণ্ড কিম্বা হাল্‌কি লৌহদণ্ডের একসার্সাইজ দ্বারা আমার শরীর দৃঢ় করিতে যাইয়া দেখি তাহাতে মাংসপেশী ঢিলা ও নরম হইয়া যাইতে লাগিল; অপিচ সেরূপ পুষ্টিও অনুভব করিতে পারিলাম না। ইহাতে চিন্তিত হইলাম এবং আরও ভার বাড়াইয়া দিলাম; তখন দেখিলাম যে আমি সহজেই ১০০

পাউণ্ড (প্রায় ১ মণ দশসের) ডাম্বেল লইয়া একসার্সাইজ করিতে পারি। আবার ঐ পুস্তকের ১৪২ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, "The dumb-bell and the barbell have been my chief means of physical training," অর্থাৎ ডাম্বেল ও বারবেল আমার শরীর গঠনের প্রধান অবলম্বন। এক্ষণে দেখুন, মিঃ স্যাণ্ডো তাঁহার দুই পুস্তকে দুই প্রকার উক্তি করিয়াছেন। ইহাতে আমরা বুঝিব না কি যে, শক্তিশালী হইবার প্রকৃত উপায় চাপিয়া রাখিয়া সাধারণ লোকে যাহাতে শক্তিলাভের আশায় অপ্রকৃত উপায় আশ্রয় করিয়া মিছামিছি কালক্ষেপ করে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা? অথবা এবংবিধ উক্তিদ্বয়ের কারণ পাঠকগণই বিচার করুন। তিনি কখন ওয়েটলিফ্‌টিং-এর নিন্দা করিয়া লাইট একসার্সাইজকে তাঁহার শক্তি সঞ্চয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, আবার কখন লাইট একসার্সাইজের নিন্দা করিয়া ভারী ডাম্বেল ও বারবেল একসার্সাইজকে তাঁহার শরীর গঠনের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। আপনারা এক্ষণে মিঃ স্যাণ্ডোর কোন্ উক্তির অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিবেন—প্রথম বা দ্বিতীয়? আমি অনেকদিন হইতে ঐ পথের পথিক; সে কারণ আমার মতে গ্রিপডাম্বেল অথবা লাইট একসার্সাইজ মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, চাকুরিজীবি কিম্বা অল্পবয়স্ক বালকগণের পক্ষে এবং ওয়েটলিফ্‌টিং একসার্সাইজ শিক্ষার্থীর প্রথম অবস্থায় হস্ত, পদ, বক্ষঃস্থল কিয়ৎ পরিমাণে দৃঢ় করিবার পক্ষে যে উপকারী সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তবে অপরিমিত বলশালী হইবার আশায় বহুকাল ধরিয়া উক্ত একসার্সাইজের সেবা করিলে পরিণামে যে সে আশায় জলাঞ্জলি দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না তাহা সুনিশ্চিত। নিজে নিজে শারীরিক বলবৃদ্ধির যদি কোন উপায় থাকে তবে সে ওয়েটলিফ্‌টিং একসার্সাইজের অভ্যাস। পাঠকগণের মধ্যে অনেকে বোধ হয় অবগত আছেন যে, পূর্ব্বে আমাদের দেশেও মালকাঠ তোলা নামক এই শ্রেণীর একরূপ একসার্সাইজের প্রচলন ছিল। তখন স্নান করিবার ঘাটে ছোট বড় নানাবিধ ওজনের মালকাঠ পড়িয়া থাকিত এবং প্রায় প্রত্যেক স্নানার্থীই জলে নামিবার পূর্ব্বে দু'একবার করিয়া সেগুলিকে তুলিত অথবা তুলিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু ইদানীং আর উহার প্রচলন বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না; এক্ষণে উহার পরিবর্ত্তে ওয়েটলিফ্‌টিংএর আবির্ভাব

হইয়াছে বলা যাইতে পারে। বারান্তরে এই ওয়েটালফ্টিং সম্বন্ধে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীবিভাকর আশ।

ন্যাশন্যাল লক্ ফ্যাক্টরী।

কলিকাতা শ্যামবাজার ২০৬।৪, অপারসারকুলার রোডস্থ "ন্যাশন্যাল লক্ফ্যাক্টরীর" প্রস্তুত অনেক প্রকার পিত্তলের চাবিতালা ও কল, এবং লোহার গ্যালবানাইজ তালা দেখিয়া আমরা সন্তোষলাভ করিলাম। চাবিগুলি দেখিতে বিলাতী অপেক্ষা মন্দ বোধহয় না, অথচ মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। হুইলিং, ডিটেক্টর, কিক্যাচার নামক তালাগুলির ভিন্ন ভিন্ন গুপ্ত কৌশল চমৎকার জনক। (কুশদহের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে ন্যাশন্যাল লক্ফ্যাক্টরী দ্রষ্টব্য)

এই কারখানার স্বত্বাধিকারী "আশ পাল এণ্ড কো"র অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ খগেন্দ্রনাথ আশ কুশদহ নিবাসী ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহারা কুশদহস্থ সকলের নিকট এই দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে সহানুভূতি পাইবার যোগ্য।

স্থানীয় সংবাদ।

আরোগ্য সংবাদ। গোবরডাঙ্গা-নিবাসী সুবিখ্যাত প্রবীন বিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংসা অতিশয় পীড়ার সংবাদ শুনিয়া আমরা বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলাম। ঈশ্বরকৃপায় এক্ষণে তিনি যে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন তাহাতে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। কেশব বাবু যে আমাদের দেশের বহুদর্শী, বিচক্ষণ চিকিৎসক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; আমরা ভগবানের নিকট কামনা করি, তিনি আরো দীর্ঘকাল ইহলোকে বিদ্যমান থাকিয়া শেষজীবনের কর্ত্তব্যসকল সুচারুরূপে সম্পন্ন করুন।

Printed by J. N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

দ্বিতীয় বর্ষ] চৈত্র, ১৩১৬ । [৬ষ্ঠ সংখ্যা ।



গাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়

সম্বলিত, ধর্ম্ম, সমাজ ও

বিবিধ বিষয়ক

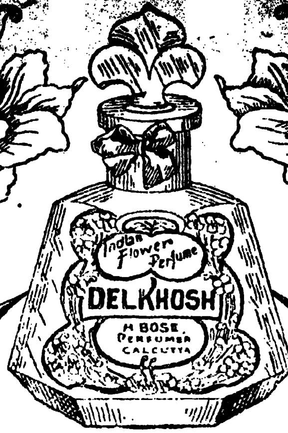
মাসিক পত্র ও সমালোচন ।

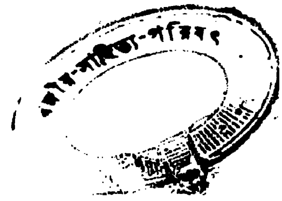
দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত ।

কুশদহ-কার্য্যালয়

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা ।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১।০ মাত্র । এই সংখ্যার নগদ মূল্য /১০ পয়সা ।


India
Flower Perfume
DELKHOSH
H BOSE,
PERFUMER
CALCUTTA



গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় বর্ষ "কুশদহ" ১ম সংখ্যা কার্ত্তিক মাস হইতে ৬ষ্ঠ সংখ্যা চৈত্র মাস পর্য্যন্ত গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইল। আমরা মফঃস্বলের কাগজ যথাসাধ্য সতর্কতা ও যত্নের সহিত ডাকে পাঠাইয়া থাকি, তবুও যদি কেহ কোন সংখ্যা না পাইয়া থাকেন, পত্রদ্বারা জানাইলে এখনও তাহা পুনরায় পাঠাইতে পারিব, কিন্তু ৩০শে বৈশাখের পর আর আমরা দায়ী রহিলাম না। তৎপরে অগ্রিম চাঁদা না পাইয়াও এপর্য্যন্ত যাঁহাদের কাগজ পাঠাইতেছি, তাঁহারা যেন চাঁদা পাঠাইতে আর বিলম্ব না করেন, ইতি মধ্যে যাঁহাদের মণিঅর্ডার না পাইব, তাঁহাদের নামে ভিঃপিতে কাগজ পাঠাইব, কিন্তু ভিঃপি ফেরত দিয়া যেন আমাদিগকে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। (কুঃ সঃ)

২য় বর্ষ।] চৈত্র, ১৩১৬। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সঙ্গীত।

মূলতান—একতালা।

যখন ভেবে চিন্তে দেখি, (দেখি) আমার বল্‌তে আমার তোমা বিনা আর কেউ নাই।
যত মহামূল্য ধন, প্রাণ প্রিয়জন, তোমারে হারালে সব হারাই।
তৃষিত হৃদয় কাতর হইয়ে, দাঁড়ায় কোথায় বল তোমারে ছাড়িয়ে, আপনার বলে, তুলে নিতে কোলে, তোমা বিনে আর কারেও না পাই।
(প্রভু) ইহলোক তুমি, পরলোক তুমি, চির বাসস্থান চির জন্মভূমি, (যত) আত্মীয় স্বজন, হারান রতন, একাধারে প্রভু তোমাতে পাই; তুমি সুখ শান্তি শোকার্ত্তের সান্তনা, তুমি চিন্তামণি ভবের ভাবনা, নিরাশের আশা, তুমি ভালবাসা, তোমাতেই মোরা প্রাণ জুড়াই।

বর্ষশেষে প্রার্থনা।

কি শুভক্ষণেই "লালাবাবু" শুনেছিলেন, "বেলা গেল বাসনায় আগুণ দাও," সকলেই তো দেখে, বেলাগেল, দিনগেল, এবং বর্ষগেল, কিন্তু ঐরূপ "বেলা গেল"র ভাব কয়জনের মনে উদিত হয়? কয়জনে ভাবে, দিনে দিনে জীবনের দিন ফুরাইল, কিন্তু এ জীবনে কি করিলাম, কেন এ জগতে এসেছিলাম কে আমাকে পাঠাইয়াছিলেন এবং কিজন্যই বা পাঠাইয়াছিলেন। আবার যাঁহারা জীবন-পথে জাগিয়াছেন, জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, মানবজীবনের মহৎ উদ্দেশ্য যাঁহারা কিছু বুঝিয়াছেন, ঐরূপ শ্রেণীর জনৈক মহাত্মা বলিয়াছিলেন,—

"স্বদেশীয় লোকের মন বিদ্যা দ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান ও অধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষা পূর্ব্বক সত্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্যজাতি সমূহের মধ্যে গণ্য জাতি হইবে, এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করেন তিনি কি আনন্দিত থাকেন।" শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

জ্ঞানীর নিকট বর্ষশেষ নাই, কেন না, জ্ঞানীব্যক্তি আনন্দময়; আনন্দ, অক্ষয় পদার্থ, সুতরাং আনন্দে অবস্থিত ব্যক্তি অনন্তজীবনে সঞ্জীবিত, তাঁহার নিকট কালের ব্যবধান চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অজ্ঞানীর পদে পদে দুঃখ, অজ্ঞানতাই সকল দুঃখের কারণ। যে অজ্ঞানতায় পড়িয়া আছে, তাহার নিকট দিন, মাস, বর্ষশেষ হইতেছে আর একমাত্র অখণ্ড-কাল ইঙ্গিতে বলিতেছে, "ঐ দেখ, এখনও তোমার বৃথা জীবন যাইতেছে—এখনও তুমি অনন্তজীবনে প্রবেশ করিতে পার নাই।" জীবন আর সময় একই বিষয়, সময় নষ্ট করা আর জীবন নষ্ট করা একই কথা। তাই উপনিষদ্ বলিতেছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"

হে জীব সকল! উত্থান কর, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও,

পরস্ত্রীকে মাননীয়া সৌভাগ্যবতী ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিবেক।

২৭। যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥

মনুঃ ২।১২৭

পিতামাতা ইহলোকে সন্তানের জন্য যাদৃশ ক্লেশ সহ্য করেন; পুত্র শতবর্ষেও তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না।

২৮। সন্তোষম্পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ ॥

মনুঃ ৪।১২

সুখার্থী সংযত ব্যক্তি পরম সন্তোষলাভ করেন; কারণ সন্তোষই সুখের মূল, অসন্তোষই দুঃখের কারণ।

২৯। সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥

মনুঃ ৪।১৬০

যাহা কিছু পরাধীন তাহা দুঃখের কারণ, আত্মবশ সকলই সুখের কারণ; সংক্ষেপে সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিবেক।

৩০। একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানো হি পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি ॥

মনুঃ ৪।১৫৮

প্রতিদিন একাকী নির্জ্জনে আপনার হিতচিন্তা করিবেক। একাকী চিন্তা করিলে পরম মঙ্গল লাভ হয়।

৩১। অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাম্ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥

মনুঃ ৫।১০৯

জলের দ্বারা গাত্র শুদ্ধ হয়, সত্যের দ্বারা মন শুদ্ধ হয়, ব্রহ্মজ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা আত্মা শুদ্ধ হয় এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হয়।

৩২। অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতৎ সামাজিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ॥

মনুঃ ১০।৬২

মনু বলিয়াছেন যে, অহিংসা, সত্য বাক্য, অচৌর্য্য, দেহ ও চিত্ত শুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সংযম, এ সমুদয়ই সকল জাতির সাধারণ ধর্ম্ম।

(ক্রমশঃ)

অজ্ঞেয়বাদ।

"এই সৃষ্টি দেখিয়া বোধ হয় ইহার একজন স্রষ্টা (creator) আছেন, কিন্তু তাঁহার বিষয় বুঝিতে পারা, মনুষ্য বুদ্ধির অতীত। ঈশ্বর সম্বন্ধে মানবের যত চিন্তা, তাহা মনের এক একটা কল্পনা মাত্র। প্রকৃত ঈশ্বরের স্বরূপ কেহ ধারণাও করিতে পারে না। ঈশ্বর মানব-চিন্তার অতীত।" এই প্রকার যাঁহাদের মত তাঁহাদিগকে "অজ্ঞেয়বাদী" বলে। আমাদের দেশে নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের মধ্যে কতকটা অজ্ঞেয়বাদের ভাব ইতিপূর্ব্বে প্রবল ছিল, এক্ষণে তাহা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। ইউরোপেও বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিত-গণের মধ্যে এই অজ্ঞেয়বাদের ভাব এক সময় যত প্রবল ছিল, বর্ত্তমানে যেন তাহা অনেক কমিয়াছে। অজ্ঞেয়বাদীগণ আরো বলেন যে, "ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষ যদি কিছু বুঝিতে পারিত তবে সকলেই তো এক প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইত, কিন্তু ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে যখন তাঁহাদের মধ্যে এত মতভেদ দেখা যাইতেছে তখন, সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এ সকলই মানব-মনের কল্পনা মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন মুনির বিভিন্ন মত, বা প্রধান খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের দ্বারা এক একটা ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে।" তারপর তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যগণের দ্বারা ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক গত যে সকল বিবাদ বিসম্বাদ হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বর্ত্তমান সময়ের একদল লোকের মত এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, "ধর্ম্ম বলিয়া একটা কোন জিনিষ জনসমাজে রাখিবার প্রয়োজন নাই। পরস্পরে সদ্ভাবে মিলিয়া সুখ-শান্তির বিধান করাই যথেষ্ট ধর্ম্ম, তদ্ভিন্ন কতকগুলি অমীমাংসিত বিষয় লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নাই।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপাততঃ অজ্ঞেয়বাদের যুক্তিগুলি যেন সত্য বলিয়া বোধ হয়, এবং আংশিক ভাবে যে কিছু সত্য উহাতে নাই তাহাও নহে, কিন্তু অজ্ঞেয়বাদের যে কোথায় ভ্রান্তি তাহা তত্ত্বদর্শী প্রকৃত সাধকগণ সহজেই ধরিতে পারেন। অজ্ঞেয়বাদ খণ্ডনের প্রথম কথা,—ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্যকরূপে মানব-বুদ্ধির অতীত, এ কথা অতীব সত্য হইলেও, এ পর্য্যন্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে কেহ কোন সত্যই বুঝিতে পারেন নাই তাহা সত্য নহে। ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ বা গুণ অনন্ত। যেমন প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিত্বে এক কিন্তু গুণ অনেক। ফলতঃ মানব-অন্তরে ঈশ্বরের প্রকাশ, অনন্ত ভাবেই হইতেছে। যে সময়ে, যে দেশে, যে জাতির প্রকৃতিতে যে ভাব বিকাশের উপযোগী হইয়াছে তখন সেখানে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, কোথাও তেজঃভাব, কোথাও শান্তভাব, কোথাও পুরুষ, কোথাও প্রকৃতি, কোথাও নিরাকার—গুণবাচক ভাব, কোথাও সাকার—লীলার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সুতরাং সকলই সেই একের ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় চৈতন্য স্বরূপ,কিন্তু মানব অন্তরে,তাঁহার প্রকাশ বহুভাবে হয়। মানবের শরীর, মন, বুদ্ধি এবং প্রকৃতিগত বহু বিচিত্র অবস্থা, সুতরাং প্রকাশকের ভেদানুসারে এক প্রকার ভেদভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, অপরদিকে একেরও বহুত্বে প্রকাশ জনিত আর একটা ভেদ হইয়া যায়। তদ্ভিন্ন মানব মাত্রেই অপূর্ণ,—অপূর্ণতা জনিত ত্রুটী বা ভ্রান্তি কিছু না কিছু উচ্চ শ্রেণীর মানবেও থাকিয়া যায়, সুতরাং ঐ সকল ভ্রান্তিও ধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। এ বিরোধ ধর্ম্মে ধর্ম্মে নহে, সত্যে আর অসত্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। "ধর্ম্ম যো বাধতে ধর্ম্ম ন সঃ ধর্ম্ম কু ধর্ম্ম তৎ"। ধর্ম্ম কখন ধর্ম্মের বাধা উপস্থিত করে না।

দ্বিতীয় কথা, সম্প্রদায়গত বিচিত্রতার মধ্যেও অনেক একতা আছে, যেমন ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে; কেহ বহু ঈশ্বর বলেন না, সকলেই বলেন "ঈশ্বর এক"। তৎপরে বিশেষ বিশেষ "ভাব" সম্বন্ধেও যথেষ্ট একতা দেখা যায়। শান্ত, দাস্য, সখ্যাদি ভাবের একতা সাধকগণের মধ্যে অবস্থানুসারে স্বভাবতঃ উপস্থিত হইয়াছে। দাস্যভাব যখন সাধকের মনে উপস্থিত হয়, তখন বহুপূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী সাধকে একই ভাব দেখা যায়। অতএব ধর্ম্মে ধর্ম্মে কেবল যে বিভিন্নতাই দেখা যায়, আর যে কিছুই একতা নাই, তাহা নহে।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, দেখা যায়, একতা এবং বিচিত্রতার দ্বারায়, এক মহা অনির্ব্বচনীয় একতাই প্রতিপন্ন করিতেছে। আর ইহাও সত্য যে, যতই বহির্জ্জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে ততই ঈশ্বর-তত্ত্বের নব নব ভাব মানব-অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে, আর কতকগুলি সত্য সেই আদিকালে যাহা প্রকাশ হইয়াছে, এখনও তাহাই আছে; যেমন ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ এই ভাব আদিতেও ছিল এখনও আছে। ঈশ্বরের যিনি যে ভাবেই আরাধনা এবং অনুষ্ঠান করুন না কেন ঈশ্বরের ঐ তিন স্বরূপে সকলেই বিশ্বাসী; ঐ তিন ভাবের অভাব কেহই স্বীকার করেন না।

প্রকৃত ঈশ্বর-তত্ত্ব লাভের জন্য জ্ঞান এবং বিশ্বাস এ দুয়েরই প্রয়োজন। যদি প্রকৃত বিশ্বাস না থাকে, আর কেবল জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিতে কেহ প্রয়াসী হন, তবে তিনি অজ্ঞেয়বাদ, সংশয়বাদ প্রভৃতি বিপদে পতিত হইতে পারেন। আবার যদি কেহ জ্ঞানের পথ ছাড়িয়া কেবল বিশ্বাসের পথে চালিত হন, তিনিও অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নানা প্রকার কুসংস্কারে পড়িতে পারেন। এজন্য ধর্ম্ম সাধন পথে বা ঈশ্বর-তত্ত্ব-লাভের পথে, জ্ঞান ও বিশ্বাস উভয়ই প্রয়োজন। অজ্ঞেয়বাদ আর কিছুই নহে, বিশ্বাস বিহীন জ্ঞানে ঈশ্বরকে ধরিতে গিয়া ঐ অবস্থায় উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে এইরূপ একটী গল্প প্রচলিত আছে,—

কোন সময়ে জনৈক পণ্ডিত জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিব মনে করিয়া শাস্ত্র পাঠ এবং জ্ঞানালোচনা করিয়াও ঈশ্বরের প্রকৃতভাব ধারণা করিতে পারিলেন না। বহু দিবস এই প্রকার করিয়াও যখন তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না, তখন তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন যে, এ জীবন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। যে দিন সমুদ্র কুলে গিয়া, জল-মগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন ভাবিয়া ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছেন, তখন দেখিলেন, অনতিদূরে এক বালক কোন প্রকার খেলা করিতেছে। পণ্ডিত, বালকের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন বালক একটী ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া ক্রমাগত এক এক গণ্ডুষ জল সমুদ্র হইতে আনিয়া গর্ত্তে নিক্ষেপ করিতেছে। তখন তিনি বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এরূপ করিতেছ কেন?" বালক বলিল, "আমি এই গর্ত্তে সমস্ত সমুদ্রের জল আনিব।" পণ্ডিত বলিলেন, "তাও কি কখন সম্ভব?" তখন বালক বলিল, "তুমি অনন্ত

ঈশ্বরকে তোমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের আয়ত্ত করিতে চাও, তবে আমারও ইহা হইবে না কেন?" তখন পণ্ডিতের চৈতন্য হইল, তিনি বুঝিলেন আজ ভগবান্ কৃপা করিয়া ঐ বালকের ভিতর দিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। তখন তিনি বাষ্পাকুলিতলোচনে, করযোড়ে বলিলেন, "হে দয়াময়! আজ আমি বিশ্বাসের আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইলাম, আমার কঠোর জ্ঞান-সাধনার পথও সফল হইল। প্রভু! তুমিই সত্য তুমিই সত্য!"

যাঁহারা ঈশ্বর-জ্ঞান, বিশ্বাস বাদ দিয়া জনহিতকর কার্য্য করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদের কার্য্য ভিত্তি শূন্য। মানবীয় শক্তিতে যে কার্য্য হয়, তাহার প্রসারতা, গভীরতা, এবং স্থায়ীত্ব কোথায়? ঈশ্বর-জ্ঞান, বিশ্বাস একটা "মহাশক্তি," কর্ম্মক্ষেত্রে পরীক্ষার দিনে শক্তি দেয় কে? আগে ঈশ্বর বিশ্বাস বা ধর্ম্ম, তাহার উপর সমগ্র মানব জীবন। যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম সকলের মূল ধর্ম্ম। তবে একথাও সত্য যে, সম্প্রদায়ীক ধর্ম্মভাব ভবিষ্যতে থাকিবে না, কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায় যে এক একটী মূল সত্য লইয়া অবতীর্ণ, তাহা কি চলিয়া যাইবে? তাহাও নহে, কিন্তু সকল সত্যের মিলনে এক-মহাধর্ম্ম, মানব-ধর্ম্ম হইবে। সময় তাহার যথা যোগ্য নাম করণ করিবে। ঈশ্বরের পিতৃত্ব, মানবের ভ্রাতৃত্ব, এবং প্রত্যেক মানবের সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এই সার্ব্বভৌমিক লক্ষণ তাহাতে থাকিবে, বর্ত্তমানে যাহার সূচনা চারিদিকে দেখা যাইতেছে। ঈশ্বরের মহিমাই মহিমান্বিত হউক!!

আলেকজাণ্ডার ও যোগী।

কোন সময়ে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট, ভারতজয় করিতে করিতে এক স্থানে আসিয়া শুনিলেন, এখানে এক যোগী পুরুষ আছেন। যোগী কেমন দেখিবার জন্য তাঁহার মনে কৌতুহল জন্মিল। যোগীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য তিনি অনুচর পাঠাইলেন। সে ব্যক্তি যোগীর নিকটে গিয়া বলিল "ভারতজয়ী" আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট আপনাকে ডাকিতেছেন। তচ্ছ্রবণে যোগী বলিলেন "ভারতজয়ী কোন ব্যক্তিকে জানি না, এবং তেমন ব্যক্তির নিকট আমার কোন প্রয়োজনও দেখি না।" অনুচর রাজসন্নিধানে আসিয়া অবিকল

যোগীর উক্তি ব্যক্ত করিলে, বহুজন পরিবেষ্টিত স্বয়ং আলেকজাণ্ডার যোগীর নিকট গমন করিলেন। যখন যোগীর নিকট রাজা আপনাকে "ভারতজয়ী" বলিয়া পরিচয় দিলেন, তখন যোগী বলিলেন, "তুমি এখন মনে করিতেছ আমি ভারতজয় করিয়াছি, কিন্তু তোমার পূর্ব্বে যাঁহারা ভারতজয় করিয়া ঐরূপ মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ আর তাহা মনে করিতে পারিতেছেন না, কিছুদিন পরে তোমার অস্তে যিনি জয় করিবেন, তখন তোমার জয়ও থাকিবে না ·তবে আর তুমি প্রকৃতপক্ষে ভারতজয় করিলে কি রূপে? আর তুমি তো ভারতজয় করিয়াছ, কিন্তু আপনাকে আপনি জয় করিয়াছ কি?" যোগীর এবম্প্রকার প্রশ্নের, রাজা কোন সদুত্তর দিতে না পারিয়া, শ্রদ্ধা-ভক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টিতে যোগার প্রশান্ত বদন অবলোকন পূর্ব্বক নিজের অজ্ঞানতার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে লাগিলেন। তখন যোগী বলিলেন, "আর এক কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি তো মানুষ মারিবার জন্য অনেক প্রকার বস্তু সঙ্গে আনিয়াছ কিন্তু পরোপকার করিবার জন্য কি আনিয়াছ?"

রাজা যোগীর বাক্য শুনিয়া. বলিলেন "আমি আপনাকে কিছু প্রদান করিতে চাই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন আপনার কি চাই।" যোগী বলিলেন, "তোমার নিকট এমন কি বস্তু আছে যাহা আমাকে দিবে? দ্বিতীয়তঃ আমার তো কোন বস্তুর প্রয়োজন নাই।" রাজা বলিলেন "আপনি বলেন কি? আমি ইচ্ছা করিলে আপনাকে এ প্রদেশ দান করিতে পারি।" যোগী বলিলেন, "আমার তো এ প্রদেশ পূর্ব্ব হইতেই আছে, তুমি আর অধিক কি দান করিবে।" রাজা এ কথার গভীর অর্থ কতদূর বুঝিলেন জানি না, কিন্তু তিনি যোগীকে কিছু দিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন যোগী বলিলেন, "আমি এই স্থানে বসিয়া অবাধে, প্রকৃতির নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতেছিলাম তোমরা আসিয়া আমার ঐ বায়ু অনেক পরিমাণে রোধ করিয়াছ, তুমি আমাকে এই দান কর যে, বায়ুর আড়াল ছাড়িয়া দাও।"

কুশদহ। (৪)

ইছাপুরের শেষ অংশ।

এক সময়ে ইছাপুর বিখ্যাত পণ্ডিত মণ্ডলীর বাসস্থান ছিল; ১০।১২টী টোলে বিদেশস্থ ছাত্রগণের দ্বারা এই স্থান মুখরিত হইত। এক্ষণে সেই সমস্ত টোলের কচিৎ চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সেই সময়ের সরলচিত্ত অধ্যাপক মণ্ডলীর সরল ভাব সম্বন্ধে নিম্নের গল্পটী দ্বারা সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে।

একদা স্থানীয় গোবরডাঙ্গার জমীদার স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বিশাল অট্টালিকার প্রাঙ্গনে কলিকাতার বিখ্যাত নর্ত্তকীর নৃত্য গীতাদি হইতে থাকে। সমাগত দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে ইছাপুরের কয়েকজন সরল চিত্ত অধ্যাপক ছিলেন। নর্ত্তকীর নৃত্য স্থানের নিকট না বসিলে তাঁহাদিগের দর্শন ও শ্রবণের অঙ্গহানি হইত, এ কারণ তাঁহারা সকলের অগ্রে সভার মধ্যে বসিয়াছিলেন। নর্ত্তকী, নৃত্য করিবার সময়ে হঠাৎ তাহার পা কোন অধ্যাপকের গাত্রে লাগিল; নর্ত্তকী তাঁহার পদধূলি না লওয়ায় তিনি বিস্মিত হইলেন ও সমাগত অধ্যাপক-দিগকে স্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতে বলিলেন। বাহিরে আসিয়া তিনি অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে বলিলেন—"বোধ করি এই নর্ত্তকী বেশ্যা হইবে," তাঁহারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"সে কি! এমন সুন্দরী ও কৃষ্ণ প্রেমিকা কখন বেশ্যা হইতে পারে;" অনেক তর্ক বিতর্কের পর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া তাঁহারা সারদাপ্রসন্ন বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "এ বেটী বেশ্যা না হইলে তর্কপঞ্চানন ভায়ার গাত্রে পদপ্রদান করায় তাঁহার পদধূলি পর্য্যন্ত লইল না কেন?"

সারদাপ্রসন্ন বাবু অতি রসিক ব্যক্তি ছিলেন; তিনি বলিলেন "কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা ছিল বলিয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য ছিল, এক্ষণে আপনারা আসরে যান, এইবার আপনার পদধূলি লইবে।" এই কথা বলিয়া সারদাপ্রসন্ন বাবু গোপনে সেই নর্ত্তকীকে সমস্ত বলিয়া পদধূলি লইতে বলিয়া দিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণের পদধূলি লইলে তিনি তাহাকে "সতী সাবিত্রী সমানা হও", ইত্যাদি, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহা কি কম সরল চিত্তের পরিচয়!

"চির দিন কখন সমান যায় না" এই কথার সার্থকতা আমরা পদে পদে দেখিতে পাই। দেবগর্ব্ব দিব্য পারিজাত কালে গন্ধবিহীন মাদার পুষ্পে পরিণত হইয়াছে; দেবভীতিপ্রদ স্বর্ণলঙ্কা কালে সামান্য মনুষ্য বাস-স্থান হইয়াছে; ধন ধান্য লোকজন পূর্ণ ইছাপুর যে কালের কঠোর আঘাতে হিংস্রশ্বাপদ সঙ্কুল স্থান হইবে ইহার আর বিচিত্র কি?

যে মহামারী গদখালি, উলা বা বীরনগর, শ্রীনগর, রাণাঘাট, দিগ্‌নগর প্রভৃতি স্থান শ্মশানে পরিণত করিয়াছে, সেই মহামারী ইছাপুর বা কুশদহকে এককালে নষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে এবং তৎসঙ্গে ইহার অধিবাসিগণের সুখশান্তি হরণ করিয়া ইহাকে মহাশ্মশানের চিরাদর্শ করিয়া তুলিয়াছে।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এই বিষম ব্যাধি কুশদহের মধ্যে প্রথমে ইছাপুরে প্রবেশ করে। ইহার প্রকোপে ইছাপুরের তিন চতুর্থাংশ লোকে এককালে কালকবলে পতিত হয়। ইছাপুরের জমীদার বংশের অনেক মহাত্মা এই বিষম ব্যাধির প্রকোপে লোকান্তরিত হন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে কুইনাইনের প্রচলন এই কুশদহে হইয়াছিল।

গোবরডাঙ্গা। পূর্ব্বে বলিয়াছি কুশদহ সমাজের সমাজপতি এই গোবরডাঙ্গায় বাস করেন। পূর্ব্বে ইছাপুরের চৌধুরী বংশের যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী কুশদহ সমাজের সমাজপতি ছিলেন। তৎপুত্র শশিভূষণ চৌধুরী নিজ ভাগ্য দোষে সমাজপতির আসন হইতে অপসৃত হইলে গোবরডাঙ্গার জমীদার মহাশয় এক্ষণে সেই সম্মানে সম্মানিত। গোবরডাঙ্গাকে এক্ষণে কুশদহ সমাজের রাজধানী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গোবরডাঙ্গায় স্কুল, দেবালয়, হাট, বাজার, ডাক্তারখানা, মিউনিসিপালিটী, রেলওয়ে ষ্টেশন প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। রেলওয়ে ষ্টেশনটী প্রকৃত পক্ষে খাঁটুরা ও গোবরডাঙ্গার মধ্যে অবস্থিত। চিনির কারখানার জন্য গোবরডাঙ্গা বিখ্যাত। বিলাতী চিনির সহিত প্রতিযোগীতায় এক্ষণে চিনির কারখানা বিলুপ্ত প্রায়।

যমুনানদী ইহার দক্ষিণ প্রান্ত বিধৌত করিয়া প্রবাহিতা। মিউনিসিপালিটীর কল্যাণে এই স্থানের রাস্তা ঘাট পরিষ্কার। ব্রাহ্মণ, তাম্বুলি ও কৈবর্ত্ত এখানকার প্রধান অধিবাসী। সাধারণ লোকের অবস্থা তত সুবিধা জনক নহে। এখানকার ৺আনন্দময়ী জাগ্রত দেবী। গোবরডাঙ্গার স্বর্গীয় জমীদার

কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কৃত দ্বাদশ শিব মন্দির সম্বলিত ৺আনন্দময়ীর বাটী, গোবরডাঙ্গা ও মছলন্দপুর ষ্টেশনের মধ্যে যে যমুনায় পুল আছে তাহার উপরে ট্রেণ আসিলে পশ্চিমদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে এই আনন্দময়ীর মন্দির ও জমীদারদিগের শোভনীয় প্রাসাদ দৃষ্টি গোচর হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ভূতপূর্ব্ব "প্রভা" সম্পাদক।

ম্যালেরিয়া কন্‌ফারেন্সে লবণ।*

সিমলা শৈলে কন্‌ফারেন্স ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিকার জন্য যে সকল যুক্তি ও মতের আলোচনা করিয়াছেন তাহা নূতন নহে। ম্যালেরিয়া পীড়িত দেশে সে সকল আলোচনা বহুদিবস হইতে চলিতেছে, কন্‌ফারেন্স রোগীদিগকে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে কুইনাইন ব্যবহার করিতে মত দেন। দৃষ্টান্ত দেখান এই যে এক সময়ে ইটালী ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতেছিল, কিন্তু বেশীভাগে কুইনাইন ব্যবহারে আশ্চর্য্য ভাবে উপকার পাওয়া গিয়াছিল। কনফারেন্সের মতে, মশকেরাও এক বিষম শত্রু। লবণ যে ম্যালেরিয়ার একটি বিশেষ প্রতিষেধক পদার্থ তাহাই এবারকার কন্‌ফারেন্সের নূতন আলোচ্য বিষয়। আমি আশা করি ম্যালেরিয়াগ্রস্থ জনগণ এ বিষয়ের সত্যতা পরীক্ষা করিতে ভুলিবেন না।

ম্যালেরিয়া রোগপ্রবণ দেশে কোষ্ঠবদ্ধতা একটি প্রধান কারণ, প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া শীতল জল সহ কিছু লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার, ও ভাবী কোন সংক্রামক পীড়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। "চা" পায়ীরা প্রাতেঃ দুগ্ধের পরিবর্ত্তে লবণ ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইবেন।

রেঙ্গুনের মিঃ এফ্ এন্ বার্ণস্ "চেম্বার্স অব্ জার্ন্যাল" নামক পত্রে লিখিয়াছেন

---

* এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে অনেক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু কুশদহ ম্যালেরিয়া প্রাবল্য দেশ এজন্য উক্ত ঔষধ সম্বন্ধে বার বার সাধারণের মনে উদিত হওয়া অনুপযুক্ত নহে। আমরাও সকলকেই ঐ ঔষধ পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। (কুঃ সঃ)

ভারতের ও ব্রহ্মদেশের নানা জেলাতে ম্যালেরিয়া জ্বর হইবার দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে কোষ্ঠ বদ্ধ হয়। তিনি আরও বলেন যে আমি ৪০ বৎসরাবধি উষ্ণপ্রধান দেশে বাস করিতেছি, কিন্তু বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যে কোন পীড়ায় কোন ঔষধ (লবণ জল ব্যতীত) সেবন করিতে হয় নাই।

প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল ডাঃ গমেল উষ্ণপ্রধান দেশে সংক্রামক পীড়ার প্রতিকার কল্পে একখানি পুস্তকে লবণের উপকারিতা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন।

মানব শরীরের শোণিতে প্রতি এক হাজার ভাগের মধ্যে ২½ হইতে ৬ ভাগ পর্য্যন্ত সোডার ভাগ আছে। সোডার ভাগ এত কম হইলেও উহার কার্য্য-কারিতা কম নহে। যাহার শরীরস্থ শোণিতে যত পরিমাণ সোডা থাকা আবশ্যক, যদি তদপেক্ষা কিছু অল্প থাকে তাহা হইলে সেই শোণিতে নানা প্রকার বিষাক্ত বীজের বাসস্থান হয়, যে পর্য্যন্ত সোডার অংশপূর্ণ না হয় সে পর্য্যন্ত সেই সকল বিষাক্ত বীজ আপনাপন ক্ষমতানুযায়িক কার্য্য করিতে বিমুখ হয় না। যদি শোণিতে সোডার অংশ পূর্ণ থাকে তাহা হইলে ম্যালেরিয়া বিষ দেহে প্রবেশ করিলেও অচিরাৎ তাহার ক্ষমতার হ্রাসতা প্রযুক্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। লবণ সোডারই প্রকারন্তর মাত্র সুতরাং লবণ সেবন করিলে দেহস্থ শোণিতে সোডার অংশ কম হইতে পারে না।

কলিকাতা প্রবাসী একজন ভদ্র ইংরাজ প্রায় ৬০ বৎসর কাল আমেরিকা ও ভারতের ম্যালেরিয়া পূর্ণ নানা স্থানে ঐ একমাত্র লবণজল প্রত্যহই নিয়মিত রূপে সেবন করিয়া ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অক্ষত ভাবে বাস করিয়াছিলেন। প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে এক অভিজ্ঞ চিকিৎসক ইটালীর ম্যালেরিয়া জ্বরে লবণের এই গুণ আবিষ্কার করেন, তাঁহার নিকট উক্ত কলিকাতাপ্রবাসী ইংরাজ মহোদয় এই ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করেন। প্রয়োজন বুঝিলে রোগী ঐ জলের সহিত কুইনাইন খাইতে পারেন।

প্রস্তুত প্রণালী,—একটি পাঁইট বোতলে বড় চামচের এক চামচ লবণ দিয়া পরে নির্ম্মল শীতল জলে উহা পূর্ণ কর, প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঐ বোতলস্থ জল এক ছটাক লইয়া তিন ছটাক শীতল বা উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান কর। উহার স্বাদ মন্দ হইবে না, ম্যালেরিয়া জ্বরের এরূপ অমোঘ ঔষধ আর আছে কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ যাহাদিগের প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়াছে

তাহাদিগের পক্ষে অমৃত স্বরূপ বলিলেও চলে। প্রতিবোতলে ব্যয় ৫ পয়সার অধিক হইবে না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রক্ষিত।
হোমিও এবং ইলেকট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

হিমালয় ভ্রমণ। (৬)

হরিদ্বার।

৯ই কার্ত্তিক শুক্রবার। আজ জগদ্ধাত্রী পূজা। সেবাশ্রমে আমার নিমন্ত্রণ হইল, এই নিমন্ত্রণের কারণ, কলিকাতা হইতে সুরেন্দ্র মহারাজ ও উপেন্দ্র বাবু সস্ত্রীক তীর্থ ভ্রমণে আসিয়া আজ সেবাশ্রমের ভক্ত-সেবা করিলেন। আমি যদিও কয়েক দিন ঘণ্টাকুটীরে গিয়াছি, তথাপি কল্যাণ স্বামী যেন আমাকেও সেবাশ্রমের একজন মনে করিয়া এ নিমন্ত্রণ করিলেন। বাহিরের আর কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হন নাই। বেলা ৩টার সময় আহার হইল। সমস্তই নিরামিষ ভোজ্য, সেবাশ্রমে দৈনিকও নিরামিষ ভোজন হয়।

দৈনিক উপাসনাদি আমার বেশ হইতেছে। প্রাণের ভাব মধ্যে মধ্যে বন্ধুবান্ধবগণকে পত্রের দ্বারায় জ্ঞাপন করিতেছি। ১০ই কার্ত্তিক প্রত্যূষকালের ধ্যানে এই জ্ঞান উপলব্ধি হইল, জড় অজড় অর্থাৎ সাকার এই দৃশ্যমান জগৎ, মানব শরীর, আমি এবং আমার তাবৎ বস্তু কিম্বা নিরাকার জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছাদি সমস্ত শক্তি, সকলই ব্রহ্ম-পদার্থ,—ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নহে। আমার মায়ার বস্তু কিছুই হইতে পারে না, সকলই ভগবানের—"আমি" "আমার" এই জ্ঞান মিথ্যা—ভ্রান্তিমাত্র।

১১ই কার্ত্তিক, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দত্তের এক পত্র পাইলাম। আজ মধ্যাহ্নে আর একটী আশ্রমে ঘণ্টাকুটীরের সমস্ত সাধুদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, সুতরাং আমারও হইয়াছিল; কিন্তু তথায় যাইবার আমার তত ইচ্ছা ছিল না। তাহাতে একটী সাধু বলেন, "পঙ্গতমে চলিয়ে"। পংক্তি ভোজনের নাম "পঙ্গত", অগত্যা পঙ্গত দেখিবার জন্যও গেলাম। অনেক বেলা হইল। সমস্ত সাধু

পরমহংসগণ একত্রে এক পংক্তিতে বসিলেন, বোধ হয় ২।৪ জন কিছু পৃথকও বসিলেন। প্রথমে শালপাতা দিয়া অনেক বিলম্বে এক একটী দ্রব্য পরিবেশন করিতে লাগিল। সকল দ্রব্যের কথা আমার স্মরণ নাই, বড় বড় মিঠায়ের কথাটা মনে আছে। পুরী অর্থাৎ লুচি মোটা মোটা আর নিতান্ত টক্ দৈ। অতিশয় বিলম্বের জন্য আমার ধৈর্য্যচুতি হইতে লাগিল, এমন কি একবার আমি কিছু আহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার পার্শ্ববর্ত্তী সাধু বলিলেন "ঠাহ র, আবি হরিহর হোয়া নেহি"। শেষে দেখিলাম, একজন শঙ্খধ্বনি করিল, আর একজন কি দুই জনে মন্ত্র পাঠ করিয়া তার পর সকলে "হরিহর" এই শব্দ করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। আমি দ্রব্য সকলের প্রকৃতি বুঝিয়া অল্পেই কার্য্য শেষ করিলাম।

১২ই খুল্না হইতে স্ত্রীর একখানি পত্র পাইলাম। এই দিনে আর একটী ঘটনা ঘটিল। প্রাতে শুনিলাম, ঘণ্টা কুটীরের মহান্ত মহারাজ গতরাত্রে আশ্রমে আসিয়াছেন। তাহা শুনিয়া মনে করিলাম অবশ্য তাঁহার সঙ্গে দেখা করা আমার উচিত। তখন তিনি ভিতরে আছেন শুনিয়া আমি বেড়াইতে চলিয়া গেলাম। বেলা ৯টার পর ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম তিনি সম্মুখের বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তির সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। আমি তাঁহার নিকট গিয়া নমস্কার করিলাম। ইতিপূর্ব্বে সাধুগণে পরস্পর "নমঃ নারায়ণ" শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কার করেন তাহা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তাহা বলি নাই। মহান্তজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপ্ ব্রহ্মচারী হ্যায় ?" তাহাতে আমি বলিলাম "নেহি, ম্যায় বাঙ্গালী ব্রহ্মজ্ঞানী হ্যায়।" তাহার পর আমাদের যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা আমি প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বলিতেছি। মহান্তজী প্রথমেই বোধ হয়, "ব্রহ্মজ্ঞানী" শব্দ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে লাভ হয়, অর্থাৎ আপনি ব্রহ্মচর্য্য না করিয়া কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন! তিনি আরো বলেন, কোন পথ ব্যতীত কি ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে? তাই তিনি, তাঁহার ভাষায় বলিয়াছিলেন, "কিস্তরে ব্রহ্মজ্ঞান হোনে সক্‌তা ? কৈ পথ বেগর জ্ঞান হোনে সক্‌তা ?" আমি তাঁহার কথার উত্তর এইরূপ দিয়াছিলাম, ব্রহ্মজ্ঞান, সাধন এবং ভগবৎ কৃপাতে লাভ হয়। সকল ধর্ম্ম পথেই এক একটী সাধন-প্রণালী আছে। আপনি বোধ হয় অবগত নহেন, বাঙ্গালায়

এবং সর্ব্বত্র "ব্রাহ্মসমাজ" নামে যে ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আমি তাহার কথাই বলিতেছি। ফলতঃ আমি আপনাদিগের ন্যায় প্রাচীন সম্প্রদায়ের নহি, আমি এক নিরাকার চৈতন্যময় ঈশ্বরের উপাসক, এই অর্থে আমি আমাকে "ব্রহ্মজ্ঞানী" বলিয়াছি। ইহার পর তিনি আমাকে আর কিছু না বলায় আমি কুটীরে চলিয়া গেলাম।

তাহার পর গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলাম। যখন ভোজনের জন্য ঘণ্টা বাজিল, তখন আহার করিতে যাইতে মনে কেমন ইতস্ততঃ ভাব আসিল। আমার ঘরের নিকটে একটী সাধু থাকিতেন, তিনি আমাকে ডাকিলেন, "মহারাজ! ভোজন করনে কো আইয়ে।" আমি জলের লোটা লইয়া যে ঘরে আহারাদি হয় তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম, সম্মুখেই মহান্তজী ছিলেন, তিনি আমাকে বলিলেন, "তুম্‌হারা হিঁয়া আস্থান নেহি হোয়েগা।" আমি বলিলাম, মহারাজ! হাম্‌ আপনা মন্‌সে হিঁয়া নেহি আয়াথা, রামানন্দজী ম্যায়কো প্রেমসে বোলায়াথা, ইস্‌বাস্তে ম্যায়নে আয়া, লেকেন, হাম্‌ আবি চলে? অর্থাৎ আমি এখনই চলিয়া যাইব কি? তাহাতে তিনি বলিলেন, "হাঁ! হিঁয়া বে-পড়্‌চা কা আদমী নেহি রাখ্‌তেহেঁ।" অর্থাৎ এখানে পরিচয়ে অমিলের কোন সাধুর স্থান হয় না। আমি তখনই আমার সামান্য বস্ত্রাদি কম্বলে জড়াইয়া আশ্রমের বাহিরে আসিলাম। মহান্তজীর নাম জ্ঞানগিরি।

বাহিরে অনতিদূরে এক কুটীরে আর একটী বাঙ্গালী সাধু থাকিতেন। তথায় দেখি, আমার সেই প্রথম পরিচিত আর দুইজন সাধুও বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা বলিলেন, "ব্যাপার কি! এত বেলায় আসন বগলে লইয়া কোথায় চলিয়াছেন?" আমি বলিলাম, ঘণ্টাকুটীরে আমার থাকা হইল না, জ্ঞানগিরির সহিত আমার অমিল হইল। ইহার পর তাঁহারা বলিলেন, "এত বেলায় ভোজন না করিয়াই চলিয়া যাইতে বলিল," আমি বলিলাম হাঁ! তখন তাঁহাদের মধ্যে একজন আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বসুন! এখানেই ভোজন করুন।" আমি বলিলাম, "এখন ভোজন কিরূপে হইবে?" তিনি বলিলেন, "আজ আমাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, অদ্যকার মাধুকরী সমস্ত মৌজুত আছে। আপনি ভোজন করিয়া এখানে বিশ্রাম করুন, আমরা নিমন্ত্রণ সারিয়া আসি।" তাঁহারা চলিয়া গেলেন, আমাকে যে ভোজ্য দিয়া গেলেন, তাহা আমার বেশী

হইল, নিকটে এক কুক্কুরী শাবকমণ্ডলী পরিবেষ্টিতা হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল, সুতরাং রুটীর অংশ তাহারা প্রাপ্ত হইল।

যথা সময়ে সাধুরা আসিলেন; কিছুক্ষণ পরে আমার পূর্ব্ব পরিচিত ২জন সাধুর সঙ্গে আর এক ক্ষুদ্র আশ্রমে গেলুম। তথায় বসিয়া অন্যান্য কথার পর আমার থাকার কথা লইয়া তাঁহারা পরামর্শ করিতে লাগিলেন, শেষ স্থির হইল "সেবাশ্রমে থাকার যদি অসুবিধা না হয়, তবে রাত্রে শয়নের ব্যবস্থা তথায় থাকুক, কেননা গোফায় বা কুটীরে থাকা অভ্যাস নাই, সহসা ঠাণ্ডা লাগিতেও পারে, কিন্তু আহারের জন্য কোন চিন্তা নাই, মাধুকরী করেন ভাল, নতুবা আমাদের মাধুকরী হইতে আপনারও চলিয়া যাইবে।" আমি বলিলাম, মাধুকরী করিতে আমার কোন কষ্ট নাই। ফলতঃ এই দিন হইতে তাঁহাদের সহিত আরো যেন ঘনিষ্টতা হইল, তাঁহারা আমাকে তাঁহাদেরই একজন মনে করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় সেবাশ্রমে গেলাম, কল্যাণানন্দ স্বামী সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, আপনি এই স্থানেই থাকুন। বোধহয় রাত্রে গান শোনা হইবে বলিয়া ডাক্তারবাবু ও তিনকড়ি মহারাজও খুব খুসী হইলেন।

১৩ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার। দাড়ী গোঁফ কামাইয়া মস্তক মুণ্ডণ করিলাম, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, ঐরূপ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল,—করিয়া ভালই লাগিল।

১৪ই কার্ত্তিক। সেবাশ্রমের ইঁদারার জলে স্নান করি। অপরাহ্ণে বেড়াইতে গিয়া ফিরিয়া আসিলাম, শরীর ভাল বোধ হইল না। সন্ধ্যার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া উপাসনা করিলাম। ধ্যানে এই উপলব্ধি হইল;—জীবনে সত্য লাভ হইলে তাহা কখন গোপন থাকে না, যে প্রকারেই হউক তাহা প্রকাশ পাইবেই, অর্থাৎ যিনি জীবনে প্রকৃত কোন সত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে তাহা জগতকে দিয়া যাইতেই হইবে, তজ্জন্য তাঁহার চিন্তা করিবার আবশ্যক হয় না। এই জন্যই বোধহয় ভারতের সাধকগণ, সাধনেই অধিক তৎপর, কিন্তু প্রচারে ব্যস্ত নন্।

১৫ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, ১লা নবেম্বর। প্রাতে শরীর ভাল বোধ হইল। আজ পূর্ণিমা। গোবরডাঙ্গা হইতে জনার্দ্দনের এক পত্র পাইয়া জানিলাম, আমাদের "মেয়েটীকে পাড়ায় রাখিয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ আমাদের ১২ বৎসর

বয়স্কা কন্যাটী বিধবা হওয়ার পর, শশুরবাড়ী অবস্থাপন্ন,নিকট আত্মীয় অভিভাবক কেহ না থাকায়, আমি তাহাকে আমাদের নিকটে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তথায় অপর দূর-সম্পর্কীয়গণ কৌশলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; তজ্জন্য আমরা পৃথিবীর বল প্রয়োগ না করিয়া বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া নিরস্ত ছিলাম। আজ সহসা এই সংবাদ আসিল যে, তাহাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়াছে, এখন নিজেরাই তাহাকে আমাদের বাড়ী রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইল, কিন্তু আমাদের অনুপস্থিতিপ্রযুক্ত, আমার প্রতিবাসী সহোদর প্রতিম শ্রীমান্ শিবনাথ কর্ম্মকার আপনার কন্যার ন্যায় নিজ বাড়ীতে যত্নপূর্ব্বক মেয়েটীকে রাখিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া বিধাতার অদ্ভুত মহিমা আমার অন্তরে একবার বিদ্যুতের ন্যায় খেলিয়া গেল, কৃতজ্ঞচিত্তে নিবেদন করিলাম, প্রভু? তুমি তোমার স্মরণাগতের বোঝা সত্যই মাথায় করিয়া বহন কর!

এই সংবাদ পাইয়াই শিবনাথকে ও জনার্দ্দনকে পত্র লিখিলাম, কিন্তু সহসা ব্যস্ত হইবে বলিয়া খুলনায় স্ত্রীকে আজ পত্র লিখিলাম না। কলিকাতা হইতে বিনয়ের এক দীর্ঘ পত্র পাইলাম, তাহাতে আমার এইরূপ ভাবে দেশভ্রমণে আসা যেন সঙ্গত হয় নাই, এবং নিজের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে, নরম গরম অনেক কথা লিখিয়াছিল।

পূর্ব্ব পরিচিত সাধুদ্বয়ের সহিত আলাপ পরিচয়ে ক্রমে জানিলাম, একের নাম পূর্ণানন্দ স্বামী, বয়স অনুমান ৫৫ বৎসরের কম নহে। পূর্ব্ব নিবাস শান্তিপুরে ছিল, ২৯ বৎসর হইল সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। বহু ভ্রমণ করিয়াছেন, কোন কোন সাধু মহাত্মার দর্শনও সঙ্গ করিয়াছেন; একবার কোন পাহাড় হইতে পড়িয়া পদে এমন আঘাৎ লাগিয়াছিল যে, অদ্যাপি তাহার নিদর্শন আছে, কিন্তু এখনও চলিতে ফিরিতে খুব মজবুত আছেন। তাঁহার সরল ও নির্ম্মল স্বভাবের পরিচয় ক্রমে পাইতে লাগিলাম। অপর শিবানন্দ স্বামী, বয়স ৪৫ বৎসরের কম নহে। পূর্ব্ব নিবাস ময়মানসিং জেলা। ইহাঁর দেহখানি বেশ বলিষ্ঠ রকমের দীর্ঘাকার সুন্দর পুরুষ, স্বভাবও অতি মিষ্ট ও সরল। তাঁহাদের অবস্থা যেমন আমি জানিলাম, তাঁহারাও আমার অবস্থা মোটামুটী জানিয়াছিলেন, এবং প্রথম দর্শনাবধি আমাদের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা সর্ব্বদা চলিত। যে দিন যে তত্ত্ব স্বভাবতঃ উঠিত তাহারই আলোচনা হইত; তাহার মধ্যে জীব ও

ব্রহ্মের একত্ব, যাহাকে অদ্বৈতবাদ বলে, তৎসম্বন্ধে ও গৃহী-সাধক এবং সন্ন্যাসীর অবস্থাগত কথাই বেশী বেশী হইত, ফলতঃ আমারও যেমন তাঁহাদের যেটী বিশেষ তত্ত্ব, তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা হইত, তাঁহারাও আমার কথিত তত্ত্ব অগ্রাহ্য না করিয়া বরং তাহাতে বিশেষত্ব কি আছে বোধহয় তাহা বুঝিবার জন্য মনোযোগ করিতেন, আমার কথা অনেক সময় জীব ও ব্রহ্মের একত্ব অথচ ভেদ, যাহাকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলে, সেইদিকে যাইত। যাহা হউক, এইজন্যই যেন আমাদের ঘনিষ্ঠতার বাঁধন একটু একটু করিয়া বাঁধিয়া গেল। তাঁহাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে বেড়ানও হইত এবং কথাবার্ত্তাও চলিত। ইতিমধ্যে ২।৩ দিন কঙ্খল হইতে হরিদ্বার বেড়াইয়া আসিলাম। হরিদ্বারে যাত্রীর ভিড় অত্যন্ত,—কতকটা কালীঘাটের মত। হিন্দুস্থানীরা আত্মীয়গণের অস্থি-ভস্ম আনিয়া রাশী রাশী গঙ্গায় ঢালিয়া দেয়।

ইতিমধ্যে পূর্ণানন্দ স্বামী বলিলেন, "আমরা শীঘ্রই ঋষিকেশ যাইব, এ সময় প্রায় সমস্ত সাধুরাই ঋষিকেশে গিয়া থাকেন কারণ কঙ্খল অপেক্ষা ঋষিকেশ পাহাড়ের নিম্নে এজন্য তথায় বায়ুর বেগ কম লাগে এখানকার মত অত্যধিক শীত বোধ হয় না।" তাহাতে আমি বলি, "আমিও আপনাদের সঙ্গে ঋষিকেশ যাইব। কয়েক দিন পর্য্যন্ত আমাদের এই পরামর্শ স্থির হইয়া আছে।"

আজ অপরাহ্ণে পূর্ণানন্দ স্বামী ও শিবানন্দ স্বামী সেবাশ্রমে আসিয়া (অন্যান্য দিনেও আসিতেন) পূর্ণানন্দ স্বামী, আমার আসবাব সম্বল কিরূপ আছে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেন। ক্রমে কৌশলে একখানি কাপড় ও এক খানি উড়ানী আর ১খানি চিরুণী যাহা আমার নিকট চাহিয়াছিলেন, চাহিবা মাত্র আমি ঐ সমস্ত তাঁহাকে দিলাম। কাপড় ও চাদরখানি তৎক্ষণাৎ গৈরিক রং করিতে শিবানন্দ স্বামীকে দিয়া বলিলেন "যাহা হউক মাথায় বাঁধা চলিবে।" তারপর আর কি আছে, তাহাও চাহিলেন কিন্তু দেখিলেন সন্ন্যাসীর মতই আমার সম্বল। আমার মনে হইল, এটা কেবল আমাকে পরীক্ষা করা মাত্র তাঁহার কাপড় চাদর কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। চিরুণীখানা তাঁহার মুণ্ডিত-মস্তকে (নেড়া মাথায়) একবার দিয়া ডাক্তার বাবুকে তাহা দিলেন। এই কার্য্যকালে পূর্ণানন্দ স্বামীর মধ্যে এমন একটা সারল্য—বালকত্বভাব প্রকাশ

পাইয়াছিল, যাহা অদ্যাপি আমার স্মরণ আছে। যাহা হউক এইরূপ করিয়া সে দিন তাঁহারা নিজ আসনে চলিয়া গেলেন।

১৬ই কার্ত্তিক। বিনয়ের প্রেরিত ৩৲ টাকা মণি-অর্ডারে পাইলাম। ভ্রাতা উপেন্দ্ররও ভক্তিভাবপূর্ণ এক পত্র পাইলাম। বিনয়ের পূর্ব্ব পত্রের উত্তর যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব ও উপেন্দ্রর পত্রের উত্তর দিলাম। বেলা ২টার সময় সহসা পূর্ণানন্দ স্বামী ও শিবানন্দ স্বামী আসিয়া বলিলেন, "আমরা ঋষিকেশ চলিয়াছি, আপনি যদি যাবেন শীঘ্র চলুন।" আমি তৎক্ষণাৎ কম্বলে সামান্য বস্ত্রাদি জড়াইয়া প্রস্তুত হইলাম।

যাত্রার পূর্ব্বে পূর্ণানন্দ স্বামীকে বলিলাম, আজ আমার ৩৲ টাকা মণি-অর্ডারে আসিয়াছে, তাহা কি সঙ্গে লইব? ঋষিকেশে প্রয়োজন হইবে কি। তিনি বলিলেন, "গঙ্গার তীরে পাহাড়ের নিম্নে কুটীর করিয়া থাকিতে হইবে, সময় সময় খালি কুটীরও পাওয়া যায়, কিন্তু যদি না পাওয়া যায় তবে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে, তাহাতে ১৲ টাকার বেশী খরচ হইবে না, আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। আমি ১৲ টাকা তাঁহার হাতে দিয়া আর ২৲ টাকা কল্যাণানন্দ স্বামীর নিকট রাখিয়া যাত্রা করিলাম। যখন যাত্রা করিলাম, তখন যে কি অপূর্ব্ব আনন্দের ভাব আসিল তাহা এখন আর বর্ণনা করিতে পারি না।

(ক্রমশঃ)

ভগ্ন-তরী।

আঁধার জলধী মাঝে   ভাসিয়া চলেছে কোথা
জীবন-তরণী
কোন্ দূরে কোন্ পারে   ভিড়িবে এ জীবন তরী
কিছু নাহি জানি!
সম্মুখে দীগন্ত ব্যাপি   তরঙ্গ-গর্জ্জন-রোল
ঝটিকা-প্রলয়
বিজলী ঝলকে দূরে   আশার আলোক যথা
ভগন হৃদয়!

দূরে দূরে—অতি দূরে কোথায় যাইব বহি
দিঠি লক্ষ্যহীন,
অবসন্ন শ্রান্ত কায়া না জানি কোথায় গিয়া
হইবে বিলীন!
জীবনের চির লক্ষ্য কোন্ অনন্তের কোলে
কোন্ সন্ধ্যা বেলা
—অস্তমিত রবি-রেখা যাবে কি না যাবে দেখা
ভাঙিবে এ খেলা,
নীরবে মিলায়ে যাবে ধরণীর শ্যাম লেখা
সসীমের কোলে
সীমা হারানর দেশে পৌঁছিব কি নিশা শেষে
চির লক্ষ্য-স্থলে!
তরঙ্গ ঝটিকা ঘন পলকে নীরব হবে
ঘুচিবে আঁধার
নব জীবনের রবি আঁকিবে নূতন ছবি
পূরবে আমার।

শ্রীসুকুমারী দেবী, গোবরডাঙ্গা।

কৃষ্ণসখা আশ ও অভয়চরণ সেন।

(সংগ্রহ)

উপরে যে দুই মহাত্মার নাম উল্লিখিত হইল তাঁহাদের জীবন চরিত ব্যাখ্যা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহাদের সম্পূর্ণ জীবনী যদিও পাওয়া যায় নাই, তথাপি মনে হয় সমগ্র জীবনীতে প্রকাশ যোগ্য বিষয়ও হয় ত না থাকিতে পারে; তবে উহাঁদিগকে মহাত্মা বলিলাম কেন? যে লুপ্তপ্রায় তত্ত্ব তাঁহাদের জীবনে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে তাঁহাদের কিছু মহত্ত্বের পরিচয় আছে। যাঁহার জীবনে কোন উচ্চতা দেখা যায়, তিনি মহৎ ব্যক্তি; সুতরাং তাঁহাকে মহাত্মা বলা অসঙ্গত নহে। অগ্রে কৃষ্ণসখা আশের বিষয় বলিব।

খাঁটুরা স্বর্গীয় মঙ্গলচন্দ্র আশের বংশেই অনুমান ৯০ নব্বুই বৎসর পূর্ব্বে

কৃষ্ণসখা আশ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং অন্যূন বিগত ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। আমাদের ধারণা ছিল, খাঁটুরা দত্ত পরিবারেই সর্ব্বাগ্রে জ্ঞান ধর্ম্মের আলোক পতিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা নহে, সম্ভবতঃ বর্ত্তমান সময়ের ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণসখা আশ নিয়মিতরূপে যোড়াসাঁকো আদি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন এবং বরাবর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। তবেই দেখা যাইতেছে যে বহু পূর্ব্বেই কুশদহস্থ অর্দ্ধশিক্ষিত তাম্বুলী জাতীয় এই মহাত্মার জীবনে তাৎকালিক জ্ঞানালোক পতিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত বলেন, "আমার বয়স যখন ১২।১৩ বৎসর, তখন আমি সর্ব্বপ্রথমে কৃষ্ণসখা আশের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। পুলের উপর দিয়া গাড়িচলার পরিবর্ত্তে শুনিয়াছিলাম যে, কলিকাতায় জলের উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া যায়, একথা শুনিয়া তাহা দেখিবার জন্য আমার বড়ই কৌতুহল জন্মিয়াছিল। তাই কৃষ্ণসখা আশের সহিত বরাহনগরে আমার এক আত্মীয়ার বাড়ী আসিলাম, এবং তাঁহার সঙ্গেই বড়বাজারে চিনির গদিতে পিতার নিকট আসিবার সময় তিনি আমাকে লইয়া এক বাড়ীর তেতলায় উঠিলেন। সেখানে অনেকলোক বসিয়াছিলেন এবং বড় বড় ঝাড় লণ্ঠনে আলোকপূর্ণ যেন "দেবসভা" বলিয়া আমার মনে হইল। আমি অবাক হইয়া তাহা দেখিতে লাগিলাম। আরও দেখিলাম মধ্যস্থলে লাল কাপড় দিয়া ঘেরা; তাহার মধ্যে যাঁহারা বসিয়াছেন, তাঁহাদের এমন সাজ পোষাক, মাথায় তাজ, যেন দেবতার ন্যায় মনে হইল, ইচ্ছা হইল, আহা! ঐ স্থানে আমি একবার যাইতে পারি। তাহার পর সভাভঙ্গ হইলে আমরাও চলিয়া আসিলাম।" কি আশ্চর্য্য! এই ঘটনার পরিণামে সেই ক্ষেত্রমোহনকে বিধাতাপুরুষ সেই স্থানেই (ব্রাহ্মসমাজে) বসাইলেন!

অভয়চরণ সেন। ইনিও কৃষ্ণসখা আশের প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি হইলেও ইহার জীবনের বিষয় যাহা জানিতে, পারা গিয়াছে, তাহা আরও ১০ বৎসর পরের ঘটনা। অভয়চরণ সেনও তেমন কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না, কিন্তু যে সময়ে স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের "চারুপাঠ" "ধর্ম্মনীতি" "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইয়া জ্ঞান এবং সংস্কারের

আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল, অভয়চরণ সেন সেই জ্ঞান ও ভাবে প্রণদিত হইয়া নিজ গ্রামের স্বজাতির কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা যেন তাঁহার অসহ্য বোধ হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য! জ্ঞানের কি মহিমা! জ্ঞান যাহাকে স্পর্শ করে তাহারই ঐ দশা উপস্থিত হয়। তিনি ঐ জ্ঞানালোক সকলের নিকট প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ আশ এবং গোপালচন্দ্র আশ অনেক পরিমাণে অভয়চরণের ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। যাহা হউক, কালে অভয়চরণের পুত্র সাহিত্যসেবী-বিদ্যাব্যবসায়ী স্বর্গীয় অবলাকান্ত সেন পিতার এবং তাম্বুলী জাতির নাম উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। যদিও কিঞ্চিৎ চিত্তচাঞ্চল্যতা বশতঃ অবলাকান্ত জীবনের উচ্চ ভাব, সকল সময় স্থির রাখিতে পারেন নাই কিন্তু তাঁহার জীবনে যে সকল দৃষ্টান্তের বিষয় ছিল, ঈশ্বর-ইচ্ছা হইলে আমরা তাহা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

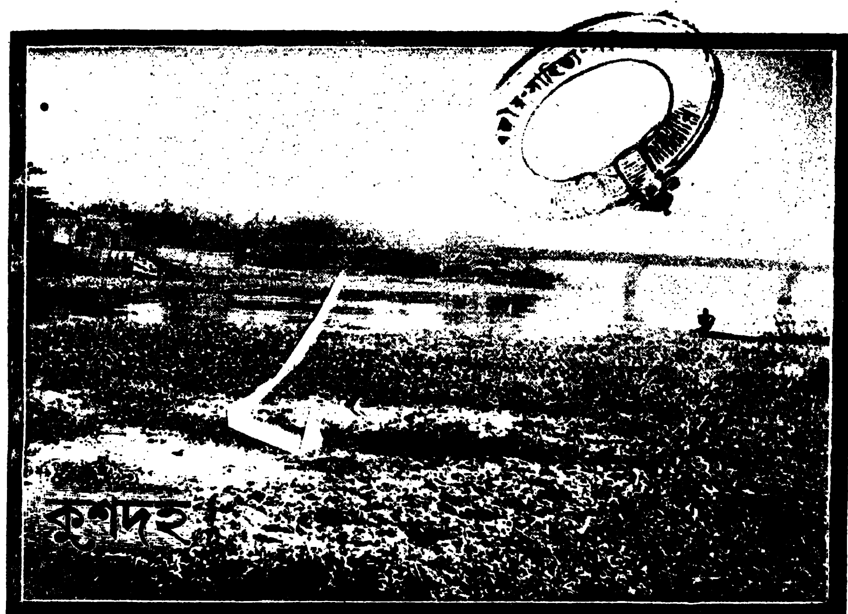
স্থানীয় সংবাদ।

বালিকা বিদ্যালয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে খাঁটুরা-গোবরডাঙ্গা গ্রামে একটী বালিকা বিদ্যালয়ের অভাব দৃষ্টে তদ্বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। যদিও তখন কোন ফল হয় নাই, কিন্তু আমরা জানি, সদিচ্ছামূলক কর্ম্ম-চেষ্টা কখনই নিস্ফল হয় না। ইতিমধ্যে আমরা ঐ কার্য্যে তিন জন ভদ্রলোকের অর্থ সাহায্য পাইবার আশা পাইয়াছি। আরও ২।৪ ব্যক্তির সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি পাইলে আপাততঃ ক্ষুদ্র আকারেও একটী বালিকা স্কুলের কার্য্যারম্ভ হইতে পারে। তথাপি আমরা ইচ্ছা করি, এমন ভদ্রগ্রামে ভাল করিয়াই একটী বালিকাস্কুল হউক। দেশহিতকর কোন সাধারণ কার্য্য করিতে হইলে অগ্রে দেশের প্রধান ব্যক্তিগণের কথাই মনে হয়, কিন্তু তাঁহারা সে সকল কার্য্যে যদি চিরদিন উদাসীন থাকেন তবে সে দেশের উন্নতি সাধন কঠিন হইয়া পড়ে।

Printed by J. N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

সূচী ও নিয়মাবলী ভিতরে দেখুন।

দ্বিতীয় বর্ষ] বৈশাখ, ১৩১৭। [৭ম সংখ্যা।



গাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়
সম্বলিত, ধর্ম্ম, সমাজ ও
বিবিধ বিষয়ক
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

কুশদহ-কার্য্যালয়
২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১।০ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য /১০ পয়সা



গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় বর্ষ "কুশদহ" কার্ত্তিক হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত ৭ম সংখ্যা গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইল। অগ্রিম চাঁদা না পাইয়াও এ পর্য্যন্ত যাঁহাদের কাগজ পাঠাইতেছি, তাঁহারা যেন চাঁদা পাঠাইতে আর বিলম্ব না করেন, ইতি মধ্যে যাঁহাদের মণিঅর্ডার না পাইব, তাঁহাদের নামে ভিঃপিতে কাগজ পাঠাইব, কিন্তু কেহ ভিঃপি ফেরত দিয়া আমাদিগকে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। (কুঃ সঃ).

২য় বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩১৭। [৭ম সংখ্যা।

সঙ্গীত।

কাফি সিন্ধু—যৎ।

ধন্য দেব মহিমা তোমার, বুঝে সাধ্য কার।
পলকে প্রলয় হয়,—শ্মশানসম সংসার।
প্রকাশি জননীস্নেহ, রচিলে মানব দেহ,
করিলে তাহে প্রাণ সঞ্চার;
সাজাইলে নানাসাজে অপরূপ চমৎকার।
শেষে চিতানল জ্বেলে, নিজে তারে দিলে ফেলে,
পঞ্চভূতে মিশালে আবার;
আপন স্বরূপে জীবে করিলে হে প্রত্যাহার।
চিরদিন এই খেলা, ভাঙ্গ গড় দুটী বেলা,
নাহি মায়া মমতা বিকার;
অবোধ বালক মোরা করি তাই হাহাকার।
দেখে শুনে ভয়ে মরি, ওহে লীলাময় হরি,
দশ দিক হেরি অন্ধকার;
সুখ দুখ সব মিছা, তুমি মাত্র সার।

—চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

জ্ঞান-নেত্রে নবীন-দর্শন।

এ বিশাল বিশ্বের নিত্য নবভাব দর্শন করিতে কে সক্ষম? প্রকৃতির বিচিত্র প্রণালী এবং অন্তর্জগতের নব নব ভাবের বিকাশ দর্শনে কে আনন্দিত? যাঁহার জ্ঞান-নেত্র বিকশিত হইয়াছে, যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃতির নিত্য নবভাব দর্শনে অধিকারী। জ্ঞানী ব্যক্তি সদানন্দময়, তাই জ্ঞানীর চক্ষু সদা অন্তরে বাহিরে নবভাবের বিকাশ দর্শনে আনন্দিত। জ্ঞানে আনন্দ উৎপন্ন করে কেন? জ্ঞান যথার্থ দৃষ্টি, অর্থাৎ যে বস্তু যাহা, তাহাকে তাহাই বলিয়া বুঝিতে পারার নাম যথার্থ দৃষ্টি বা স্বরূপ দর্শন। সুতরাং স্বরূপ দর্শনে আনন্দ স্বাভাবিক—উহা ঐশ্বরিক নিয়ম। কিন্তু অজ্ঞানতা বা মিথ্যা দৃষ্টি, তদ্বিপরীত, অর্থাৎ, যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে তাহা বিবেচনা করা,—রামকে শ্যাম জ্ঞান, দেহাত্মবুদ্ধি,—দেহকেই আমি জ্ঞান করার নাম অজ্ঞানতা, সুতরাং তাহাতেই দুঃখ। অজ্ঞানতাই সকল দুঃখের মূল। অজ্ঞানীর চক্ষু এই জগতে জগদীশ-লীলা বুঝিতে পারে না। সকলই জড়বৎ,—মোহের খেলা দেখে মাত্র। কিন্তু জ্ঞানীর নিকটে এই জগৎ চৈতন্যময়, প্রাণময়, লীলাময়। এখানে সর্ব্বদা জীবন্ত খেলা হইতেছে,—ইহার মধ্যে কতভাব, কত রস-প্রবাহ; জ্ঞানী তাহা সদাপান করিতে সক্ষম।

জ্ঞানীর নিকট কালের বিচ্ছেদ নাই, সদা-নিত্যকাল, সদানন্দময়। তথাপি ভগবৎ লীলার ভাবে দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর কতই নবতত্ত্ব, নব নব ভাব জ্ঞানীর নিকট ঘোষণা করিতেছে। প্রতিক্ষণে সকলই নূতন হইয়া আসিতেছে। চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা, ঘটনা, ক্রিয়া যাহা একটীর পর আর একটী আসিতেছে তাহা পরক্ষণেই নূতন হইয়া আসিতেছে। জ্ঞানে, ভাবে যিনি অনুপ্রাণিত, তাঁহার নিকট "নববর্ষ" নবতত্ত্ব দানের হেতু স্বরূপ; অন্যথা নববর্ষ বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। বাহ্য অনুষ্ঠানে আত্মার তৃপ্তি হয় না, তাই বলি, ভগবান্ আমাদিগকে জ্ঞান-নেত্র, নবীন-দৃষ্টি-শক্তি দান করুন। আমরা অন্তরে বাহিরে তাঁহার নিত্য নবলীলা দর্শন করিতে করিতে যেন কৃতার্থ হইয়া যাই।

নববর্ষের প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময়, মঙ্গল লগনে।
হও অধিষ্ঠিত এ ক্ষুদ্র ভবনে।
ছোট বড় শিরে তোমার চরণে,
নমিছে দেবতা ভকতি শরণে।
করহে তাদের কামনা পূর্ণ।
প্রদানি হৃদয়ে মহাপ্রেম বল,
বিদূর অজ্ঞান-তমস সকল,
কর্ম্মক্ষেত্রে কভু না হয় বিফল,
উদ্যম উৎসাহ জাগে অবিরল
পাপ তাপ যত করহে চূর্ণ।
এ ব্রহ্মাণ্ড দেব পরীক্ষার স্থল,
শোকের অনল দহে অবিরল।
নাহি মানে হায়! দুর্ব্বল সবল
নরনারী যুবা স্থবির অচল,
অব্যাহতি নাহি পায় যে কেহ।
সে ভীষণ কালে হয়ে আত্মহারা,
মানবের চিত্ত মগ্ন অন্ধ-কারা,
নিরুপায় অশ্রু বহে খরধারা,
নয়ন না হেরে ক্ষুদ্র বিন্দুতারা,
অসহায় পান্থ হারাইয়া গেহ।

ভিখারী সে আর্ত্ত চরণে তোমার;
দেখাও হে পথ করুণা আধার।
সম্মুখে অকূল সিন্ধু পারাবার
গর্জ্জিছে বিষম মহান হুঙ্কার।
আশঙ্কা কম্পিত হৃদয় প্রাণ।
তথা তুমি দেব পিতার সমান,
রক্ষা কর দীনে সাধিয়ে কল্যাণ;
অক্ষয় যেমন ভানুর কিরণ,
জলদে আবৃত হয় না কখন,
চিরদিন রহে সমশক্তিমান্।
সম্পদের ঘোর মোহের আগারে,
ঐশ্বর্য্য উন্মাদ নাহি গ্রাসে মোরে।
সুখের মদিরা অবশ না করে।
ধ্রুব লক্ষ্য তুমি থেকো হৃদি পরে
আজীবন সাথে চরম প্রার্থনা।
নববর্ষে দাও মধুময় আশা,
তার মাঝে রাখি তোমারি ভরসা,
নরনারী মাঝে তব ভালবাসা
পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত পবিত্র পিপাসা
নবভাবে লভি নব সাধনা।

"মনোজবা" রচয়িত্রী—
শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী।

শাস্ত্র সঙ্কলন।

৩৩। এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥

মনুসংহিতা ৮।১৭

ধর্ম্ম কেবল একই মিত্র, যিনি মরণকালেও অনুগামী হয়েন; আর সমুদায়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায়।

৩৪। কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূযতে তু সঃ ॥

মনুঃ ১১।২৩০

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে, সেই পাপ হইতে মনুষ্য মুক্ত হয়। এমত কর্ম্ম আর করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়।

৩৫। অজ্ঞানাদ্যদি বা জ্ঞানাৎ কৃত্বা কর্ম্ম বিগর্হিতম্।
তস্মাদ্বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ দ্বিতীয়ন্ন সমাচরেৎ ॥

মনুঃ ১১।২৩২

কোন ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে, বা জ্ঞাতসারে পাপাচরণ করিয়া তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে সে আর দ্বিতীয় বার তাহা করিবে না।

৩৬। যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমম্ ॥

মনুঃ ১১।২৩৮

যাহা দুস্তর, দুষ্প্রাপ্য, দুর্গম ও দুষ্কর তৎসমুদায়ই তপস্যাসাধ্য, তপস্যা দ্বারা সকলই জয় করা যায়।

৩৭। যৎকিঞ্চিদেনঃ কুর্ব্বন্তি মনোবাঙ্মূর্ত্তিভির্জ্জনাঃ।
তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহন্ত্যাশু তপসৈব তপোধনাঃ ॥

মনুঃ ১১।২৪১

তপোধনেরা শরীর, মন, বাক্য দ্বারা যাহা কিছু পাপাচরণ করেন, তপস্যা দ্বারাই তৎসমুদায়ই শীঘ্র ভস্মীভূত করিয়া থাকেন।

৩৮। অশেষেণ পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ।
মোক্ষ ইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ স এব বিমলক্রমঃ॥

যোগবাশিষ্টম্ ১।৯

সাধুরা, সম্পূর্ণরূপে বাসনা পরিত্যাগই উৎকৃষ্ট মোক্ষ এবং তাহাই ব্রহ্মলাভের প্রকৃষ্ট সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

৩৯। তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

যোগ, ২।২৮

বৃক্ষাদিও জীবন ধারণ করে, মৃগপক্ষীরাও জীবনধারণ করে, কিন্তু যাঁহার মন ব্রহ্মমনন দ্বারা সজীব হয়, তিনিই যথার্থ জীবন ধারণ করেন।

৪০। ইতস্ততো দুরতরং বিহৃত্য প্রবিশ্য গেহং দিবসাবসানে
বিবেকিলোকাশ্রয়সাধুবৃত্তরিক্তং হি রাত্রৌ ক উপৈতি নিদ্রাম্॥

যোগ ২।১৫৬

কোন্ ব্যক্তি সমস্ত দিন ইতস্ততঃ দূরে ভ্রমণ করিয়া সায়ংকালে সাধুসঙ্গ ও সচ্চরিত্র পরিশূন্য গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক রজনীতে নিদ্রা যাইতে পারে?

৪১। স্বানুভূতেঃ সুশাস্ত্রস্য গুরোশ্চৈবৈকবাক্যতা।
যস্যাভ্যাসেন তেনাত্মা সন্ততেনাবলোক্যতে॥

যোগ ৪।৫৩

সুশাস্ত্র, গুরুবাক্য এবং আপনার অনুভব এই তিনের ঐক্য করিয়া যিনি নিরন্তর ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করেন, তিনি পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

৪২। ন কায়ক্লেশবৈধুর্য্যং ন তীর্থায়তনাশ্রয়ঃ।
কেবলং তন্মনোমাত্রজয়েনাসাদ্যতে পদম্।

যোগ ৪।৫৭

শারীরিক ক্লেশ জন্য কাতরতা, অথবা তীর্থবাস, এতদ্দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। কেবল মনকে জয় করিলেই তাঁহাকে লাভ করা যায়।

(ক্রমশঃ)

শান্তিপ্রিয় সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড।

"শান্তি সংস্থাপকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত হইবে।"
(মথি, ৫ ; ৯।)

জন্ম ১৮৪১ খৃঃ ৯ই নবেম্বর, মঙ্গলবার।

মৃত্যু ১৯১০ খৃঃ ৬ই মে, শুক্রবার।

রাজ্যলাভ ১৯০১ খৃঃ ২২ শে জানুয়ারী।

দশ বৎসর রাজত্বকাল পূর্ণ না হইতেই প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে ব্রিটিস দ্বীপ-পুঞ্জের এবং ব্রিটিস উপনিবেশ সমূহের অধীশ্বর, ভারত সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড ইহলোকের কার্য্য শেষ করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।

"রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড ব্রিটিশ রাজসিংহাসনের উচ্চগৌরব স্বরূপ হইয়াছিলেন, জগতের সমস্ত লোক ইহা স্বীকার করিতেছেন।"

তিনি সকল রাজ্জগণের সম্মিলন আকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার জীবনে ভগবানের ঈঙ্গিত। এজন্য তিনিও তাঁহার সমগ্র জীবন নিয়োগ করিয়াছিলেন।

"রাজা এড্ওয়ার্ড অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ছিলেন। বিদেশী রাজাদিগের সঙ্গে সখ্য সংস্থাপন করিয়া ইউরোপ এবং আসিয়ার সমস্ত বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। যুদ্ধ দ্বারা মানবসমাজের যে ঘোরতর অনিষ্ট হয়, ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া ইউরোপে প্রায় সমস্ত দেশের নরপতিদিগের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করার পর রুশিয়া ব্যতীত ইউরোপের আর সমস্ত দেশের নরপতিদিগের সঙ্গে বন্ধুতা সংস্থাপনের জন্য গমন করিয়াছিলেন। ১৯০২ সালে তাঁহারই যত্নে ইংলণ্ড ও জাপানের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়। ১৯০৩ সালে পর্টুগালের রাজধানী লিস্বন্ নগরে গমন করিয়া তথাকার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এবং তথা হইতে ইটালী গমন করিয়া রাজা ইমানুয়েল এবং রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের গুরু পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পোপ এড্ওয়ার্ডের সৌজন্যে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন; ফরাসীদিগের সঙ্গে ইংরাজের আবহমান

কাল শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল, এই শত্রুতানল নির্ব্বাণ করিবার জন্য রাজা এডওয়ার্ড ১৯০৩ সালের মে মাসে প্যারিস নগরে গমন করেন। এডওয়ার্ডের ব্যবহারে ফরাসী জাতি এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে ১৯০৪ সালে সর্ব্ববিষয়ে পরস্পরে সাহায্য করিবার জন্য ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধিদ্বারা দুই শতাধিক বৎসরের বিবাদ থামিয়া যায়। ১৯০৩ সালের আগষ্ট মাসে রাজা এড্ওয়ার্ড অষ্ট্রীয়ার রাজধানীতে গমন করিয়া তথাকার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এবং পর বৎসর আগষ্ট মাসে পুনরায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বন্ধুতা সুদৃঢ় করেন।

১৯০৪ সালে জুন মাসে রাজা এড্ওয়ার্ড আপনার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পুত্র জার্ম্মানীর সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও ইংলণ্ডের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে আপোষে তাহা মীমাংসা করিবার জন্য এক সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৯০৫ সালে মরক্কো লইয়া ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর মধ্যে যুদ্ধের আয়োজন হইয়াছিল। রাজা এড্ওয়ার্ড এই যুদ্ধ নিবারণের জন্য দুইবার ফ্রান্সের সভাপতি লুবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহা ঘোষণা করেন যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয় তবে ইংলণ্ড ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করিবেন। ইহার পর জার্ম্মানী যুদ্ধ হইতে বিরত হন।

ইউরোপের অনেক রাজাই পারিবারিক সম্বন্ধে রাজা এড্ওয়ার্ডের সহিত ঘনিষ্ট আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার তৃতীয় কন্যার সহিত নরওয়ের রাজা হাকনের বিবাহ হইয়াছে। জার্ম্মানীর সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম তাঁহারই জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পুত্র। তাঁহার ভগিনী এলিসের কন্যা রুশিয়ার সম্রাটের পত্নী। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা ডিউক অফ্ এডিনবরার কন্যা রোমানিয়ার রাজকুমার ফার্ডিনাণ্ডের পত্নী। তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অফ্ কনটের এক কন্যা সুইডেনের রাজমহিষী। তাঁহার ভগিনী রাজকুমারী বিয়াট্রিসের কন্যা স্পেনের রাজা আলফন্সোর পত্নী। তাঁহার এক শ্যালক গ্রীসের রাজা। তাঁহার শ্যালিকা রুশ সম্রাটের মাতা। ডেনমার্কের রাজা তাঁহার শ্যালক।

১৯০২ সালে বুয়ার যুদ্ধের অবসান হয় এবং ৩১শে মে সন্ধি স্থাপিত হয়। যে বুয়ারগণ ইংরাজের সঙ্গে মহা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ইংরাজের রক্তে দক্ষিণ আফ্রিকা সিক্ত করিয়াছিল, রাজা এড্ওয়ার্ড সেই বুয়ারদিগকেই স্বায়ত্বশাসন

প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এবং আফ্রিকার চারিটী প্রদেশ সম্মিলিত হইয়া বর্ত্তমান বর্ষে এক মহারাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

রাজা এডওয়ার্ড গরীব দুঃখীর পরম হিতৈষী ছিলেন। তিনি গৃহশূন্য দরিদ্রদিগের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছেন। তিনি হাঁসপাতালে রোগীদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধনের নিমিত্ত অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রাজা এডওয়ার্ড ভারতবর্ষকে ভাল বাসিতেন। ১৮৭৫ সালে তিনি ভারতবর্ষ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সেদিন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের কল্যাণ চিন্তা করিয়াছেন। ১৯০৩ সালে জানুয়ারী মাসে দিল্লী নগরে যখন অভিষেক দরবার হয় তখন তিনি কহিয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতার পদানুসরণ করিয়াই ভারতবর্ষ শাসন করিবেন।

১৯০৮ সালে নবেম্বর মাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্রের পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসবের দিনে তিনি ভারতবাসীকে এই আশ্বাস বচন শুনাইয়াছিলেন যে ভারতবর্ষেও ক্রমশঃ প্রতিনিধি শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে এবং এই ঘোষণানুযায়ী ভারতে আংশিক ভাবে প্রতিনিধি প্রণালী সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

রাজা এডওয়ার্ড ভারতবাসীকে ভাল বাসিতেন, ভারতবাসীও তাঁহাকে ভক্তি করিত। এমন রাজার মৃত্যুতে ভারতবাসী যথার্থই ক্লেশ অনুভব করিতেছে।"

(সঞ্জীবনী)

পুনর্জ্জন্মবাদ।

মৃত্যুর পর কিরূপ অবস্থা হয় তাহা জানিতে সকলেই অল্পাধিক ব্যগ্র। বিষয়টীও অত্যন্ত গুরুতর। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার দৃষ্ট হয়। মৃত্যুর পর যে অবস্থা হয়, তাহা দর্শন করিয়া কেহই এ জগতে ফিরিয়া আসে না। বিধাতার এমন কোন বিধিও নাই। তবে এ সম্বন্ধে কাল্পনিক গল্প মানব সমাজে কিছু কিছু প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে।

ভক্ত রামপ্রসাদ বলিলেন "বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে? কেহ বলে ভূত পেত্‌নি হবি, কেহ বলে সা-লোক্য* পাবি" ইত্যাদি। সাধারণতঃ হিন্দুর

* সবার লোকে বাস।

বিশ্বাস মৃত্যুর পর এই জগতে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এ প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই উদ্দেশ্য কিন্তু এ সুদীর্ঘ আলোচ্য বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা অসম্ভব, পরন্তুপুনর্জন্ম বাদের প্রতিবাদ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে, হইতেছে, এখনও হইবে, কারণ যতদিন প্রকৃত সত্য অবধারণ না হয়, ততদিন তাহার বিষয় চিন্তা করিতে মানব সমাজ কখনই বিরত হইতে পারে না।

এই যে মানব-জন্ম আর মৃত্যু, ইহার মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, কোন বস্তুটা জন্মায় এবং মরে। ফলতঃ যাহা জন্মায়, তাহাই মরে, আর যাহা জন্মায় না তাহা মরেও না। যাহা মরে তাহা নিত্যবস্তু নহে। যাহা মরণশীল তাহা অনিত্য বস্তু। এই তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আরো দেখা যায়, মানুষ নিত্যবস্তু, কি অনিত্যবস্তু, কিম্বা নিত্যানিত্য মিশ্র? মানুষ বলিলে কি বুঝায়? শরীর এবং আত্মা; কেবল শরীর মানুষ নহে, কেবল আত্মাও নহে, কেবল আত্মা যাহা তাহাই পরমাত্মা। শরীর অনিত্য, আত্মা নিত্য। আত্মা জন্মায়ও না মরেও না, শরীরই জন্মায় শরীরই মরে।

পুনঃ পুনঃ শরীর জন্মায় কেন? অর্থাৎ অজর অমর আত্মা কেন পুনঃ পুনঃ শরীর গ্রহণ করে? শরীর এবং আত্মা ইহার মধ্যস্থলে আর একটী বস্তু আছে তাহা মন। মনের স্বরূপ সঙ্কল্প, বিকল্প, অথবা বাসনা। এই মনও ধ্বংসশীল বস্তু, অর্থাৎ মন নিত্য পদার্থ নহে। তবে শরীর গেলেই যে মন যায় তাহা নহে। মনের স্বরূপ যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ মনও বিদ্যমান থাকে, শরীর স্থূল ভূত, মন সূক্ষ্ম ভূত, সুতরাং শরীর গেলেও মন আত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত করে। মন বা বাসনা, আত্মাকে শরীর গ্রহণে প্রবৃত্ত করে। কর্ম্মফল ভোগ এবং আত্মার উৎকর্ষ সাধন জন্য আত্মার পক্ষে শরীর ধারণ করা আবশ্যক হয়। ইহাই হিন্দুর সাধারণ বিশ্বাস। কিন্তু এই তত্ত্বের মধ্যে একটী সন্দেহের বিষয় উপস্থিত হইতে পারে—শরীর গেলেও মন থাকে, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে মনের যে একটী প্রধান গুণ, স্মৃতি বা স্মরণ শক্তি, তাহাতে পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে না কেন? কিন্তু এ কথার উত্তরে এই যুক্তি আছে যে, বর্ত্তমান দেহ গেলে যেমন নূতন দেহ হয় তেমন নূতন মনেরও উৎপত্তি হয়, অথচপূর্ব্ব মনের স্বরূপ বাসনা, আত্মাতে প্রকৃতি বা সংস্কাররূপে যুক্ত

থাকে, সুতরাং শরীরের সঙ্গে পূর্ব্বে মনের বিনাশে পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয়।

এতক্ষণে আমরা দেখিলাম, শরীর, মন, আত্মা, এই তিনের মিলনে মানব জীবন। শরীর, মন, অনিত্য,—মরণশীল বস্তু, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর—অমর। শরীরই জন্মায় শরীরই মরে। মন শরীরের ন্যায় ধ্বংসশীল হইলেও স্থূল ভূত নহে। মন সূক্ষ্মভূত, সুতরাং অবিনশ্বর আত্মাতে প্রকৃতি বা সংস্কাররূপে সাময়িক ভাবে আচ্ছন্ন করে। কিন্তু মনেরও বিনাশ আছে, অর্থাৎ বাসনা চিরকাল আত্মার সঙ্গে থাকে না। জ্ঞানে বাসনা ক্ষয় হয়। বাসনা নিবৃত্তি হইলে আর জন্ম হয় না। জ্ঞানেই মুক্তি লব্ধ হয়। ইহা একপক্ষের যুক্তি, অপর পক্ষ বারান্তরে আলোচ্য।

দুই বন্ধু।

শান্তিনগরে ভুলু ও ভবানীর নিবাস। ভুলুর পুরা নাম ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, ভবানী,—ভবানীচরণ দত্ত। এই নাম ধাম কাল্পনিক হইলেও আখ্যায়িকার মৌলিক ভাব সত্য মূলক। ভবানীচরণ আরও কয়েক সহোদরের ভ্রাতা, কিন্তু ভোলানাথ এককমাত্র। সংসারে স্ত্রী ছাড়া আর কেহ বর্ত্তমান নাই, সন্তানাদিও হয় নাই। উপজীবিকা ব্রহ্মোত্তর জমীর কিঞ্চিৎ আয় মাত্র। ভোলানাথ অনেকটা স্বাধীন প্রকৃতির, এজন্য চাকরীর প্রতি অনুরাগ নাই। ভোলানাথের স্ত্রীও অল্পে সন্তোষ ভাবাপন্না। সুতরাং ভোলানাথ গরীব হইলেও সংসারে বেশ শান্তিতে বাস করিতেন।

প্রথমেই বলা হইয়াছে ভবানীচরণ কয়েক সহোদরের ভ্রাতা, আর আর সকলে বিদেশে চাকরী করেন, ভবানীচরণ বাড়ীতে থাকিয়া বিষয় সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণ করেন। কোন্ দুরলক্ষ্য সূত্রে যে ভুলু এবং ভবানীর বন্ধুতা, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বাল্যকাল হইতে এই প্রণয়ের আরম্ভ হইয়া, এখন পরিণত বয়সে সে বন্ধুতা বিশেষ পবিত্র মধুর ভাবে, পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভোলানাথের বাড়ীতেই সর্ব্বদা বসা উঠার স্থান সুতরাং এই বন্ধুতার মধ্যে

ভোলানাথের স্ত্রী বসুমতীও ছিলেন। ইঁহাদের এই বান্ধব-জীবন যে কেবল নিজেদের মধ্যে বদ্ধ ছিল, তাহা নহে প্রতিবাসীর বিপদাপদে যথাসাধ্য সাহায্য করা ইঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল।

ভোলানাথ কখন কখন খাজনাদি আদায়ের জন্য স্থানান্তরে গিয়া ২।১দিন বাড়ী আসিতে না পারিলে, ভবানীচরণ যেমন প্রত্যহ ভোলানাথের বাড়ীতে আসিতেন, তখনও তেমনই আসিয়া বসুমতীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন।

আজ ভোলানাথ বাড়ী নাই, সন্ধ্যার পর যথাসময়ে ভবানীচরণ আসিতেছেন না, বসুমতী নিয়মিত কর্ম্ম সমাপন করিয়া বন্ধুর প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ভবানীচরণ আসিয়াই বলিলেন, বসু! (ভবানীচরণ বসুমতীকে কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায় বসু বলিয়া ডাকিতেন। বসুমতীও ভবানীচরণকে বন্ধুদাদা বলিতেন) তাই ভবানীচরণ বলিলেন, "বসু! আজ একটা কাজে গিয়া এমন রৌদ্র লাগিয়াছে যে তজ্জন্য মাথা ধরিয়াছে।" বসুমতী একটী মাদুর পাতিয়া, একটি বালিস দিয়া বলিলেন "বন্ধুদাদা! তবে একটু বিশ্রাম কর।" ভবানীচরণ শয়ন করিলেন, বসুমতী নিকটে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ উভয়ে কথা কহিতে কহিতে ভবানীচরণ নিদ্রিত হইলেন। বসুমতী তখনও মৃদু মৃদু ভাবে মাথায় বাতাস করিতেছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে গৃহের অপর দিকে এক চোর প্রবেশ করিয়া দেখিল, গৃহস্থ নিদ্রিত নহে। তখন সে উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে ভোলানাথ বাড়ী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য বসুমতীকে ডাকিতে লাগিলেন। বসুমতী দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "ঘরে বন্ধুদাদা ঘুমাইতেছেন, তাঁহার মাথা ধরিয়াছে।" ভোলানাথের আগমনে ভবানীচরণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল অতঃপর তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

ক্রমে ঘটনা যখন এ পর্য্যন্ত আসিল, তখন গৃহস্থিত চোর, এই অকৃত্রিম বন্ধুতার আদর্শ এই "আনন্দ-গৃহ" দর্শনে তাহার মনের এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল। সে একেবারে সর্ব্ব-সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। সহসা ঘরের মধ্যে এ ব্যক্তি কে বুঝিতে না পারিয়া ভবানীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?"

আগন্তুক। আমি চোর।

ভবানী। চোর কি রকম, তোমার অবয়বে তো ভদ্রসন্তান বলিয়া বোধ হয় ?

চোর। ভদ্রসন্তান কি চোর হয় না ? সত্যই আমি চোর। তবে শুনুন। এই বলিয়া চোর বলিতে লাগিল "আমি আজ রাত্রে এই বাড়ীতে কিছু চুরি করিব বলিয়া প্রবেশ করি কিন্তু (বসুমতী ও ভবানীচরণকে লক্ষ্য করিয়া ভোলানাথের প্রতি বলিল) তাঁহাদিগকে জাগরিত দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, তাঁহারা স্বামী ও স্ত্রী, সুতরাং নিদ্রিতকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে মনস্থ করিলাম। তৎপরে কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিলাম যে, উহাঁরা স্বামী, স্ত্রী নহেন, তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার মনে মন্দ ভাবের উদয় হইল। সুতরাং সমস্ত অবস্থা অবগত হইবার জন্য আমার কৌতূহল জন্মিল। তৎপরে যখন আপনি বাড়ী আসিলেন তখন আদ্যোপান্ত আপনাদের বন্ধুতার স্বর্গীয় ছবি দেখিয়া আমার প্রাণ বিগলিত হইয়াছে। আমার এখন আপনাদের নিকট কোন ভয় নাই। আমি যে কু-অভিপ্রায়ে আজ এখানে আসিয়াছিলাম, তজ্জন্য আপনারা যদি আমাকে চোর বলিয়া বিচারালয়ে দেন, তাহাতেও আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই ; তবে আরও বলি শুনুন ! (ভবানীচরণের প্রতি) আপনি আমাকে যে ভদ্রসন্তান বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন তাহাও সত্য। আমার নাম উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আমিও যৌবন-কালে এই বন্ধুতার পিপাসু হইয়া সংসারের কুটিল ব্যবহারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এখন আমার এই দশা হইয়াছে, কিন্তু আজ আপনাদিগকে দেখিয়া যেন কি এক অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষা,—অতৃপ্ত বাসনা আমার অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে। আপনারা কি এ অধমকে দয়া করিবেন ? আজ হইতে আমি এ পথ পরিত্যাগ করিলাম, আপনারা কি আমাকে বন্ধুতার সাধনে গ্রহণ করিবেন ?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া উমেশ নিস্তব্ধ হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বন্ধুগণও এই স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শন করিয়া শুষ্ক নেত্রে থাকিতে পারিলেন না। তখন ভবানীচরণ বলিলেন, "বন্ধু ! আমরা যে বন্ধুতা-ব্রত সাধনে ব্রতী, তুমি যখন আজ অনুতাপী হইয়া অসৎ পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্রত সাধনে ইচ্ছুক হইয়াছ, তখন তোমাকে গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য। আজ হইতে তুমি আমাদের বন্ধু হইলে। আমাদের ব্রত সাধনের অপর নিয়ম এই যে, সৎপথে স্বাবলম্বী হইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া সাধ্যানুসারে পরোপকার করা।" অতঃপর সকলের সম্মতিক্রমে

বসুমতী কিছু আহারীয় প্রস্তত করিলেন এবং সকলে আহারাদি করিলে সে দিনকার কার্য্য শেষ হইল। ইহার পর প্রায় এক বৎসর চলিয়া গেল।

একদা তিন বন্ধুতে ইচ্ছা করিয়া রাজারঘাটে স্নান করিতে আসিলেন। তিন জনে তিনখানি শুষ্ক বস্ত্র সঙ্গে আনিয়াছিলেন। স্নানান্তে ভবানীচরণ যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক কিছু অগ্রে বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে উমেশ দেখিলেন যে, ভবানীচরণ ভ্রমক্রমে তাঁহার বস্ত্র পরিধান করিতেছেন, সুতরাং উমেশ বলিলেন "বন্ধু! ও কাপড়খানা আমার।" ভবানী বস্ত্রের প্রতি একটু দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "হাঁ, বন্ধু! আমার ভুল হইয়াছে।" তৎপরে তিনি নিজের বস্ত্র লইয়া পরিধান করিলেন এবং যথা সময়ে সকলে বাড়ী আসিলেন।

যখন তিন বন্ধুতে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, তখন ভবানীচরণ,উমেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "বন্ধু! আজ হইতে তোমাকে আমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া কিছু পৃথক্‌ভাবে থাকিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া উমেশ বজ্রাহতের ন্যায় কাতরভাবে বলিলেন "বন্ধু! আমার কি অপরাধ হইয়াছে যে, আজ এমন নিদারুণ অনুজ্ঞা করিতেছ?" তাহাতে ভবানীচরণ বলিলেন "বন্ধু! তোমার অন্য কোন অপরাধ হয় নাই, কিন্তু আমাদের যে বন্ধুতার ব্রত সাধন, তাহা বড়ই কঠিন, ইহাতে "আমার" "তোমার" জ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই, তাই যতদিন তোমার ঐরূপ ধারণা থাকিবে ততদিন মাত্র পৃথকভাবে চলিতে হইবে। নচেৎ আমাদের মধ্যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।"

এ কথায় উমেশ বুঝিলেন যে, স্নানের পর বস্ত্র পরিবর্ত্তনের সময় তাঁহার সত্যই এই "আমার" "তোমার" জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে। পরন্তু উমেশ ইহাও বুঝিলেন যে, বন্ধু ভবানীচরণের কথার কতদূর গভীর অর্থ, সুতরাং ঐকান্তিক সাধন দ্বারা এই আমিত্ব ভাব, উমেশ শীঘ্রই দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কুশদহ। (৫)

"বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, বঙ্গদেশ একসময় বঙ্গসাগরের অন্তর্গত ছিল। 'প্রমাণের জন্য লেখক গোবরডাঙ্গা, অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, কুশদ্বীপ প্রভৃতি জলময় স্থানবাচক শব্দের ও ভূগর্ভস্থ সমুদ্রজীবের কঙ্কালের

দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। বাস্তবিক "গোবরডাঙ্গা" এই নামটীর ডাঙ্গা শব্দ দ্বারা স্বতঃই এইভাব মনে উদিত হয়। কালসহকারে এই স্থান স্তর পড়িয়া মনুষ্যবাসের যোগ্য হইয়াছে। বঙ্গদেশকে এতদিন আমরা আরও বিস্তৃত দেখিতাম, যদি সুন্দরবনের দক্ষিণ সীমাস্থ সমুদ্রের তীরের পর অতলস্পর্শ না থাকিত।

বরিশালের কামান সম্বন্ধে অনেকে অবগত আছেন। অতিশয় বৃষ্টি কিম্বা ঝড়ের পর এই বরিশালের কামানের শব্দ গোবরডাঙ্গা হইতে সুস্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। বরিশালের কামানের বিবরণ এখানে লিখিলে বোধ করি অতিরঞ্জিত হইবে না।

বরিশালের কামানের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত। জনসাধারণের বিশ্বাস ঢাকার নবাব হোসেন সার সম্মানার্থে কোন অদৃশ্য হস্তদ্বারা এই কামানের শব্দ করা হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, বঙ্গদেশে শীঘ্রই একটী আগ্নেয় গিরির উৎপত্তি হইবে। সেইজন্য পৃথিবীর মধ্যে এইরূপ ভীষণ শব্দ হয়। আবার কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, সুন্দরবনের পরেই সমুদ্রের ধারে অতলস্পর্শ। ঝড় বা বৃষ্টির সময়ে সমুদ্রে যে তরঙ্গ উত্থিত হয় সেই তরঙ্গের আঘাতে বঙ্গদেশের তলদেশ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। সেই সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতের এই শব্দ গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান হইতে শ্রবণ করা যায়। বঙ্গদেশের তলদেশ ক্ষয় পাইতেছে যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে এই দেশ কালক্রমে বসিয়া "দ" পড়িয়া যাইতেও পারে। সুতরাং এই "দ" কুশদহ পরগণাকেও ছাড়িবে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ইহা সমুদ্র হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নয়।

গোবরডাঙ্গার পরিচয় দিবার পূর্ব্বে গোবরডাঙ্গা জমীদারদিগের পূর্ব্ববৃত্তান্ত লেখা উচিত, "গোবরডাঙ্গার জমীদারদিগের আদিপুরুষ শ্যামরাম মুখোপাধ্যায়। ইনি যশোহর জেলার অন্তর্গত সারষা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামরাম মুখোপাধ্যায় একদা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে ইছাপুরে আসিয়া "ন ঠাকুরের" বাড়ী অতিথি হন। গৃহস্বামী তাঁহার বিশেষ পরিচয়াদি লইয়া তাঁহার একটি কন্যার সহিত শ্যামরাম মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ দেন। তাঁহার অগ্রজ এই সংবাদ শুনিয়া শ্যামরামকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

তখন তিনি নিরুপায় হইয়া ঐ গ্রামে একটি গন্ধবণিকের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া ঐ বাটীতে পৃথক গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ জগন্নাথ, কনিষ্ঠ খেলারাম। এই খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অদৃষ্টশ্রী আজিও গোবরডাঙ্গার জমীদারদিগের অদৃষ্টকে উদ্ভাসিত রাখিয়াছে।

খেলারাম বাল্যকালে অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। যখন তাঁহার বয়স দশ বার বৎসর, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথ একদিন কোন কারণে তাঁহাকে তিরস্কার করায় তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া ইছাপুরে মাতুলালয়ে গমন করেন। তথায় কিছুদিন থাকিবার পর, একদা তাঁহার মামী ঠাকুরাণী কোন কারণবশতঃ তাঁহাকে বিশেষরূপে তিরস্কার করায় তিনি মনের দুঃখে সেই দিন বাটী হইতে বহির্গত হইয়া যশোহরের কালেক্‌টর মহোদয়ের সেরেস্তাদারের বাসায় গিয়া উপনীত হইলেন। সেখানে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া সেরেস্তাদারের পুত্রদিগের সহিত বাটীতে লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। কিছু লেখাপড়া শিখিয়া কালেক্‌টারির কাছারীতে সামান্য বেতনে মুহুরিগিরি চাকরী পাইলেন। কিছুদিন ঐ কার্য্য করিয়া এমন কার্য্যদক্ষ হইলেন যে, একদা সেরেস্তাদার মহাশয় পীড়িত হইলে অন্য কাহাকেও একটিনী না দিয়া খেলারামকেই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। খেলারাম সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কালেক্‌টর সাহেবও তাঁহার কার্য্যাদি দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে সেরেস্তাদার মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার ঐ কাজটী স্থায়ী হইয়া গেল।

কিছুদিন পরে কালেক্‌টর সাহেব কৃষ্ণনগরে বদলী হইলেন ও খেলারামকেও সঙ্গে আনিলেন, এবং খেলারাম যে পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই পদেই নিযুক্ত রহিলেন। একদা খাজানাদি অনাদায় বশতঃ গোবরডাঙ্গা নিলাম হইবার ঘোষণা হওয়ায়, উক্ত সাহেব খেলারামকে কহিলেন, "খেলারাম! গোবরডাঙ্গা গ্রাম নিলামে বিক্রয় হইবে, তুমি খরিদ করিবে কি?" ইহা শুনিয়া খেলারাম কহিলেন—"আমি সামান্য বেতনে চাকরী করিতেছি, আমার অর্থ নাই, আমি কি করিয়া জমীদারী খরিদ করিব?" ইহা শুনিয়া সাহেব মহোদয় তাঁহাকে বিনা সুদে টাকা কর্জ্জ দিতে চাহেন। তাহাতে খেলারাম বলেন "হিন্দুশাস্ত্রে

কথিত আছে 'ঋণের টাকার সুদ না লইলে ঐ টাকা দানের মধ্যে পরিগণিত হয়।' সুতরাং আমি বিনা সুদে টাকা লইতে পারিব না।" তাহাতে কালেক্টর সাহেব বলেন "আচ্ছা তুমি সামর্থ্যানুযায়ী সুদ দিও।" গোবরডাঙ্গা নিলামে খেলারামের হইল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে খেলারাম নিজ গ্রামে যাইয়া প্রথমে গন্ধবণিকের বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তৎপরে নিজের বাসভবন নির্ম্মাণ করান। কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথকে উক্ত নিজ বাসভবন ও তিন সহস্র মূল্যের সম্পত্তি প্রদান করেন। তিনি তৎপরে গোবরডাঙ্গায় আসিয়া ভট্টাচার্য্য পাড়ায় কাছারীবাটী প্রস্তুত করান। এবং মধ্যে মধ্যে ঐ কাছারীতে আসিয়া জমীদারীর কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি তখনও চাকরী পরিত্যাগ করেন নাই। তৎপরে যমুনানদী তীরে প্রকাণ্ড বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া আরও কিছুদিন কৃষ্ণনগরে ও মুরশিদাবাদে উক্ত পদে নিযুক্ত থাকিয়া কার্য্য করেন। তাহার পর তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গোবরডাঙ্গায় আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

খেলারামের জন্ম হইলে তাঁহার মাতামহ তাঁহাকে খাঁটুরার জমীদারীর দুই আনা অংশ যৌতুকস্বরূপ দান করেন সুতরাং প্রত্যেক প্রজার নিকট হইতে ঐ দুই আনা অংশ আদায় করা হইত। কালক্রমে অপর অংশীদারগণ খর্ব্ব হইলে সম্পূর্ণ স্বত্ব ঐ বংশেরই আয়ত্ত হইয়াছে।

এইরূপে অতুল বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজী ১৮১৭ সালে দেহত্যাগ করেন।" (কুশদ্বীপ কাহিনী)

(ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব "প্রভা" সম্পাদক।

মানবদেহে শৈত্যের ক্রিয়া।

স্নানের জন্য ৩২ হইতে ৬০ তাপাংশ জল ব্যবহার করিলে তাহাকে শীতল স্নান কহে। আমরা সুস্থ শরীরে প্রত্যহ শরীরের শৈত্য রক্ষণার্থ শীতল জলে স্নান করিয়া থাকি। শৈত্যকারক ব্যতীত মনুষ্য শরীরে শীতল

জলের আরো অনেক প্রকার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে শৈত্য প্রয়োগ করিলে ইহা উত্তাপহারক, প্রদাহনাশক, সঙ্কোচক, স্পর্শহারক, বলকারক, উত্তেজক এবং অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এই প্রবন্ধে মানবদেহে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে শৈত্য প্রয়োগ করিলে যে বিভিন্ন ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

শীতল স্নান দ্বারা দেহের উত্তাপ লাঘব হয়। টাইফাস্ (Typhus Fever), টাইফয়েড্ (Typhoid Fever), হাম ও অন্যান্য জ্বররোগে যখন দৈহিক উত্তাপ এত অধিক হয় যে, রোগীর জীবনাশা থাকে না, তখন উত্তাপ লাঘব করিতে শীতল স্নান সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। বিবিধ প্রকারে এই শীতল স্নান ব্যবহৃত হয়। যথা—শীতল জলে সম্পূর্ণ স্নান; শরীরে অধিক পরিমাণে শীতল জল সেচন; শীতল জলে বস্ত্র ভিজাইয়া তদ্দ্বারা শরীর আচ্ছাদন; শীতল জলে গামছা ভিজাইয়া তাহা দ্বারা গাত্রমার্জ্জন।

ডাক্তার রিঙ্গারের মতে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার দ্বারা শীঘ্রই দেহের উত্তাপাধিক্যের হ্রাস হয়। এই প্রক্রিয়া যেরূপ ফলপ্রদ তদ্রূপ সহজসাধ্য। বরফজলে চারিখানি বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া অল্প নিঙ্গড়াইয়া লইবে। হস্ত, পদ, বক্ষ, উদর প্রভৃতি অঙ্গ সকল ক্রমশঃ এক একখানি ভিজা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবৃত করিবে; অল্পক্ষণ পরে ঐ গুলি বরফজলে পুনরায় ভিজাইয়া, নিঙ্গড়াইয়া, যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করিবে। এইরূপে বারম্বার বস্ত্রখণ্ড পরিবর্ত্তন করিবে। এই উপায়ে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে শরীরের উত্তাপ ১০৬ হইতে ১০১ তাপাংশে বা তাহারও কম পর্য্যন্ত নামিয়া থাকে। আমাদের দেশে অনেকেই জ্বর অবস্থায় শীতল স্নান ব্যবস্থা করিতে ভয় করেন। তাঁহাদের ধারণা যে, ইহা দ্বারা শ্বাসনলী-প্রদাহ বা ফুস্ফুস্-প্রদাহ হইতে পারে। কিন্তু শীতল স্নানদ্বারা ঐরূপ ঘটনা অল্পই দৃষ্ট হয়।

বিবিধ বাহ্য-প্রদাহে শৈত্য দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ডাক্তার আর্ণট্ শত শত রোগীর প্রদাহিত স্থানে বরফ প্রদান করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। বাত, বসন্ত প্রভৃতি রোগে শরীরাভ্যন্তরস্থ অভ্যাগত বিষ, প্রদাহরূপে চর্ম্মপথে বাহির হয়। ইহাতে শৈত্য প্রয়োগ নিষিদ্ধ; কারণ চর্ম্মের প্রদাহ হঠাৎ নিবারণ করিলে উক্ত বিষ অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদিতে প্রবেশ করিয়া অনিষ্টসাধন করিতে পারে।

তাপপ্রদানে যেরূপ সমস্ত ভৌতিক পদার্থের কলেবর সম্প্রসারিত হয়, শৈত্য সংলগ্নে সেইরূপ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। শরীরের কোন স্থানে শৈত্য সংলগ্ন করিলে সেই স্থানের সঙ্কোচন হয়। সকলেই দেখিয়াছেন, অবগাহন করিবার সময় অধিকক্ষণ জলে থাকিলে হস্তপদাদির চর্ম্ম কুঞ্চিত হয়। বিবিধ রক্তস্রাবে রক্তরোধ করিতে শৈত্য প্রদানই প্রধান ঔষধ। ইহার কারণ এই যে, শৈত্যস্থানীয় পরমাণু সকলের নৈকট্য বৃদ্ধি করে ও রক্তকে সংযত করে। অস্ত্রোপচার করিবার পর রক্ত রোধার্থ সকল অস্ত্রচিকিৎসকই শীতল জল ব্যবহার করেন। দন্তমূল বা মুখাভ্যন্তর হইতে রক্তস্রাব হইলে বরফখণ্ড মুখে রাখিলে রক্তরোধ হয়। নাসিকা হইতে রক্তপাতে শীতল নস্যগ্রহণে প্রতীকার হয়। আভ্যন্তরিক রক্তস্রাবেও শৈত্যের দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। রক্তবমন রোগে বরফ খাইলে সুফল দর্শে। প্রসবান্তে রক্তস্রাব হইলে যথেষ্ট বরফ খাইতে দিলে এবং নিম্নোদরে শীতল জলধারা প্রদান করিলে জরায়ু সঙ্কুচিত হইয়া রক্তস্রাব নিবারণ হয়। প্রসবে বিলম্ব ঘটিলে, প্রসবান্তে ফল নির্গত না হইলে, অথবা গর্ভপাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে যথেষ্ট পরিমাণে বরফ খাওয়াইলে সুফল পাওয়া যায়। রক্তাধিক্য রোগে শৈত্য মহোপকারক। ইহার সঙ্কোচন গুণবশতঃ রক্তাধিক্য নিবারিত হয়। শিশুদিগের কন্‌ভাল্‌সন্‌ (Convulsion) রোগে মস্তকে শীতল জল প্রদান করিলে বিশেষ উপকার হয়। উন্মাদ রোগীর মস্তকে বরফপূর্ণ থলি রাখিয়া দিলে দৌরাত্ম্য ও অস্থিরতা নিবারণ হইয়া সুনিদ্রা হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ; (ডাক্তার) গোবরডাঙ্গা।

হিমালয় ভ্রমণ। (৭)

ঋষিকেশ।

আমরা ৬টার সময় কংখল হইতে ৭ মাইল পথ চলিয়া যখন লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দিরে আসিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। এখানে আসিয়া দেখি, বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ৪ জন বাঙালী, খোল করতাল যোগে কীর্ত্তন গাইতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা তথাকার লোকে বুঝিতেছে না, তথাপি বোধ হয় ভাবের আকর্ষণে

শ্রবণ করিতেছে। আমরা মন্দিরে কিছু ভোজ্য (বোধহয় খিচুড়ী) পাইয়া ভোজনান্তে পাকা ঘরের বারেন্দায় শয়ন করিয়া আনন্দচিত্তে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। আরও অনেক যাত্রি তথায় ছিল। আমার একখানি কম্বল থাকা সত্ত্বেও পূর্ণানন্দ স্বামী এবং শিবানন্দ স্বামী একটু বিস্তৃত ভাবে শয্যা করিয়া তাহার মধ্যে আমাকে লইলেন। আমরা তিনজনে একত্রে শয়ন করিলাম। ইহাতে আমার প্রতি তাঁহাদের যত্নের ভাব বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল।

১৭ই কার্ত্তিক শনিবার প্রাতে যাত্রাকালে বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "রাত্রে আপনাদিগকে বাঙালী বলিয়া বুঝিতে পারি নাই, আমরাও ঋষিকেশ যাইব, আপনাদের সঙ্গী হইতে ইচ্ছা করি। আমরা তথাকার অবস্থা অবগত নহি।" সাধুরা বলিলেন, "চলুন, ভাবনা কি ?"

প্রাতে আমরা সকলে মিলিয়া যাত্রা করিলাম। স্বচ্ছন্দে, আনন্দ মনে বেলা ১০টার মধ্যে ঋষিকেশ পৌঁছিলাম। হরিদ্বার হইতেই উচ্চ নীচ অসম পথে পর্ব্বতোপরি ক্রমেই আরোহণ এবং মধ্যে মধ্যে ঝরনার স্রোত অতিক্রম করিয়া আসিতে আসিতে দূর হইতেই উন্নত গিরির গম্ভীর দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ স্তব্ধ ও শান্তিযুক্ত হইতেছিল। এখন একেবারে উন্নত শিখর-পাদমূলের নিকটস্থ হইয়া আরো গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি হইতে লাগিল। আমরা প্রথমে গঙ্গাতীরস্থ একটী দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। একটু পরে গঙ্গায় স্নান করিয়া ছত্রে মাধুকরী করিলাম। গঙ্গার জল দেখিয়া যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল, ততোধিক স্নানাবগাহণে হইল। সেই সুনির্ম্মল সুশীতল সলিলরাশিতে নিমগ্ন হইয়া যেমন শরীর শীতল হইল, তেমনি মনও প্রফুল্ল ও পবিত্রযুক্ত হইল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত বারি আলোড়ন, স্পর্শসুখানুভব করিতে করিতে সাধকের সেই সঙ্গীতের ভাব আমার মনে আসিল, "কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি," সত্যই যিনি জলের এমন শৈত্য ও নির্ম্মলতা প্রদান করিয়াছেন তাঁহাকে তখন স্পষ্ট উপলব্ধি হইল।

ছত্রে পক্কান্ন (রুটী, দাউল, বা খিচুড়ী) সাধারণতঃ পরমহংসদিগের জন্ম, এবং ব্রহ্মচারী বা বৈষ্ণবদিগের জন্য আটা, দাউল, ঘৃত কাঁচা দ্রব্য প্রদত্ত হয়। আমাদের সঙ্গী বৈষ্ণবগণের জন্যও সেই ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা রুটী প্রস্তুতের অসুবিধা বশতঃ শিবানন্দ স্বামীর দ্বারা অনুরোধ করিয়া

তবে মাধুকরী পাইয়াছিলেন। আমরা আপাততঃ ছত্রের একটী ঘরে তিন জনে আশ্রয় লইলাম, আর একটী ঘরে বৈষ্ণবগণ রহিলেন। তখন ছত্রে যথেষ্ট ঘর খালি ছিল, সাধুরা প্রায় ছত্রে থাকেন না, যাত্রিগণ ছত্রে থাকে।

স্বামীজিদিগের সঙ্গে একঘরে একাসনে অবস্থিতিকালে আমার প্রতি তাঁহাদের সস্নেহভাব দেখিয়া মনে হইল, এমন স্নেহ এবং যত্ন সাংসারিক সম্পর্কে মেলে না। তাঁহাদের জীবন যে অপরের আনন্দদানের জন্য তাহা বোধ হইল। তাহাতে মায়ার গন্ধ মাত্র নাই, কে কোথাকার মানুষ এখনি হয়তো আমরা কে কোথায় চলিয়া যাইব।

বিশ্রামাদির পর অপরাহ্নে, আমরা গঙ্গাতীরস্থ সাধুদিগের আশ্রম সকল সাধারণভাবে দেখিয়া বেড়াইয়া আসিলাম। সন্ধ্যার পর বৈষ্ণব বাবাজীরা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তখন পূর্ণানন্দ স্বামী আনন্দে বাল্যভাব প্রকাশ করিতেছিলেন। খোল করতালের শব্দ শুনিয়া কতকগুলি নরনারী বালকবালিকা উপস্থিত হইল, কিন্তু বোধহয় কোন রসাস্বাদন করিতে না পারিয়া কিছুক্ষণের মধ্যে প্রায় সকলেই চলিয়া গেল। ছত্রে একবেলা ভিক্ষা পাওয়া যায়, এবং সাধুগণ সাধারণতঃ একবার আহারেই অভ্যস্থ।

১৮ই রবিবার প্রাতে ও মধ্যাহ্নের কার্য্য যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়া আমরা ৩টার পর "লছমনঝুলা" দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। পূর্ব্ববৎ ক্রমোচ্চ অসম পথে ৩ মাইল চলিয়া যেস্থানে গঙ্গোত্রি, বদারিকাশ্রম, ও কেদারনাথ প্রভৃতি গমণের পথে গঙ্গার পশ্চিমপার হইতে পূর্ব্বপারে আসিতে সেতু পার হইতে হয়, ঐ সেতুর নামই "লছমনঝুলা"। শুনিলাম এই সেতু পূর্ব্বে সুদৃঢ় না থাকায় কত লোকের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট হইতে উত্তম লৌহ সেতু নির্ম্মিত হইয়া যাত্রিগণের যাতায়াত কেমন সুগম, নিরাপদজনক হইয়াছে। এই সেতু বৃহৎ নহে, কেননা এখানে গঙ্গার বিস্তৃতি আদৌ নাই, কিন্তু অপেক্ষাকৃত গভীরতা এবং উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের উচ্চতাবশতঃ দৃশ্যটী অত্যন্ত ভয়ানক বোধহয়। গঙ্গার উভয় কূলের উন্নত পর্ব্বত-গাত্র হইতে সেতু সংলগ্ন হইয়াছে, মাঝখানে অতি নিম্নে গঙ্গা সুতরাং তাহাতে অত্যন্ত গুরু-গম্ভীরভাব অনুমিত হইতে লাগিল। হরিদ্বার হইতে মনে করিয়াছিলাম লছমনঝুলায় গিয়া "গঙ্গোত্রি" বা "গোমুখী গঙ্গার" দৃশ্য আরও দৃষ্ট হইবে,

কিন্তু এখানে উন্নত শিখারাচ্ছন্নতার মধ্যে আর কোন দূরস্থ দৃশ্য দৃষ্টই হয় না। অতি আনন্দচিত্তে, এক অনির্ব্বচনীয় চিন্তাযুক্ত মনে আমি সেতুমূলের একস্থানে বসিয়া রহিলাম, আর সকলে ইতস্ততঃ আশ্রমাদি দেখিয়া আসিলেন। তৎপরে যখন আমরা ঋষিকেশের ছত্রে ফিরিয়া আসিলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটী যুবক ছিলেন। ইনি অবস্থাপন্ন ভদ্রঘরের সন্তান, বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় বৃন্দাবনে থাকেন। বয়স ত্রিশের বেশী বোধ হয় না। তাঁহার ত্যাগ, নিষ্ঠা, বিনয় এবং ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া তাঁহাকে আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তিনি সারল্যে আমাকে এমন মুগ্ধ করিয়াছিলেন, যে আমি দেশে ফিরিবার কালে বৃন্দাবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আসিতে পারি নাই। ১৯শে প্রাতেই বাবাজীরা আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন।

স্বামীজিদিগের সহিত আমার ধর্ম্মালোচনা পূর্ব্বমত নিয়তই চলিয়া আসিতেছে। আজ রাত্রে শিবানন্দ স্বামী যাহা বলিলেন, তাহার সার এইরূপ,—"পরমাত্মায় ও জীবাত্মায় কোন ভেদ নাই, অজ্ঞানী আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। অজ্ঞানতা দূর হইলেই, ঐ অভেদ ভাব বুঝিতে পারা যায়।" আলোচনার দ্বারা তাঁহাদের ভাব বুঝিবার জন্য স্বভাবতঃ আমি যাহা কিছু বলিয়াছিলাম তাহার সার এইরূপ, পরমাত্মা ও জীবাত্মায়, জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছাতে স্বরূপগত এক, কিন্তু ব্যক্তিত্বে (Personality) ভিন্ন। পুত্র জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে পিতার মধ্যে একাত্ম রূপেই ছিল, তারপর জন্ম জন্য উপাধি ভিন্ন হইল। ফলতঃ জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেও পিতার মধ্যে বীজাকারে বা সম্ভাবনা রূপেও ভিন্নতা ছিল, নতুবা জন্ম সম্ভব হইত না। জীবাত্মা অপূর্ণ, পরমাত্মাপূর্ণ, তথাপি তাঁহার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনতিক্রমনীয় নিয়মে, ও অপার করুণায়,—সাধন দ্বারা, জীবাত্মা পূর্ণতা লাভ করে। পূর্ণতালাভের কোন শেষ অবস্থা স্বীকার করা যাইতে পারে না, কেননা, পূর্ণ, অসীম, সুতরাং পূর্ণতালাভ অর্থে অনন্ত উন্নতি। ইচ্ছা যোগে জীবাত্মা পরমাত্মার জ্ঞান, প্রেমাদি লাভ করিয়া পূর্ণভাবাপন্ন হয়। পূর্ণভাব হইলে কামনা রহিত ভাব উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন কামনা থাকে না, তখনও কর্ম্ম থাকে ; লোকহিতার্থে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম হয়। আমাদের আজকার প্রসঙ্গ পূর্ণানন্দ

স্বামী স্থিরভাবে কেবল শুনিয়াছিলেন। তিনি ইহার মধ্যে তেমন কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু ইহাতে যেন তাঁহার বিশেষ আনন্দের ভাব দেখা গেল।

এই আলোচনার পর প্রসন্নচিত্তে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল। রাত্রি শেষে যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন চিত্ত একান্ত শান্ত, কি যেন এক সুখস্পর্শ প্রাণে অনুমিত হইতেছিল। নিস্তব্ধে কিছুক্ষণ উপাসনার ভাবে কাটিয়া গেল। তারপর স্বামীজিরাও জাগিয়া উঠিলেন ও প্রভাত হইল।

(ক্রমশঃ)

তাম্বুলী সমাজ।

খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, বরাহনগর-বাসী কুশদহ তাম্বুলী শ্রেণীর সকলেই বোধ-হয় বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন যে, দিন দিন তাঁহাদের কন্যার বিবাহের পথ কেমন সঙ্কট হইতে সঙ্কটতর হইয়া আসিতেছে। ভাল পাত্র তো মেলেই না, কাজেই অপেক্ষাকৃত বাছিয়া গোছাইয়া যতদূর পাওয়া যায় তাহা হস্তগত করিতে সকলেই ব্যস্ত। এই ব্যস্ততা ও তাহার মূলভাব হইতে যে অনিষ্ট হইতেছে, তাহা হয় ত অনেকে বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না, অথবা কাজে কিছুই করিতে পারিতেছেন না। এই সম্বন্ধে দুই এক কথা বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পুত্র, কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ যে কিরূপ অনিষ্টকর তাহা ঐ ব্যস্ততা প্রযুক্ত চিন্তা করিয়া কার্য্য করিবার অবসর হয় না। তৎপরে যাঁহারা পুত্রের কিছু শিক্ষা দানে সক্ষম এবং ইচ্ছুক, তাঁহারাও ঐ ব্যস্ততার তাড়নায় এবং প্রলোভনে পড়িয়া অধিক কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। সুতরাং ঐ ব্যস্ততার ভাব যাহাতে খর্ব্ব হয়, তাহার প্রতিকার করা প্রথম কর্ত্তব্য।

শিক্ষার বিস্তারেই যে সামাজিক উন্নতির দ্বার খুলিয়া যাইতেছে,—শিক্ষিত যুবকবৃন্দই যে ভবিষ্যতের আশা, এ কথা সত্য হইলেও—কেবল বালকের শিক্ষার দ্বারা সে উন্নতি প্রকৃত এবং স্থায়ী হইতে পারে না, যে পর্য্যন্ত বালিকাগণেরও শিক্ষার ব্যবস্থা না করা হইতেছে। শিক্ষা অর্থে, এখানে ভাষা জ্ঞানের নির্দ্দেশ করা হইতেছে; কেন না তদ্দ্বারা বুদ্ধি, নীতি এবং জ্ঞান বিকাশেরও যে সাহায্য

হইতে পারে, তাহা কি অস্বীকার করা যায়? ইহার শিক্ষাই প্রাথমিক সরল, সহজ পথ। বালিকার শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভূত হইলে বালিকার বিবাহের অপকারিতার বিষয় কিছু কিছু লক্ষ্য পড়িবে। কেহ কেহ বলেন, বালকগণ বিবাহে অনিচ্ছুক হইয়া যাহাতে শিক্ষানুরাগী হয় সেই উপায় করাই বিহিত। ইহা সত্য হইলেও বালিকাগণের শিক্ষা ও বিবাহের কাল বৃদ্ধি না করিতে না পারিলে প্রথম চেষ্টা সফল হওয়া সম্ভব নহে। বালিকার বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করিতে সাহসী হইলে, পিতা মাতার উৎকণ্ঠা, অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিবে; তখন বালকের বিবাহের বয়সও সহজে বাড়িয়া চলিবে। অতএব সমাজকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইলে বালিকার শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যতের ভাল মা প্রস্তুত করিবার পথ পরিষ্কার করিতে হইবে। তখন আর তত কষ্ট করিতে হইবে না। ভাল মা হইলে সকল উন্নতি সাধন সহজ হয়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রই বা কি বলেন;—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক। এই শাস্ত্রবাক্যই বা সকলে কেন ভুলিয়া যাইতেছেন?

স্থানীয় সংবাদ।

আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে খাটুরানিবাসী শ্রীযুক্ত রামকল্প আশ মহাশয়ের পরলোক গমন সংবাদ পত্রিকাস্থ করিতেছি। ইনি স্বর্গীয় মঙ্গলচন্দ্র আশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং স্বর্গীয় লক্ষণচন্দ্র আশের খুল্যতাত ছিলেন। এই আশ বংশ সাধারণতঃ শান্ত নিরীহ স্বভাব। রামকল্প আশ মহাশয়ের বয়স প্রায় আশীতি-বর্ষ হইয়াছিল। ইনি বাতরোগে অনেকদিন হইতে শয্যাগত হইয়াছিলেন। উত্তরকালে পুত্রদ্বয়ের মধ্যে, যাহাতে বিষয় সম্পত্তি লইয়া বিবাদ না ঘটে তজ্জন্য তিনি জীবিত কালেই তাহা বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার শান্ত ধীর প্রকৃতির মধ্যে ধর্ম্মভাব ছিল। ধর্ম্ম প্রসঙ্গে এবং ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তনাদি শ্রবণে তাঁহার অনুরাগ চিরদিন অক্ষুণ্ণ দেখা গিয়াছে। গোপনে সাত্ত্বিকভাবে দান ধর্ম্মও এই

বংশের স্বাভাবিক ভাব। তাঁহাতে সে ভাবেরও অভাব ছিল না। বিগত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ কলিকাতার বেলেটোলাস্থ স্বীয় ভবনে, তাঁহার শান্তিপ্রিয় আত্মা নশ্বর দেহের মমতা এবং সকল আত্মীয়ের আত্মীয়তা ছাড়িয়া, যিনি আত্মীয় হইতেও পরমাত্মীয় তাঁহার আহ্বান পূর্ণ করিলেন। এখন তাঁহার জন্য দুঃখ করিবার আর কি আছে? পরন্তু তাঁহার পুত্রগণ পৈতৃক গুণের অধিকারী হইয়া মনুষ্যত্ব উপার্জ্জনে সক্ষম হউন, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় গোবরডাঙ্গা হাইস্কুল হইতে কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় ও বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুল হইতে হরিনারায়ণ রক্ষিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এবং ঢাকা ইডেন ফিমেল স্কুল হইতে শরৎবালা রক্ষিত দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছে। শ্রীমান্ কিশোরীমোহন, গোবরডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য পাড়ার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র, শ্রীমান্ হরিনারাণ, বরাহনগরবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের পুত্র। কুমারী শরৎবালা, খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজের স্বর্গীয় ডাক্তার গনেশচন্দ্র রক্ষিতের কন্যা। ভগবান এই বালক বালিকাগণের জীবনে শিক্ষার সুফল দান করুন।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী প্রমুখ খ্যাতনামা দেশহিতৈষী মহোদয়গণ, "হিন্দু ম্যারেজ রিফরম্ লীগ্" অর্থাৎ "হিন্দু বিবাহ সংস্কার সভা" হইতে জাতীয় সভা সমিতি সকলের সহিত তাম্বুলী সমাজের মত চাহিয়াছেন যে, আপনারা এই সমিতির সহিত যোগ দিয়া পুত্র কন্যার বিবাহের বয়স কত নির্দ্ধারিত করিবেন তাহা স্থির করুন। তাম্বুলী সমাজের পক্ষে ইহা একটী শুভযোগ বলিতে হইবে। উক্ত সমাজের হিতৈষী কর্ত্তৃপক্ষগণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সমাজের ন্যায় পুত্রকন্যার শিক্ষাবিস্তার ও বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করিয়া এবং তাম্বুলী সমাজের বিভিন্ন মেলে বিবাহের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে ক্রমে সমাজ সংস্কার করিতে পারেন।

শারীরিক অসুস্থাদিতে "কুশদহ" বৈশাখসংখ্যা বাহির হইতে বিলম্ব হওয়ায় দুঃখিত হইয়া গ্রাহকগণের নিকট ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। (কুঃ সঃ)

Printed by J. N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

সূচী ও নিয়মাবলী ভিতরে দেখুন।

দ্বিতীয় বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। [৮ম সংখ্যা।



খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়

সম্বলিত, ধর্ম্ম, সমাজ ও

বিবিধ বিষয়ক

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

কুশদহ-কার্য্যালয়

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১।০ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য /১০ পয়সা

২য় বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। [৮ম সংখ্যা।

দাসের আক্ষেপ ও প্রার্থনা।

"তোমার কথা হেথা কেহত বলে না, করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে শুধু হলাহল।"—(রবীন্দ্রনাথ)

হে প্রভু পরমেশ্বর! চারিদিকে নরনারীর দশা কেন এমন হইল? শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জন্ম, যাহা কেবল তোমারই জন্য, যে মানব তোমাকে জানিয়া, আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শোক দুঃখ মৃত্যুর অতীত হইবে; সদানন্দে তোমার কাজ করিয়া আরো আনন্দিত হইবে, সেই মানব-সাধারণ-নরনারী আমিত্ব প্রাধান্যে শরীরকে "আমি" এবং সাংসারিক পদার্থ "আমার" এই জ্ঞানে বদ্ধ হইয়া কেন এমন দুঃখের অধীন হইল? প্রভু! তুমি কেবল মানবাত্মাকেই আত্মজ্ঞান দান করিয়াছ, তাই মানুষ আত্মবোধে সক্ষম, তাই মানুষ আপনাকে আপনি বুঝিতে পারে। কিন্তু জড়পদার্থের আত্মবোধ নাই, জড় আপনাকে আপনি জানে না, সে তোমাকেও জানিতে পারেনা। শরীর, মন, আত্মা এই তিনের সমষ্টি মানব। স্থূলদর্শী, "দেহাত্মবুদ্ধি"তে প্রথমে শরীরকেই "আমি" বোধ করে। এই অবস্থার মানুষে কেবল আহার নিদ্রাদি শরীর-চেষ্টাই প্রধান লক্ষণ লক্ষিত হয়। তাহা অপেক্ষা উন্নত মানুষ, মনকে আমি বোধ করে। এ অবস্থায় বুদ্ধির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। তৎপরে উন্নত আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষ আত্মা এবং হে পরমাত্মা! তোমার ভাব বুঝিতে সক্ষম হয়। প্রভু! আমরা যে ভারতীয় আর্য্যঋষিদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এ কথা কেন ভুলিব? আমরা তাঁহাদিগের এবং জগতের সকল সাধু মহাজনগণের পদানুসরণ করিয়া যাহাতে সারধন "আত্মজ্ঞান" বা "ব্রহ্মজ্ঞান" লাভ করিতে পারি, যাহাতে সকলে তোমাকে জানিতে পারে তুমি আমাদিগকে এমত আশীর্ব্বাদ কর।

অন্বেষণ।

দিনের শেষে সন্ধ্যা যবে
নাম্‌ল ধীরে ধীরে,
আমি তখন বসে ছিনু
শূন্য নদীর তীরে।

হতাশ-মনে হতাশ প্রাণে
সুদূরে ওই আকাশ পানে
নয়ন রেখে মনের দুখে
ভাস্‌ছি আঁখি নীরে!

এম্‌নি সময় মধুর সুরে
বাজ্‌ল বাঁশী কার ?
মধুর রবে ঝঙ্কারিয়া
উঠ্‌ল চারি ধার !
আমি তখন নয়ন মেলে
নয়নের জল মুছে ফেলে
নদীর পারে বনের ধারে
দেখ্‌নু বারেবার !

তুমি সখা লুকিয়ে গেলে—
তবুও বাঁশী বাজে !
খুঁজে খুঁজে হ'লেম সারা—
সারা বনের মাঝে !

পেলাম না'ক তোমার দেখা,
কপালে এই ছিলরে লেখা—
ঘরের পানে আকুল প্রাণে
ফিরিনু ভরা সাঁঝে !

এম্‌নি ক'রে খুঁজে খুঁজে
নিরাশ হ'য়ে যাই !
অর্ঘ্য দিতে তোমার পায়ে
আমার কিছু নাই !
আঁখি-ঝারি ভাসিয়ে দিয়ে
ভাঙা বুকের ব্যথা নিয়ে,
তোমার সনে মিল্‌ব কবে
ভাব্‌ছি বসে' তাই !

শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

শাস্ত্র সঙ্কলন।

৪৩। সর্ব্বশক্তিরন্তরাত্মা সর্চ্চভাবান্তরস্থিতঃ।
অদ্বিতীয়শ্চিদিত্যন্তর্থঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

যোগবাশিষ্ঠ ১৩।১১

যে ব্যক্তি তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ অন্তরাত্মাস্বরূপ ও সর্ব্বান্তর্গত অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপ জানিয়া স্বীয় অন্তরে দর্শন করেন, তিনিই তাঁহার দর্শন পান।

৪৪। অন্তঃসংত্যক্তসর্বাশো বীতরাগো বিবাসনঃ।
বহিঃসবর্বসমাচারো লোকে বিহর রাঘব ! ॥

য়োগ ১৯।৫২

হে রাঘব, হৃদয়ে সকল আশা পরিত্যাগ করিয়া বিরাগী ও বাসনাশূন্য হইয়া, বাহিরে তাবৎ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক সংসারে বিচরণ কর।

৪৫। অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা ক্ষুদ্রচেতসাম্।
উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

যোগ ১৯।৫৩

ইনি বন্ধু, ইনি পর, ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিরাই এ গণনা করে, কিন্তু উদারচিত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে জগতের সকলেই আত্মীয়।

৪৬। গৃহমেব গৃহস্থানাং সুসমাহিতচেতসাম্।
শান্তাহঙ্কৃতিদোষাণাং বিজনা বনভূময়ঃ॥

যোগ ১৪।২০

সুসমাহিতচিত্ত এবং অহঙ্কার-দোষ-বিবর্জ্জিত গৃহস্থের গৃহই বিজন বনভূমি।

৪৭। অন্তর্মুখমনা নিত্যং সুপ্তো বুদ্ধো ব্রজন্ পঠন।
পুরং জনপদং গ্রামমরণ্যমিব পশ্যতি॥

যোগ ২৪।২২

যাঁহার মুখ অন্তর্মুখীন হইয়াছে, তিনি নিদ্রিত হউন, জাগ্রত থাকুন, গমনই করুন, অধ্যয়নই করুন ; পুর, জনপদ, গ্রাম, অরণ্যের ন্যায় দর্শন করেন।

৪৮। অসক্তং নির্ম্মলং চিত্তং মুক্তং সংসার্য্যপি স্ফুটম্।
সক্তন্তু দীর্ঘতপসা মুক্তমপ্যতিবন্ধবৎ।

যোগ ২৬।৩

অনাসক্ত শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সংসারী হইলেও মুক্ত, আর বিষয়াসক্ত ব্যক্তি দীর্ঘকাল তপস্যা করিলেও মায়াবদ্ধ।

৪৯। আক্রুষ্টস্তাড়িতঃ ক্রুদ্ধঃ ক্ষমতে যো বলীয়সঃ।
যশ্চ নিত্যং জিতক্রোধো বিদ্বানুত্তমপুরুষঃ॥

মহাভারত বনপর্ব্ব ২৯।৩৩

যিনি বলবান্ ব্যক্তি কর্তৃক তিরস্কৃত ও তাড়িত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেও ক্ষমা করেন এবং যিনি নিত্য ক্রোধকে জয় করিয়াছেন, তিনিই জ্ঞানী ও উত্তম পুরুষ।

(ক্রমশঃ)

পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস।

বৈশাখের কুশদহতে পুনর্জ্জন্মবাদ প্রবন্ধের শেষে "অপর পক্ষ বারান্তরে আলোচ্য" যে প্রতিজ্ঞা ছিল, এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সম্যক্ আলোচনায় সুদীর্ঘ প্রবন্ধের স্থানাভাব বশতঃ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে বলিতে চেষ্টা করা হইল। এ প্রবন্ধ পুনর্জ্জন্মবাদের প্রতিবাদ মূলক নহে। এজন্য ইহার নাম "পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস," দেওয়া হইল। মত বিশ্বাসগুলি আমার হইলেও প্রকৃতপক্ষে "আমাদের" বলা যায়। কেন না, ইহা কেবল ব্যক্তিগত জীবনের আলোক নহে। ইহার পশ্চাতে অনেক উচ্চ সাধকগণের আবির্ভাব রহিয়াছে এবং প্রাচীন শাস্ত্র ও সাধকের ভাবও যে কিছু নাই তাহাও বলা যায় না। তবে "আমাদের" বিশ্বাস বলিলে একটী সম্প্রদায়ের বা মণ্ডলীর বুঝায়, ফলতঃ দেখা যায় এক সম্প্রদায়ের বা মণ্ডলীর মধ্যেও এ বিষয় বিশ্বাসের ভিন্নতা আছে। এজন্য "আমার" বিশ্বাস বলাই নিরাপদ বিবেচিত হইল। অন্যথা ব্যক্তিগত 'আমিত্ব' প্রচার করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। পরন্তু সত্যের একটী কণাও পরিত্যাজ্য বা অহিতকারী নহে।

আমার এই অর্দ্ধ শতাব্দীর জীবনকালে বিশেষতঃ বিগত পঞ্চবিংশতি বর্ষ মধ্যে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ অনুভব করিয়া, তাঁহার যে সকল করুণার পরিচয় পাইয়াছি ;—বিবেক, বিশ্বাসের পথ পাইয়াও আবার কি জানি কেন, সময় সময় যে দিকে যাইতে চাহিয়াছিলাম, তাহার ভিতর হইতেও যদি তিনি মঙ্গলে পরিণত না করিতেন, তবে কেবল আমার বুদ্ধি ও সাধন বলে আজ শান্তির পথ লাভ করা কখন সম্ভবপর হইত না। এইরূপে তাঁহার নিগূঢ় করুণার যাহা কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া আমার ধর্ম্মবিশ্বাসের অন্তর্গত পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার হইয়াছে, যে মৃত্যুর পর আর এইরূপ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহে এই জগতে আমার জন্ম হইবে না। কেবল বিশ্বাসের কথা তত প্রামাণ্য নহে, সুতরাং ইহার মধ্যে জ্ঞানগত এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি না ক্রমে তাহা প্রদর্শন করিব।

মৃত্যুর পর এই দেহ এবং জাগতিক অবস্থার সহিত আমার আত্মার যে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিল তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। সুতরাং তৎপরবর্ত্তী অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হওয়া আবশ্যক। সে কিরূপ ভিন্নতা সম্ভব্য তাহা প্রথমে আলোচ্য।

অনিত্য দেহ এইখানে গেল, অমর আত্মা রহিল, (কিরূপে রহিল তাহা পরক্ষণেই প্রকাশ পাইবে) আত্মা জ্ঞানবস্তু,—ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন, সুতরাং তাহা অশেষ, আত্মজ্ঞান, ইচ্ছাশক্তির শেষ হইল বলা একেবারেই অসম্ভব, পরন্তু আত্মার উন্নতি চাই। উন্নতিও সাধন ব্যতীত লব্ধ নহে। দেহ ভিন্ন সাধন কিরূপে সম্ভব? যাহা কেবল আত্মা তাহা পরমাত্মা। সর্ব্বকালে জীবাত্মা পরমাত্মার আশ্রিত। যখন স্থূল দেহধারী হইয়া আত্মা থাকে, তখন দেহকে আশ্রয় করিয়া আত্মা থাকে না, কিন্তু আত্মশক্তির আশ্রয়ে দেহ বর্ত্তমান থাকে। আত্মা পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। পরমাত্মা পূর্ণ, যিনি পূর্ণ তাঁহার সাধনের প্রয়োজন নাই। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ স্বরূপ হইলেও জীবাত্মা অপূর্ণ, অপূর্ণ পূর্ণতাকে চায়, এই আকাঙ্ক্ষার অবস্থার নাম সাধনকাল। পূর্ণ বস্তু এক অদ্বিতীয়, দুইটী পূর্ণ হয় না। অপূর্ণ সসীম, দেশকালের অধীন। যদি বল অদেহী আত্মা দেশ কালের অধীন হইবে কেন? দেহই ত দেশ কালের অধীন! তাহার উত্তর এই যে, জীবাত্মা স্থূল দেহে অবস্থান করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে আরম্ভ করে, এজন্য দেশকালের সংস্কার তাহার থাকে। পূর্ণজ্ঞান দেশ কালকে জানেন, কিন্তু দেশকালে বদ্ধ নহেন। ফলতঃ সাধনাবস্থায় দেহ, জগত বা জগমণ্ডলী, অর্থাৎ আমার ন্যায় দেহধারী আরো বহুজীবের বিগুমানতা আবশ্যক।

এই পাঞ্চভৌতিক দেহ গেলে আর দেহ থাকে না ইহা কে বলিল? দেহ ত একটী নয়। "স্থূল", "সূক্ষ্ম" এবং "কারণ" শরীর বা আরও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম দেহ যে কত আছে তাহা বলা সহজ সাধ্য নহে। কেবল তাহা নয়, এ জগতে যত আত্মার সহিত সংযোগ এবং বিয়োগ ঘটিয়াছে তাহারও পূর্ণতাসাধন চাই। এ জগতে কতটুকু উন্নতি হয়? সাধু মহাত্মাদিগের সহিত বা আত্মীয় সম্বন্ধে যে সকল আত্মার সহিত এ জগতে সংযোগ মাত্র হইয়াছিল যাহা কত অতৃপ্তভাবে বিচ্ছেদ হইয়াছে যাহা কেবল মোহাচ্ছন্ন ভাবে অবসান হইয়াছে তাহার সম্বন্ধ পবিত্র এবং পূর্ণতা সাধন কি হইবে না?

উন্নতিসাধন যদি কেবল এই জরা মরণশীল জগতেই বার বার ঘুরিয়া সাধন করিতে হয়, তবে ক্রমোন্নতির অর্থ পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না। এজন্য ক্রমোন্নতি অর্থে দেহ, মন, আত্মার সকল প্রকারেই উন্নতিশীলতার অবস্থা আবশ্যক। পক্ষান্তরে ভগবানের অপার করুণায় ইহার কিছুই অসম্ভব মনে

হয় না। ক্রমোন্নতির জগত, এ জগতের ন্যায় ক্ষুধাতৃষ্ণা জরা মরণশীল হইবে কিম্বা তথায় আত্মার সম্বন্ধ পার্থিব ভাবে বদ্ধ থাকিবে ইহাও বলা যায় না। কিন্তু প্রত্যেক আত্মায় আত্মায় পবিত্র ঈশ্বরীয় সম্বন্ধই অনুভূত হইবে। পক্ষান্তরে এই জগতে ক্ষুধাতৃষ্ণা, জরা ব্যাধিশীল, ভৌতিক দেহে, বার বার জন্ম মরণরূপ চক্রে পরিবর্ত্তন,—একই বাল্য যৌবনাদি অবস্থায় বার বার পুনরুক্তির লীলা; এজগতে যে সকল পরীক্ষা অনিবার্য্য, বার বার তাহার মধ্যেই পড়িতে হইবে, এসকল স্বাভাবিক বোধহয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবৎ লীলায় কথিত আছে "ভগবান পুনঃ পুনঃ একই লীলা করেন (বা করান) না,—বৃন্দাবন পরিত্যাগের পর আর বৃন্দাবনে আসেন নাই।" যাহা হউক হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মতত্ত্বে "মুক্তিতত্ত্বে" বা "যোগতত্ত্বে" মুক্তাত্মার স্থূল দেহনিবৃত্তির বিষয় পরিস্ফুট আছে।

সূক্ষ্মদেহ বস্তুটা কি এ তত্ত্ব যোগপথাবলম্বীর অবিদিত না হইলেও ইহা হয়ত অনেকের মনে দুর্ব্বোধ ব্যাপার হইতে পারে। এজন্য সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়ের পশ্চাতে অন্তরেন্দ্রিয় রহিয়াছে, যেমন চক্ষের পশ্চাতে দর্শনেন্দ্রিয়। কেবল চক্ষের দ্বারাই তো দর্শনকার্য্য সম্পন্ন হয় না কিন্তু দর্শন শক্তি বা দর্শনেন্দ্রিয়, চক্ষের সাহায্যে স্থূল বস্তু দর্শন করে। এইরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ;—দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শেন্দ্রিয়। ফলতঃ সমস্ত স্থূল অবয়বের পশ্চাতে সমস্ত সূক্ষ্ম অবয়ব আছে। দেহতত্ত্বও বিস্তৃত ব্যাপার সুতরাং একটু আভাস মাত্র দেওয়া হইল।

তৎপরে আর একটি আপত্তি এইখানে উঠিতে পারে; তাহা এই যে, উপরোক্ত স্থূলদেহ নিবৃত্ত-মত হইতে পারে তাঁহাদের সম্বন্ধে, যাঁহারা অজ্ঞান মোহময় জীবনের অবসানে, বিবেক, বৈরাগ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া নবজীবন বা দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব, ইহ জীবনে কেবল আহার নিদ্রাদির বশীভূত হইয়া পাশবভাবে নানা পাপাচার করিতে করিতেই যাহাদের জীবনাবসান হইল তাহারাও কি, আর স্থূলদেহে না আসিয়া ঐরূপ সূক্ষ্মদেহে উন্নতির সোপানে উঠিবে? তাহার উত্তর—

এই যে পাঞ্চভৌতিক দেহধারী মানুষ ইহজগতে কাজ করিতেছে, ইহা দেখিয়া কোন সময় এক শ্রেণীর সাধকগণ বলিলেন "কর্ম্ম, অনিত্য মায়ার খেলা

মাত্র” বস্তুতঃ দেখা যায়, আজকার কর্ম্ম কা'ল থাকে না, পূর্ব্ব জীবনের কর্ম্মসকল আজ কোথায়? প্রবাহের ন্যায় কর্ম্ম আসিতেছে আর চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং যাহা অস্থায়ী তাহাই অনিত্য। আর এক শ্রেণীর সাধকগণ বলিলেন, “কর্ম্মই আমার গুরু, কর্ম্মই ব্রহ্ম!” ইহাতে দেখা যায় কর্ম্মের বাহ্য সংযোগ বিয়োগ প্রতিক্ষণে ঘটিতেছে বটে কিন্তু তাহার ভিতরকার ভাব (কাহারও পক্ষে অল্প বা অধিক হউক) আত্মায় সংগৃহীত হইতেছে, তাহাকেই জ্ঞানের বীজ বলা যায়। এই সম্বন্ধে দুই একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইতেছে।

অজ্ঞানতার মূল কি এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, মানুষ যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধিতে—দেহকেই “আমি” এবং তৎসম্বন্ধীয় যাহা কিছু “আমার” বলিয়া তাহাতে আসক্ত এবং অভিমানযুক্ত থাকে ততক্ষণ বা ততকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞানী পদবাচ্য। কিন্তু কর্ম্মজগত নিয়ত মানুষের অভিমান এবং আসক্তিতে আঘাত করিতেছে। মানবাত্মার গঠন এমনই যে, সে অনিত্য লইয়া চিরকাল থাকিতে পারিবে না। মৃত্যু পুনঃ পুনঃ মানবের কাল্পনিক ঐহিক-সুখ-রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিতেছে। প্রতিবাসীর প্রিয় বিয়োগ দেখিয়া যে চিন্তা সাধারণভাবে ভাসা ভাসা রকমে ছিল, তাহা নিজ প্রিয় (স্ত্রী পুত্রাদির) বিয়োগে আরো গভীর হইল; তৎপরে যখন নিজ দেহ পর্য্যন্ত গেল, তখন কি আত্মার একটা ঘোর পরিবর্ত্তন হয় না? মায়া বা কামনার মূল দেহ, সেই দেহই যখন গেল তখন কি মানবাত্মার কিছু পরিবর্ত্তন হয় না? যদি বল “কেবল দেহ নাশেই কি জ্ঞান লাভ হয়? এজগতে কত লোকের প্রিয় বিয়োগ হইতেছে তাহাতেও ত তাহাদের জ্ঞান হইতে দেখা যায় না।” জ্ঞান যে অতি সুদুর্লভ বস্তু, সে যে বহু তপস্যার লব্ধধন তাহাতে আর সন্দেহ কি? মৃত্যুতে দিব্য পরিপক্ব জ্ঞানলাভ নাও হইতে পারে, কিন্তু নিত্যানিত্য বিবেকই যে জ্ঞানের প্রথমাবস্থা ইহা সত্য। যে অবস্থায় মানুষ নিত্য বস্তু কি, আর অনিত্য বস্তুই বা কি, ইহার বিচার করিতে অবকাশ পায়, যদ্দ্বারা নিত্য বস্তুর আভাস মাত্রও চিত্তে প্রতিফলিত হয়, সেই অবস্থাও জ্ঞানলাভের অনুকূলে যায়। তৎপরে সাধন, সৎসঙ্গ, ধর্ম্মের আদর্শদর্শন এবং সর্ব্বোপরি ভগবৎ কৃপায় ক্রমোন্নতি হয়।

মানুষ সাধারণতঃ সর্ব্বাপেক্ষা আপনার দেহকেই অধিক ভালবাসে সুতরাং সেই দেহ নাশ বা মৃত্যু যে একটী বিশেষ অবস্থা, তাহাতে কোন

সন্দেহ নাই। জ্ঞানীগণ তাই মৃত্যুকে প্রিয়জ্ঞানে আলিঙ্গন করেন। অজ্ঞানীর নিকট মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থা কোন কোন স্থলে ভয়াবহ হইলেও শেষাবস্থা ভয়ানক থাকে না। যাহা হউক মৃত্যু, মানবাত্মার পরিবর্ত্তনের হেতু তাহাতে সন্দেহ নাই।

মৃত্যুর পর আবার নূতন দেহ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতেই আসিতে হয়, এই মতের একটী প্রধান যুক্তি কর্ম্মফলবাদ। অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগের স্থান এই পৃথিবী, সুতরাং দেহধারী হইয়া এখানে না আসিলে কর্ম্মের ফলভোগ কিরূপে হইতে পারে। এখন এই সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আজকার মত প্রবন্ধ শেষ করিব।

একথা কে না স্বীকার করিবেন যে, সকল মানুষই অল্পাধিক পাপী। মানুষের পক্ষে ইহা নিতান্তই অসম্ভব যে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কেহ নিষ্পাপ থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে ভগবান পূর্ণ ন্যায়বান, তিনি কাহারও একটী পাপ উপেক্ষা করিতে পারেন না। তবে পাপের দণ্ড ভোগের শেষ কোথায়? এই জন্যই বুঝি বা এদেশের লোকের এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে যে কত শত সহস্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে তবে যদি মুক্তি হয়। মুক্তির আশা যেন মানুষের সুদূরপরাহত হইয়া পড়িয়াছে। নিরাশায় অঙ্গ ঢালিয়া সংসার স্রোতে সকলে ভাসিয়া চলিয়াছে। এ সম্বন্ধে বরং ভক্ত বৈষ্ণব সাধকগণের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। হরিনামে অচিরে সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, এ বিশ্বাস বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে বা ভক্তির বিধানে উজ্জ্বল হইয়াছে।

তৎপরে কোন কোন সম্প্রদায় বা সাধক শ্রেণীর মধ্যে সাধনের বল এবং পুরুষকার অধিক মাত্রায় স্বীকৃত হইলেও অবশেষে ভগবৎ কৃপা ভিন্ন যে মুক্তি হইতে পারে না, একথা বোধ হয় কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মহাত্মা বুদ্ধও ছয় বৎসরকাল কঠোর সাধনার পর যখন অবসন্ন ও হতাশ হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি স্বভাবের উপর, (আত্মশক্তির অতীতাবস্থার উপর) আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন। মানুষ যে কেবল জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যফলেই মুক্তিলাভ করিবে তাহা কখন সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে শত সহস্র বৎসর দুষ্কর্ম্মের ফল, নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে তাহাও সত্য বলিয়া বোধ হয় না। মানুষের পাপের সীমা আছে, ঈশ্বরের করুণার শেষ নাই।

ঈশ্বর যেমন ন্যায়বান, দণ্ডদাতা-বিচারপতি রাজা, তেমনি, দয়াল করুণাসিন্ধু ক্ষমাশীল ভকতবৎসল। কর্ম্মফল অনিবার্য্য ইহা সত্য হইলেও অপরাধের ক্ষমা আছে ইহাও সত্য। মানুষ যখন অনুতাপী হয় তখন ক্ষমাপ্রাপ্তির যোগ্য হয়। পাপ বোধ হইতে অনুতাপের উদয় হয়। মানুষের মধ্যে নিত্য ও অনিত্য বস্তু রহিয়াছে, মৃত্যুর দ্বারা যখন অনিত্যত্বের জ্ঞান বা বিষয়বৈরাগ্য উজ্জ্বল হয়, তখন অভিমান অহঙ্কার ভাঙ্গিয়া যায়। এই অবস্থায় পাপ বোধ জন্মিয়া থাকে। ক্ষমার শাস্ত্র, মহা শাস্ত্র। শত অপরাধী হইলেও যখন সে ক্ষমার প্রার্থী হয়, তখন তাহার পূর্ব্ব পাপ সমস্তই মুছিয়া যায়। জগাই মাধাই অশেষ অপরাধী ছিল, কিন্তু অনুতাপী হইয়া ক্ষমা প্রাপ্ত হইল। মানুষ মানুষের নিকট যে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতে ঈশ্বরের ক্ষমা কত শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বজগৎ ও মানব মণ্ডলীর সৃষ্টিকর্ত্তা; সুতরাং পিতা, তিনি জানেন তাঁহার সন্তানগণ কতক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল। মানব মাত্রেই অপূর্ণ। অপূর্ণ মানবে পাপ ক্রটী অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দয়াল পিতা পূর্ণস্বরূপ, মানব আত্মাকে আত্মদান করিয়া মুক্তির পথে,—অনন্ত উন্নতির পথে লইবার ব্যবস্থা যদি তিনি স্বয়ং না করিতেন তবে মানবের মুক্তি কোন কালে সম্ভবপর হইত না। হে মানব! সেই দয়াল পিতার অনুগত হও। তখন করতলস্থ আমলকবৎ মুক্তি দৃষ্ট হইবে।

আমরা এতদ্দূরে আসিয়া দেখিলাম, মৃত্যুতে স্থূলদেহ গেলেও আত্মা সূক্ষ্ম দেহে, তদ্রূপ সূক্ষ্ম জগতে সূক্ষ্ম-জগ-মণ্ডলীর সহিত উন্নত হইবে ইহা অসম্ভব নহে। যাহারা ইহজগতে মায়া-মোহাচ্ছন্নাবস্থায় নানাবিধ পাপ করিতে করিতেও দেহত্যাগ করিতেছে, তাহাদের দেহনাশই মোহনিদ্রাভঙ্গের হেতু হইয়া যথাসম্ভব উন্নতিপথে গতি হওয়াও অসম্ভব নহে। বারম্বার জন্মমরণরূপচক্রে এই জগতেই ঘুরিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে জ্ঞানের উন্নতি হয় নচেৎ আর কোন উপায়ে হয় না, তাহা নহে; অনুতাপীও ক্ষমা প্রাপ্তিতে দুষ্কৃত দূরে সক্ষম হয়। কেবল সাধন ও পুরুষকারেই মুক্তি লব্ধ, ভগবৎ কৃপার কোন প্রয়োজন হয় না তাহা নহে; কিন্তু কৃপা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ করা যায় না। পক্ষান্তরে পুনঃ পুনঃ এই জগতে জন্মমরণ দ্বারা তবে মুক্তি হয়—এই মতে, বার বার বাল্য যৌবনাদি একই অবস্থাভোগে ঈশ্বরের অনন্ত উন্নতিশীলতায় কিছু খর্ব্বভাব উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার দয়া, করুণা এবং ক্ষমার পরিবর্ত্তে কর্ম্মফলের প্রাধান্য

স্বীকৃত হয়। কিন্তু ভক্তিতত্ত্বে কর্ম্মের গরিমা একেবারে অস্বীকৃত হইয়া, কৃপাই সিদ্ধির উপায় স্বীকৃত হইয়াছে।

সুতরাং আমার নিকট ঈশ্বরস্বরূপের সহিত, সাধনশীলতার সহিত, "অনন্ত ক্রমোন্নতির" মত প্রিয় এবং সঙ্গত বোধ হয়। কিন্তু পুনঃ পুনঃ এই জগতেই জন্মান্তরবাদ কাল্পনিক, বুদ্ধির বিচার বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা একান্ত প্রাচীনবাদী তাঁহাদের যদি এ মত অপ্রিয় বোধ হয় তবে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র এবং গুরুতে শ্রদ্ধা রাখিয়াও স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মতের পক্ষপাতী তাহাদের চিন্তাপথে যদি কোন ভাবের সঞ্চার হয় এই উদ্দেশ্যেই এ প্রবন্ধ লিখিত হইল। অবশেষে এই প্রবন্ধে আর একটি তত্ত্ব চাপা রহিল তাহা এই যে, মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম দেহে উন্নতি সম্ভব হইলেও এই বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে সকল মানুষ কিরূপ অবস্থায় ছিল, অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্ম আছে কি না, যদি না থাকে তবে মানবের এমন বিভিন্ন অবস্থা কি জন্য হয়? এই সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচ্য।

কুশদহ। (৬)

খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদারতা—গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী খাঁটুরা গ্রামে রতন সেন নামক এক ব্যক্তি নিজ বাটীর একটী গৃহে কতিপয় প্রতিবেশীর সহিত গোপনে জুয়াখেলা করিতেন। এই সংবাদ গোবরডাঙ্গার জমীদার খেলারাম বাবু কোন লোকের মুখে শুনিয়া রতন সেনকে ধরিয়া আনিবার জন্য দুই জন পাইক পাঠাইয়া দেন। রতন সেন সে সময়ে যাইতে অস্বীকার করায় পাইকদ্বয় বলপূর্ব্বক রতনকে ধরিয়া লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় রতন সেন ক্রোধে অধীর হইয়া পাইকদ্বয়কে বিলক্ষণ প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহারা রতনের সমস্ত বিবরণ জমীদারের নিকট বলিল। খেলারাম বাবু এই ঘটনায় নিজেকে অবমানিত মনে করিয়া চারি জন উপযুক্ত লাঠিয়ালকে হুকুম দিলেন যে "এই দণ্ডে রতন সেনকে আমার নিকট হাজির কর" আজ্ঞামাত্র লাঠিয়ালেরা রতন সেনের বাটীতে যাইয়া জমীদারের হুকুম জানাইল। রতন সেন একখানি তরবারি আনিয়া তাহাদিগকে বলিল "যে আমার নিকট আসিবে আমি তাহাকে কাটিব।" লাঠিয়ালেরা প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া জমীদারের নিকট সমস্ত

বিবরণ বলিলে তিনি কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া সামান্য একটী লোক দ্বারা ঐ পত্রখানি রতনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পত্র পাইবামাত্র রতন সেন জমীদার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। জমীদার বাবুকে কিছু টাকা প্রণামী দিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময় খেলারাম বাবু বলিলেন "কি রতন; এখন তোমাকে কে রক্ষা করে ?" এই কথা শুনিয়া রতন নির্ভীক চিত্তে উত্তর করিল "রতন কি তার কোন উপায় স্থির না করিয়া আসিয়াছে ?" এই বলিয়া রতন জামার মধ্য হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ভোঁজালে বাহির করিয়া বলিল "আপনার হুকুম দিবার পূর্ব্বেই আমি ভোঁজালে দ্বারা নিজে আত্মহত্যা করিব।" খেলারাম বাবু বলিলেন "কেমন তোমার ভোঁজালে দেখি।" রতন বিনা বাক্যব্যয়ে ভোঁজালে খানি জমীদারের হস্তে দিলেন। তখন খেলারাম বাবু বলিলেন "এইবার তোমাকে কে রক্ষা করে ?" রতন তখন বলিলেন "এখনও আমার দুই খানি হাত আছে!" রতনের এই কথা শুনিয়া খেলারাম বাবু রতনের সাহসের প্রশংসা করিয়া তাহাকে ভোঁজালে খানি দিলেন এবং "জুয়াখেলায় লোক সর্ব্বস্বান্ত হয়" এই উপদেশ দিয়া রতনকে ছাড়িয়া দিলেন। রতনও জমীদারের নিকট স্বীকার করিল যে আর সে জুয়াখেলা করিবে না।

ইহা কি খেলারাম বাবুর কম উদারতার পরিচয়! যে খেলারাম বাবু কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন কালেক্টর সাহেবের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন; তিনি ইচ্ছা করিলে রতনের এই কার্য্যের জন্য উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয় সাহসী ও মানী ব্যক্তির হৃদয় উপলব্ধ করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল।

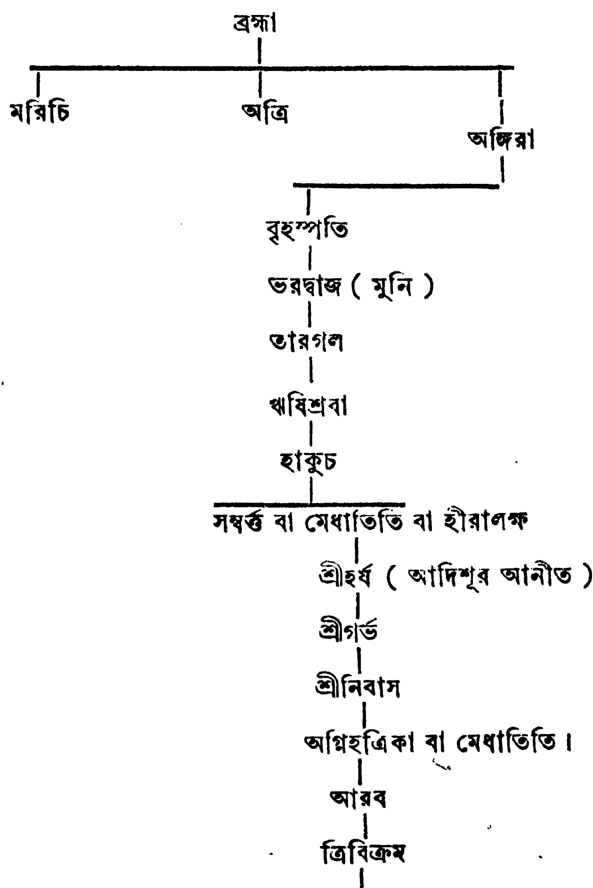
খেলারাম বাবুর দুই স্ত্রী—শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবী ও শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী। শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবীর গর্ভে কালীপ্রসন্ন ও শ্রীমতী আনন্দময়ীর গর্ভে বৈদ্যনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর জন্ম সম্বন্ধে নিম্নে একটী বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল ;—

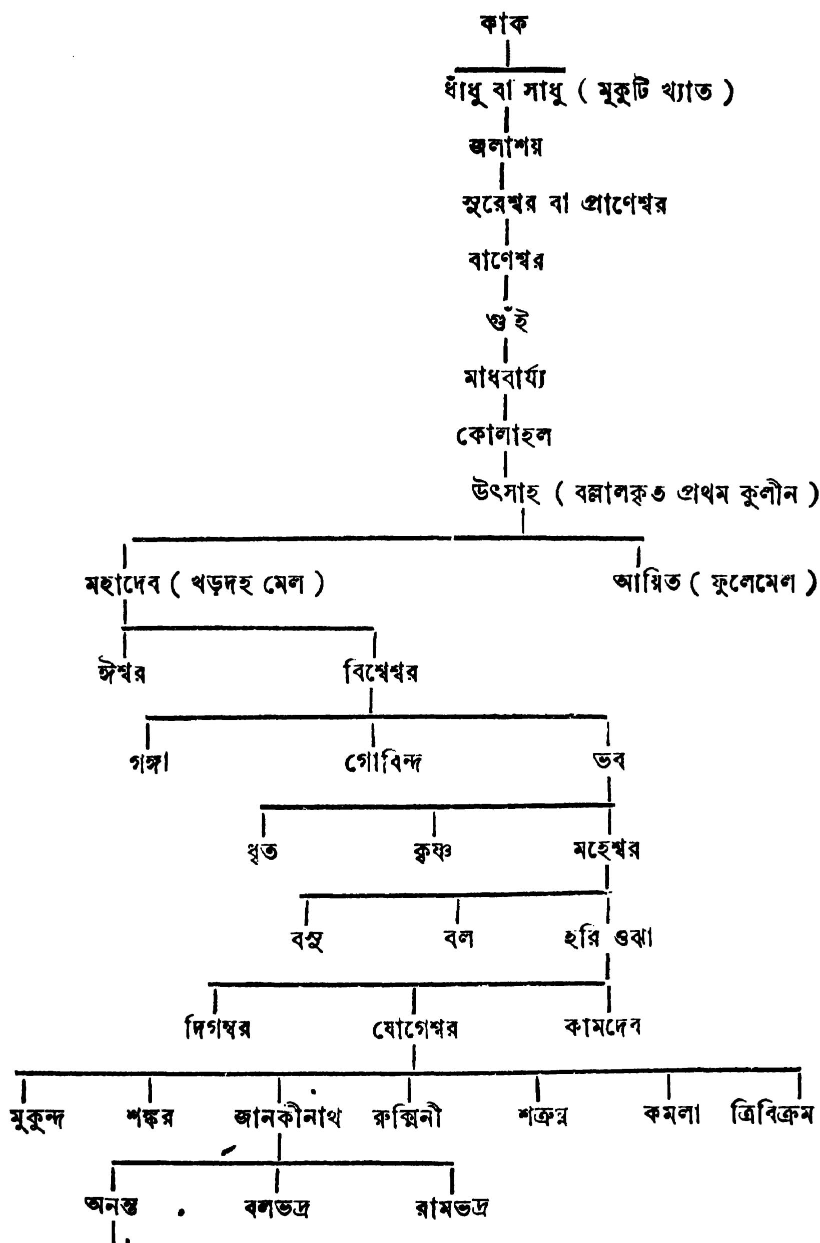
খেলারাম বাবুর স্ত্রী শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবীর সন্তান না হওয়ায় তিনি বিষণ্ণা অবস্থায় ছিলেন, সেই সময়ে এক সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে কালীমাতার একটী ঔষধ ধারণ করিতে বলেন। এই ঔষধ ধারণের ফলে একটী পুত্র

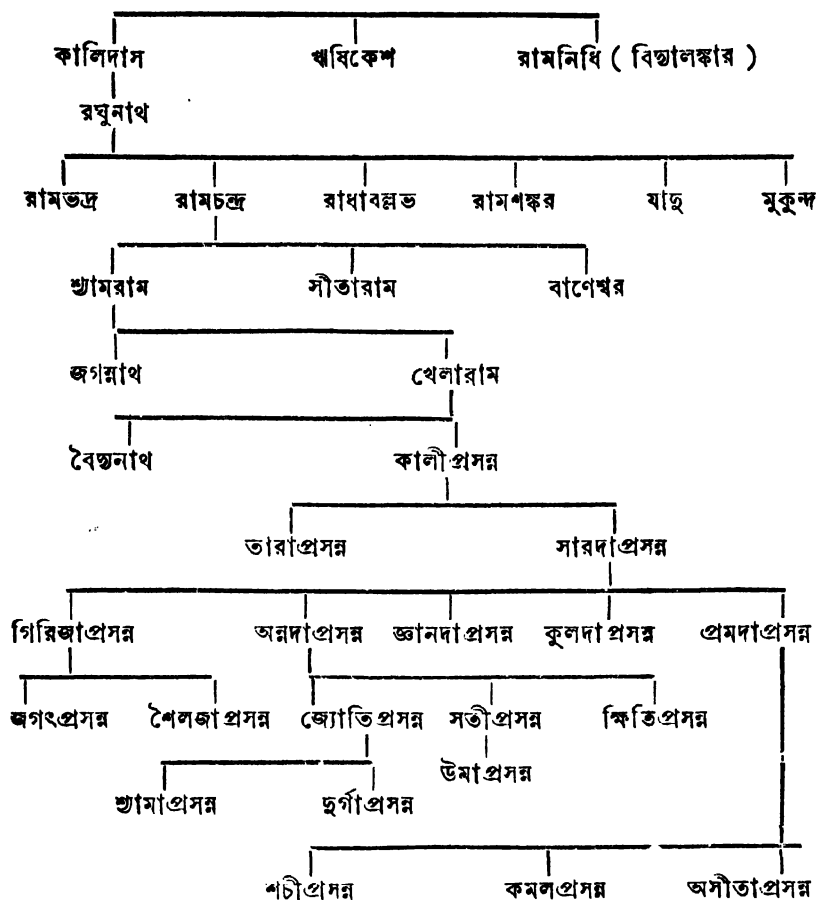
সন্তান লাভ করিলেন—সেই পুত্রের নাম সেই জন্য কালীপ্রসন্ন রাখিলেন। এবং কালীমাতার প্রসাদে পুত্ররত্ন লাভ করায় ১২২৯ বঙ্গাব্দে মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন কালীমন্দির স্থাপন করেন। এই কালী বাড়ীর নাম প্রসন্নময়ী বা আনন্দময়ীর বাড়ী রাখা হইল।

এই জমীদার বংশের বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের একটী বংশ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গোবরডাঙ্গার জমীদারদিগের বংশাবলীর পরিচয়।




কাক
ধাঁধু বা সাধু (মুকুটি খ্যাত)
জলাশয়
সুরেশ্বর বা প্রাণেশ্বর
বাণেশ্বর
গুঁই
মাধবার্য্য
কোলাহল
উৎসাহ (বল্লালকৃত প্রথম কুলীন)
মহাদেব (খড়দহ মেল)
আয়িত (ফুলেমেল)
ঈশ্বর
বিশ্বেশ্বর
গঙ্গা
গোবিন্দ
ভব
ধৃত
কৃষ্ণ
মহেশ্বর
বসু
বল
হরি ওঝা
দিগম্বর
যোগেশ্বর
কামদেব
মুকুন্দ
শঙ্কর
জানকীনাথ
রুক্মিনী
শত্রুঘ্ন
কমলা
ত্রিবিক্রম
অনন্ত
বলভদ্র
রামভদ্র



প্রসন্নময়ী অর্থাৎ কালীমাতার প্রসাদে কালীপ্রসন্ন বাবুর জন্ম হওয়ায় সেই হইতে তাঁহার বংশের প্রত্যেক ব্যক্তির নামের শেষে "প্রসন্ন" এই কথা সংযুক্ত রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ভূতপূর্ব্ব "প্রভা" সম্পাদক।

মানবদেহে শৈত্যের ক্রিয়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শৈত্যদ্বারা স্থানীক স্পর্শলোপ করিয়া বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্ত্রচিকিৎসা করা হইয়া থাকে। শৈত্য প্রয়োগ করিয়া অস্ত্রচিকিৎসা করিলে অস্ত্রের ক্লেশ অনুভব হয় না, রক্তপাত কম হয়; প্রদাহাদিও তাদৃশ হইতে পারে না। ক্লোরফর্ম প্রভৃতি ব্যাপ্ত স্পর্শহারকে যে সকল ভয় আছে, ইহাতে তাহা নাই। শরীরের যে কোনও স্থানে কিছুক্ষণ বরফখণ্ড ধরিয়া রাখিলে ঐ স্থানের স্পর্শলোপ হইয়া থাকে। বরফচূর্ণ ২ ভাগে সৈন্ধবলবণ ১ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রমধ্যে পুটালকরতঃ শরীরের কোন স্থানে লাগাইলে ঐ স্থানের স্পর্শলোপ হয়। যদি ঐ স্থানে প্রদাহ থাকে তবে ৮।১০ মিনিটকাল সময় লাগে, কিন্তু প্রদাহ না থাকিলে ২ মিনিটের মধ্যে স্পর্শলোপ হইয়া থাকে। ডাক্তার জেমস্ আর্ণট্ এই প্রকরণ সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন। এই উপায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা বিনা ক্লেশে সম্পাদিত হয়। স্পর্শলোপ হইলে আর অধিককাল উক্ত স্থানে শৈত্য প্রদান করা উচিত নহে। অত্যাধিক সময় ও অত্যাধিক পরিমাণে শৈত্য প্রয়োগ করিলে প্রযুক্ত স্থানের টিসু সকলের মৃত্যু হয়, অর্থাৎ ঐ স্থান একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

শীতল জলে স্নান করিলে শরীর সবল হয়। অবগাহন সময়ে দেহ পবিত্র ও মন প্রফুল্ল বোধ করিলেই আর জলে থাকা উচিত নহে। এতদতিরিক্ত সময় জলে থাকিলে বিপরীত ক্রিয়া দর্শায়। মোটামুটি বুঝিতে গেলে হস্ত পদাদির চর্ম্ম কুঞ্চিত হইবার পূর্ব্বেই জল হইতে উঠিয়া আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। বিধি পূর্ব্বক শীতল স্নানের ফল শীঘ্রই প্রকাশ পায়। ইহাতে শরীরের ভার বৃদ্ধি, দেহের লাবণ্য ও বর্ণ পরিষ্কৃত, পেশী সকল সুদৃঢ় এবং স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য দূর হয়। জাত শিশু, অতি বৃদ্ধ ও অত্যন্ত দুর্ব্বল ব্যক্তির শীতল স্নান হিতকর নহে। তাহাদের পক্ষে শীতল জলে গাত্র মার্জ্জন (cold sponging) বিশেষ উপকারী। অল্পক্ষণের জন্য শরীরে শৈত্য প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ অবসাদন ক্রিয়া প্রকাশ পায়; কিন্তু শৈত্য প্রয়োগ অপসৃত হইলে পুনরায় উত্তেজিত হইয়া

শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক অপেক্ষাও ভাল হয়। ইংরাজীতে ইহাকে Reaction অবস্থা বলে। অচৈতন্য রোগীর মুখে সজোরে শীতল জলের ছাট দিলে উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া রোগীর চৈতন্য সম্পাদন করে। সুরাপান দ্বারা অভিভূত ব্যক্তির, অথবা অহিফেনাদি বিষ ভোক্তার এই প্রকারে অনেক সময় চৈতন্য সম্পাদিত হয়। নবজাত শিশুর শ্বাসরোধ হইলে শৈত্য প্রয়োগে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। একটী পাত্রে গরম জল ও অপরটীতে শীতল জল রাখিয়া শিশুকে অল্পক্ষণের জন্য উষ্ণজলে রাখিবে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই শীতল জলে কণ্ঠ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিবে। এই প্রক্রিয়া পুনঃ পুনঃ করিতে থাকিবে। শীতল জল লাগিবা মাত্র শিশু হাঁপাইয়া উঠে ও শ্বাসগ্রহণ করিতে থাকে। শৈত্য প্রয়োগই এই চিকিৎসার উদ্দেশ্য। কিছুক্ষণ পরে জলের শৈত্য কমিয়া যায়, এই জন্য গরম জলের আবশ্যক হয়; নতুবা এ স্থলে উহার কোন উপকারিতা নাই। ভিয়েনা ও বার্লিন নগরস্থ চিকিৎসালয়ে ওলাউঠা রোগে কেবলমাত্র বরফ খাইতে দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা পিপাসা দমন হয় এবং শীঘ্রই পুনরুত্তেজন প্রকাশ পায়। রস্‌সাহেব কৃত ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বিসূচিকা রোগ চিকিৎসার তালিকা দৃষ্টে জানা যায় শুদ্ধ বরফ বা শীতল জল দ্বারা ঐ রোগের চিকিৎসা করিয়া মৃত্যুর হার অনেক কম হইয়াছে।

শরীরে অধিকক্ষণ শৈত্যপ্রয়োগ করিলে সার্ব্বাঙ্গিক অবসাদ উপস্থিত হয়; ইহার আর পুনরুত্তেজন হয় না। এই অবসাদন ক্রিয়া দ্বারা জীবনী শক্তি নষ্ট হয়, শরীরে আলস্য বোধ হয় এবং শীঘ্রই নিদ্রাবেশ হয়। কখন কখন ইহা দ্বারা মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অত্যন্ত শীত প্রধান দেশে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। উত্তেজনা দমন করিবার জন্য শৈত্য প্রয়োগ করিতে হইলে অত্যবসাদন না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির জীবনী শক্তি স্বাভাবিক ক্ষীণ থাকে, এ জন্য তাহাদের বিশেষ সাবধানে শৈত্য প্রয়োগ করা উচিত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ডাক্তার,
গোবরডাঙ্গা।

হিমালয় ভ্রমণ। (৮)

১৯শে কার্ত্তিক সোমবার সমস্ত দিন নিয়মিত কার্য্যের ভিতর দিয়া ঋষিকেশের আনন্দভাব সম্ভোগ করিলাম। রাত্রিশেষে নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া বসিলাম স্বামীজিরা তখনও নিদ্রিত আছেন। অল্পক্ষণ মধ্যে আমার প্রাণে কি এক ভাবের স্রোত আসিতে লাগিল। তাৎকালিক অবস্থার বিষয় যাহা "ডায়েরী"তে লেখাছিল তাহা অগ্রে উদ্ধৃত করিতেছি, "ধন্য ঋষিকেশ! ধন্য হইলাম, আজ তত্ত্বের প্রকাশ হইল, ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ হইল, অদ্বৈতবাদেরও মীমাংসা হইল। আজ নূতন দৃষ্টি লাভ হইল। পরিপূর্ণ আনন্দ! পরিপূর্ণ আনন্দ!"

স্পষ্ট বুঝিলাম ব্রহ্মপ্রাপ্তির একটী অবস্থা আছে, অপরের মুখে শোনা জ্ঞান, আর প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অতিশয় প্রভেদ।

ব্রহ্মপ্রাপ্তির অবস্থা সাধকের হইলে, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অজর, অশোক, অভয়, অমরত্ব ভাব হয়। তাঁহাকে পাইলে পাইবার অবশেষ কিছুই থাকে না। অমৃত পান করিলে জলের পিপাসা হয় না। তখন জ্ঞান এতদূর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যে, তাহাতে পরিষ্কার বুঝিলাম, এ সংসারে ভয় ভাবনার বিষয় কিছুই নাই, যাহা হয় তাহা কেবল মোহ মাত্র। সে হৃদয়ানন্দদায়িনী জ্ঞানের নিকট একটিও দুঃখের অভিযোগ টিকে না। তৎপরে ইহাও বুঝিলাম, স্বামী শঙ্কর-পন্থি পরমহংস সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক আবিলতা সত্ত্বেও ব্রহ্মপ্রাপ্তির একটি আদর্শ আছে। সেটা ঐ অজর, অমর, ভাব।

তৎপরে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনন্ত উন্নতির বিষয় ভাবিতে লাগিলাম, অর্থাৎ যাঁহারা বলেন, "ব্রহ্ম কি সসীম স্থূল বস্তু যে, তাহা পাইলে, তাঁহার প্রাপ্তির সমস্ত শেষ হইয়া গেল? ব্রহ্ম অনন্ত সুতরাং তাঁহার প্রাপ্তিও অনন্তকালে হইবে।" এই প্রকার একটা মত লইয়া যাঁহারা সন্তুষ্ট তাঁহাদের মধ্যে যেন ব্রহ্মপ্রাপ্তির স্পষ্ট আদর্শের অভাব বোধ হয়। এই সময় আচার্য্য কেশবচন্দ্রের একটী প্রার্থনার কথা আমার মনে আসিল। তিনি একটী প্রার্থনায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই ভাব আছে। "হে ভগবান! কেবলই কি, সাধন করিব, সিদ্ধির কি কোন অবস্থা নাই? যে অবস্থায় পাপ অসম্ভব হয়ে যাবে।" ইত্যাদি।

ব্রহ্মপ্রাপ্তির অবস্থা পূর্ণ ভাবাপন্ন, সাম্যাবস্থা, সংসারাসক্তির অতীত ভাব। অপূর্ণ, আসক্তভাব, আর পূর্ণ অনাসক্তভাব, এইখানে ইহার প্রভেদ।

এতদিন সাধনক্ষেত্রে যে সকল তত্ত্ব ও ভাব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছিল, আজ যেন তাহা হৃদয়ে গাঁথিয়া গেল, এমন কত কথা কতবার আলোচনা করিয়াও যাহার গুরুত্ব এমন অনুভব করি নাই। আজ সেই অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অজর, অশোক, অভয় অবস্থা অন্তরে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া, আনন্দে পরিপূর্ণ হইলাম।

"যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যেতাবদনুশাসনম্॥"

(যে সময়ে সমুদায় হৃদয়-গ্রন্থি ভগ্ন হয় তখনই জীব অমর হয়) এই শ্রুতির সহিত হৃদয়ের ভাবের সম্পূর্ণরূপে মিল হইয়া গেল। ডায়েরীতে শেষ কথা লেখা ছিল "ধন্য হলাম, ঋষিকেশ আশা সার্থক হইল।"

২০শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার। চলিয়া আসিবার একটী সুযোগ হইল, এবং মনে এই ভাবও আসিল যে, "উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইলে তথায় আর থাকিতে নাই।" এদিকে স্বামীজিরাও বলিলেন, "আপনার যাইবার এমন সুযোগ হইতেছে, আপনি কি যাইবেন ?" আমি বলিলাম, আপনাদের সঙ্গ ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না ; কিন্তু উপস্থিত আমার যাওয়াই কর্ত্তব্য মনে হইতেছে। তখন তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিলাম, তাঁহারাও গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া বিদায় দিলেন।

এই দিবস একটী যুবক একা গাড়িতে ঋষিকেশ হইতে হরিদ্বার আসিতেছিল, ঐ যুবক আমার পূর্ব্ব পরিচিত কোন বন্ধুর ভ্রাতস্পুত্র, সুতরাং তিনি আমাকে তাঁহার গাড়িতে আসিতে অনুরোধ করিলেন, ইহাই আমার আসিবার সুযোগ। প্রাতেঃ আমাদের গাড়ি ছাড়িল, বেলা ৯টার পর লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির পর্য্যন্ত আসিয়া আমি ঐ গাড়ি ও সঙ্গ ছাড়িয়া দিলাম। তখন আমার সে অবস্থায় আসিতে আর ইচ্ছা হইল না।

নির্ম্মল স্রোতস্বতী ঝরনায় স্নান, মন্দিরে ভোজন এবং বিশ্রাম করিয়া, আপন ভাবে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া সন্ধ্যার সময় কংখল সেবাশ্রমে আসিলাম।

সেবাশ্রমে রাত্রিকালের ধ্যানে মনে হইল, জ্ঞানে যেমন্ অভেদভাবে ব্রহ্মের সহিত একত্ব অনুভূত হয়, তেমন ভক্তিতেও ভগবানের দাস হইয়া, তাঁহাতে একান্তনুগত্যভাবেও যোগ উপস্থিত হয়। ফলতঃ ভক্তির সরস সাধন ভজন,

ভগবত গুণানুকীর্ত্তন ও দাস্যভাবে সেবা (নরসেবা) পরমসুখকর অবস্থা; জ্ঞান ও ভক্তি একত্রে সাধন করিতে হইবে।

২১শে কার্ত্তিক বুধবার। কেবলমাত্র খুলনা হইতে স্ত্রীর একখানি পত্র পাইলাম। মেয়েটী আসার সংবাদ স্ত্রীকে সহসা না জানাইয়া প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য শিবনাথ ও জনার্দ্দনকে পত্র লিখিয়া ঋষিকেশ গিয়াছিলাম তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; স্ত্রীর আজকার পত্রে বুঝিলাম তিনি তখন পর্য্যন্ত ঐ সংবাদ পান নাই; কিন্তু শিবনাথের কোন পত্র না পাইয়া ভাবিলাম তাইত! একটী জীব ভগবানের ঘরে আসিল, সে পক্ষে আমার অবহেলা করা কি উচিত? কিন্তু কি করিব? আমি যে এখন ১২০০ শত মাইলের অধিক দূরে আছি; ইচ্ছা করিলেই ২।৪ দিনে দেশে পৌঁছিতে পারি না। যাহা হউক ব্যস্ত হইলে কি হইবে, দেখা যাক্ ভগবান্ কি করেন। এই ভাবিয়া ইতিমধ্যে ধাঁ করিয়া একবার ডেরাহুন দেখিয়া আসা স্থির করিয়া, আহারান্তে ডেরাহুন যাত্রা করিলাম।

হরিদ্বার ষ্টেশন হইতে বেলা ৪টার পর ট্রেণ ছাড়িল। অল্প দূর গিয়া পর্ব্বত ভেদ করিয়া একটী ছোট সুড়ঙ্গের অন্ধকার পথে ট্রেণ চলিয়া গেল। তারপর পর্ব্বতোপরি বনাবৃত দৃশ্যের মধ্যে উত্তরাভিমুখে চলিলাম। কদাচ এক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ও ষ্টেশন দৃষ্ট হইতেছিল।

সন্ধ্যার সময় ট্রেণ ডেরাহুন ষ্টেশনে পৌঁছিল, অল্প অল্প অন্ধকার অনুভূত হইল। ট্রেণযাত্রী জনৈক ঐ দেশীয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাঙ্গালী বাবুরা করণপুরা থাকেন। করণপুরা ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে; একার ভাড়া ॥০ আনা; কিন্তু আমার নিকট ॥০ আনা না থাকায়, কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বলিলেন, "মহারাজ! আজ রাত্রে আপনি মহান্ত মহারাজের গুরুদরবারায় থাকুন।" এমন কি তিনি আমাকে গুরুদরবারায় রাখিয়া এক ব্যক্তিকে কি বলিয়া গেলেন। এই ঘটনা দেখিয়া আমি অবাক হইলাম। তারপর আর এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে একটী ঘরের ভিতরে লইয়া গেল। ঘরটী ছোট কিন্তু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। ঘর জোড়া সতরঞ্চ ও একখানি পুরু গালিছা পাতা ছিল। তদুপরে আর একখানা কম্বল পাতিয়া দিয়া আমার আসন এবং শয়নের ব্যবস্থা করিয়া, ক্ষণ পরে কিছু খাদ্য (পুরী তরকারী ইত্যাদি) ও জল

আনিয়া দিল। সে ঘরে আর একটী সাধু ছিলেন, তাঁর বয়স বেশী নহে। যাহা হউক তাঁহার সঙ্গে বেশী কিছু কথা হইল না। আমি আহার করিয়া একটু পরে শয়ন করিলাম এবং সুনিদ্রা হইল। এখানে বেশ শীত বোধ হইতে লাগিল।

২২শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার। প্রাতে করণপুরা চলিয়া গেলাম। প্রথমে আমার দেশস্থ আত্মীয়ের সন্ধান লইলাম, তাঁহার সহিত দেখা হইল না, তিনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার বাসা দেখিয়া, তৎপরে ব্রাহ্মবন্ধু ঈশানচন্দ্র দেবের বাড়ী গেলাম। তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল তিনি অতি সাধু প্রকৃতির সদাশয় ব্যক্তি। তিনি আমাকে বলিলেন, "আপনি এত দূরে থাকিলে চলিবে না এখানে আসুন।"

আমি গুরুদরবারায় চলিয়া আসিলাম। স্নান আহার করিয়া উপরের গৃহে গিয়া মহান্ত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, আপনার এখানে আমি সচ্ছন্দে ছিলাম, কিন্তু আমি বাঙালী, করণপুরাতে বাঙালী বন্ধুগণ আছেন, আমি যে কয়েকদিন থাকিব, তথায় থাকি এইরূপ তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াছেন। তাই আমি যাইতেছি। মহান্তজীর বয়স ৩৫ পঁয়ত্রিশের বেশী বোধ হইল না, অতি সুন্দর রাজকুমার তুল্য, অথচ শান্ত মূর্ত্তি। ইঁহারা চিরকুমার থাকেন, সুতরাং বিষয়-বিরাগী, কিন্তু ইঁহাদের রাজার ন্যায় সম্পদ ঐশ্বর্য্য, তথাপি তাঁহাতে কোন বিলাসিতার চিহ্ন লক্ষিত হইল না। পরিষ্কার সাত্ত্বিক ভাবের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া উত্তমাসনে বসিয়া আছেন, আমার কথা শুনিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, (হিন্দিভাষায়) "আপনি আর কতদূরে যাইবেন ?" আমি বলিলাম প্রভুজীর ইচ্ছা হইলে আমি 'অমৃতসর-গুরুদরবার' দর্শন করিয়া, লাহোর হইয়া ফিরিব ইচ্ছা আছে। এই বলিয়া আমি মহান্ত মহারাজকে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম। আপনার কম্বলাসন লইয়া বাহির হইব, এমত সময় আমার পশ্চাতে এক ব্যক্তি আসিয়া, একটী কাগজের মোড়ক আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "মহান্ত মহারাজ আপনার জন্য ইহা দিয়াছেন।" আমি গ্রহণ করিয়া, পরে খুলিয়া দেখিলাম তাহাতে ২৲ টাকা রহিয়াছে।

বেলা ৪টার মধ্যে করণপুরা চলিয়া আসিলাম। আমার দেশস্থ শ্রদ্ধেয় আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে একান্ত ইচ্ছুক ছিলাম। তিনিও সহসা আমাকে পাইয়া বড়ই খুসী হইলেন, এবং নিজের

জীবনী সম্বন্ধে আমাকে অনেক গোপনীয় বার্ত্তা যেভাবে জানাইলেন, দুঃখের বিষয় তাহাতে আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল না। পরদিন তিনি তাঁহার জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বন্ধুর সহিত হস্তী পৃষ্ঠে আমাকে লইয়া বেড়াইলেন, এবং এক মধ্যাহ্নে ভোজন করাইলেন। অধিকন্তু তিনি লাহোর যাত্রা কালীন, সপ্রেমে অনুরোধ করিলেন যেন, লাহোর গিয়া আমি তাঁহারই বাসায় যাই। সে জন্য তিনি তাঁহার লাহোরের ঠিকানা, আমাকে বলিয়া গেলেন। আমি এখানে ঈশান বাবুর বাড়ী অতিথি হইয়া রহিলাম।

অতঃপর ২৩শে, ২৪শে ও ২৫শের একবেলা ডেরাডুন রহিলাম। শুনিলাম ডেরাডুনের প্রকৃত নাম "দ্রোণাশ্রম," অর্থাৎ দ্রোণকা ডেরা। মুসুরী পর্ব্বতের ৭ মাইল নিম্নে রাজপুরা; রাজপুরা হইতে সমতল সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ৭ মাইল ডেরাডুন। এমন বিস্তৃত সমতল ভূমি দেখিয়া ইহাকে সহজেই দ্রোণ-ভূমি বলিয়া বিশ্বাস হয়। এই স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর। বিশেষতঃ এখানকার বায়ু অতিশয় বিশুদ্ধ। এখন এখানে গবর্ণমেণ্টের একটি প্রধান সেনানিবাস। আমি একদিন প্রাতঃকালে মাঠে বেড়াইতে বাহির হইয়া আমার এমন মনের অবস্থা হইয়াছিল যে অনন্যমনা হইয়া মুসুরী পাহাড়ের দিকে চলিয়া যাইতে ছিলাম, সে মধুময় বায়ুর আকর্ষণ আর ছাড়িতে পারি না, এমন সময় জনৈক ব্যক্তির কথায় বুঝিলাম যে, এ সময় ল্যাণ্ডোরাতে (মুসুরী পাহাড়ের একটী স্থানের নাম ল্যাণ্ডোরা) অত্যন্ত শীত। এত অল্প শীতবস্ত্র লইয়া তথায় আমার যাওয়া উচিত নহে।

ঈশান বাবুর বাড়ী পারিবারিক উপাসনা হইল। তাঁহার ছোট ছেলেমেয়েরা আমার নিকট গল্প শুনিয়া শুনিয়া আমার বাধ্য হইয়া পড়িল। আমি বেড়াইয়া আসিলে একটী ছোট ছেলে বলিত "মা! সাধু আসিয়াছেন।" প্রাচীন, ব্রাহ্মবন্ধু হরিনাথ দাস মহাশয় অতি শ্রদ্ধেয় মহৎ ব্যক্তি। তাঁহার বাসায় এক দিবস রাত্রিতে তিনি এবং তাঁহার দুই পুত্রের সহিত মিলিয়া ব্রহ্মোপাসনা এবং আহারাদি করিলাম।

২৫শে—রবিবার প্রাতে ঈশানবাবুর বাড়ী সামাজিক উপাসনা হইল, তাহাতে বন্ধুবর সুরেন্দ্রবাবু ও মুকুন্দবাবু উপস্থিত ছিলেন। আমি উপাসনার কার্য্য করি। উপদেশের ভাব এইরূপ ছিল—"ব্রহ্মসমাজেও কতকগুলি 'কুমার সন্ন্যাসীর' প্রয়োজন আছে, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে দেশীয় ভাবে জ্ঞানবিজ্ঞান-

সহ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাঁহারা এই জন্য আত্মোৎসর্গ করিবেন। আর কতকগুলি আদর্শ গৃহস্থ হইবেন, তাঁহারা সংসারধর্ম্ম করিয়া অনাসক্ত হইবেন, তবে আবার ব্রাহ্মসমাজের শক্তি জাগিবে।"

আহারাদি করিয়া ষ্টেশনে আসিলাম, আমি যখন টিকিট করিতেছি তখন সুরেন্দ্রবাবু একটু বুঝিতে চেষ্টা করিলেন যে আমার নিকট পাথেয় আছে কিনা, আমি বলিলাম আমার টিকিটের দাম আছে। ২—৪৫ মিনিটে ট্রেণ ছাড়িল। সন্ধ্যার সময় কংখল সেবাশ্রমে আসিলাম। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

রেণুকণা—শ্রীনিস্তারিণী দেবী প্রণীত। মূল্য আট আনা। ভেলুপুরা বেণারস সিটি গ্রন্থকর্ত্তার নিকট প্রাপ্তব্য। কুন্তলীন প্রেসে ছাপা হইয়াছে। একটি পারিবারিক ঘটনামূলক গল্প ও কয়েকটি শোকগাথা লইয়া এই পুস্তক খানি রচিত হইয়াছে। গল্পটি সংক্ষেপে এই—সুছায়া একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহাকে কে যেন "নানা বর্ণের মণিমাণিক্য বিভূষিত একখানি বিপণির ভিতর লইয়া গিয়াছে।" সেখানে অনেক সুন্দর 'পুত্তলিকা' ছিল; দর্শকগণ যথাক্রমে এক একটি করিয়া পাইলেন এবং সর্ব্বশেষ পুত্তলিকাটি সুছায়ার প্রাপ্য হইল। কিন্তু অপর একটি বালিকা সেই সুন্দর পুত্তলিকাটি হাত পাতিয়া চাহিল; সুছায়া কোনমতেই ইহা বালিকাটিকে দিতে পারিল না। একান্তভাবে চাহিয়া চাহিয়া না পাইয়া বালিকা খুব কাঁদিতে লাগিল। সুছায়া বিষম সঙ্কটে পড়িল—এমন সময় সুছায়ার মাতা আসিয়া "আচ্ছা আমাকে দাও, তোমাদের কেহই লইবে না" বলিয়া, সুছায়ার নিকট হইতে যেমন লইতে যাইবেন অমনি "স্বর্ণপুত্তলিটি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া গেল।" ইহার কিছুদিন পরে সুছায়ার শিশু কন্যাটির মৃত্যু হইল। ডাক্তারেরা কোন মতেই বাঁচাইতে পারিল না।

পুস্তক খানি পাঠ করিয়া তেমন তৃপ্তি পাইলাম না। লেখিকা চাতুর্য্যের সহিত গল্পটি লিখিতে পারেন নাই এবং চরিত্রগুলিও ভালরূপে পরিস্ফুট হয়

নাই। কেবল অম্বার স্বার্থত্যাগ ও সুছায়ার মাতৃস্নেহ বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুছায়ার এই কথাগুলি পাঠ করিলে যথার্থই মনে দুঃখ হয়—"ওগো কাকা বাবু! আমার কণা কেন এমন হয়েছে? আমি তাকে চাই আর কিছু নয়।" লেখিকার ভাষা ভাল।

কবিতাগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে হৃদয়ের দুঃখের সহিত এইগুলি লেখা হইয়াছে। অতএব ইহার উপর সমালোচনা চলে না। "জাহ্নবী তীরে" কবিতাটি 'চলনসই'। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ ভাল।　　বঃ

স্থানীয় সংবাদ।

পরীক্ষার ফল—আমরা গত বারে ম্যাট্রিকুলেসান্ পরীক্ষোত্তীর্ণ আর একটী ছাত্রের নামোল্লেখ করিতে ভুলিয়াছিলাম, সেটী খাঁটুরা এবং কলিকাতা কাঁটাপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজরাজ দত্তের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ মাখমলাল দত্ত, ওরিএন্টেল-সেমিনারী হইতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন হয়দারপুর এবং কলিকাতা রাজবল্লভপাড়া নিবাসী পরলোকগত দুর্গাচরণ দের পুত্র শ্রীমান্ নিতাইহরি দে, পাটনা কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বিগত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বিচারে দণ্ড।—বিগত ৬ই মে বারাসাতের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসুর এজলাসে একটী মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি হইয়াছে। মোকদ্দমার বিষয় এইরূপ ছিল,—বিগত চৈত্র মাসে গৈপুর ওলাবিবিতলার মেলার সময় স্থানীয় জমিদার গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মৈত্র হস্তী পৃষ্ঠে মেলাস্থানে উপস্থিত হইয়া গৈপুরের শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যে লোক মেলায় তোলা তুলিতেছিল, তাহাকে তাড়াইয়া দেন এবং চারুবাবুর প্রতি অপমান সূচক শব্দ প্রয়োগ করেন, এই মর্ম্মে বারাসাতের ফৌজদারী আদালতে নালিশ হয়। কুঞ্জবাবুর বিচারে কেশব বাবুর ১৲ একটাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে। প্রজাগণের মধ্যে বিবাদ বাধিলে পূর্ব্বে গিরিজাপ্রসন্ন বাবু নিজে কষ্ট স্বীকার

করিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিতেন, এক্ষণে তাঁহার কর্ম্মচারীর কার্য্য এমত হইতে চলিল কেন ?

রাস্তার দুর্গতি—খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের উত্তর দিক দিয়া যে কাঁচা রাস্তা গৈপুর, ইছাপুর গিয়াছে, এখন ঐ রাস্তায় বহুলোকের ষ্টেশনে যাতায়াত করিতে হয়; কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহাতে কিঞ্চিৎ খাব্‌রা দিবার মিউনিসিপালিটীর কি সুবিধা হইল না ? এই বর্ষার কাদায়, তাড়াতাড়ি টেুণ ধরিতে এবং রাত্রিকালে জুতা খুলিয়া ভদ্রলোকদিগের যাতায়াত যে কি দুর্গতি জনক তাহা সহজেই অনুমেয়। এ সম্বন্ধে আমারা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান ও কমিসনার মহোদয়গণের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

খাঁটুরা বালিকাবিদ্যালয়—বিগত ২২শে জ্যৈষ্ঠ খাঁটুরা দত্তবাটীতে "তাম্বুলী সমাজের" এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র পাল, বালিকাদিগের লেখাপড়া শিক্ষার প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন; তাহাতে প্রায় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হয় যে, শীঘ্রই একটী বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা আবশ্যক। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, গ্রামের কয়েকটী খ্যাতনামা উপযুক্ত ব্যক্তি ইহার কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শীঘ্রই একটী বালিকাবিদ্যালয় আপততঃ খাঁটুরা দত্তবাটীতে খোলা হইবে, এবং ইহার কার্য্যক্ষেত্র যাহাতে ভবিষ্যতে প্রসারিত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা হইবে।

উপাধিলাভ—সময়ের ফল ভাল হউক বা মন্দ হউক, তাহার স্বাদগ্রহণ করিতে হয়, না করিলে মনে একটা আক্ষেপ থাকে। এবার নবীন সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে গোবরডাঙ্গার জমীদার বাবু গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছেন। গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর যে সম্মান কুশদহবাসীর নিকট আছে, ইহাতে তাহার যে কিছু আধিক্য হইবে তাহা বোধ হয় না। তথাপি তিনি যে, রাজসম্মান লাভ করিলেন, ইহা কুশদহবাসীর পক্ষে কর্ণ-সুখ-কর হইল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

Printed by J. N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

সূচী ও নিয়মাবলী ভিতরে দেখুন।

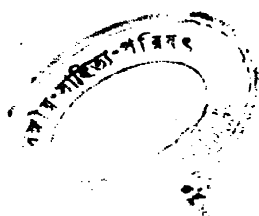
দ্বিতীয় বর্ষ]   আষাঢ়, ১৩১৭।   [৯ম সংখ্যা।



গাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়
সম্বলিত, ধর্ম্ম, সমাজ ও
বিবিধ বিষয়ক
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

কুশদহ-কার্য্যালয়
২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



ভক্ত-পূজা।

মানুষ যে কেবল ভগবানকে ডাকে তাহা নহে, ভগবানও মানুষকে নিয়ত ডাকিতেছেন।

"যে তোমারে ডাকেনা হে, তারে তুমি ডাকো ডাকো,
তোমা হ'তে দূরে যে যায় তারে তুমি রাখো রাখো।"

যিনি ভগবানের ডাক শুনিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার চরণাশ্রয় করিয়াছেন,—তাঁহার আদিষ্ট কার্য্যে দেহ, মন, আত্মা সমার্পণ করিয়াছেন তাঁহার চরণে আমি শত সহস্র প্রণাম করি।

কথিত আছে,—একদা নারদঋষি ভগবান্ সন্নিধানে উপনীত হইয়া দেখিলেন তিনি উপাসনা করিতেছেন। নারদ বড়ই আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, এতদিন জানিতাম বিশ্বজগত ভগবানের উপাসনা করেন, ভগবান্ কেবল তাহা গ্রহণ করেন। কিন্তু আজ দেখিতেছি তিনিও অন্যের উপাসনা করিতেছেন, তবে কি তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠ কেহ আছেন? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন নারদের ভগবত সন্দর্শন হইল তখন তিনি নিবেদন করিলেন প্রভু! আজ বড় আশ্চর্য্য হইলাম, এতদিন জানিতাম সমস্ত ভক্তগণই আপনার পূজা-উপাসনা করেন, আপনি কেবলমাত্র তাহা গ্রহণ করেন, কিন্তু আজ দেখিতেছি আপনারও উপাস্য আছেন। আপনি যে কাহার উপাসনা করেন তাহা বুঝিলাম না। ভগবান্ ঈষদ্ধাস্তে নারদবাক্যের উত্তর করিলেন নারদ! আমিও বড় আশ্চর্য্য হইলাম যে, তুমি এত দিনেও এ বিষয় জানিতে পার নাই। আমি তো চিরদিনই উপাসনা করি। কথার সুযোগ পাইয়া নারদ বলিলেন ঠাকুর! আপনি কাহার উপাসনা করেন? শ্রীভগবান্ প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে নারদের দিকে

অবলোকন করিয়া বলিলেন নারদ! এই দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে সকলই জানিতে পারিবে। নারদ চাহিয়া দেখিলেন অসংখ্য যোগী, ঋষি, ভক্ত; তাহার মধ্যে নিজেকেও দেখিতে পাইলেন। অতঃপর নারদ ভক্তিবিগলিত চিত্তে ভগবানের চরণ বন্দনা করিতে করিতে ভগবদুক্তি শুনিলেন—

"যে মে ভক্তজনাঃ নারদ ন মে ভক্তাশ্চতে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

হে নারদ! যাহারা আমার ভক্ত বলে তাহারা আমার ভক্ত নহে, আমার ভক্তদের যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারাই ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

ইহা শুনিয়া নারদ আনন্দে গদ গদ হইয়া দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তনে মগ্ন হইলেন। ভক্তসঙ্গে ভগবানও গাইলেন

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ।"

দাস—

অঞ্জলি।

আমি যে চাহি—হে জীবন-স্বামী,
তোমারে ধরিয়া থাকিতে,
আমি যে চাহি—সারা নিশি দিন
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে;
তুমি যে সদা নিমেষের তরে
দেখা দিয়ে যাও চলিয়া,—
কত যে খুঁজি, নাহি পাই দেখা
আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া।
শূন্য হৃদয় হের যদি মোর
—ভরে দাও প্রেম-সুধাতে,
নির্ম্মল কর মলিন মরম
তোমার পুণ্য-আভাতে।

কল্যাণ-গীতি হউক ধ্বনিত
　　হৃদয়-তন্ত্রী মথিয়া ;
পাপের স্মৃতি দূরে যাক্ চলে
　　তব পূত-নাম শুনিয়া।
মঙ্গলময় নাম-সুধা পানে
　　উঠুক্ চিত্ত ভরিয়া ;
ভকতি-হীনে দাও নব-প্রাণ
　　কৃপা-বারি তব সিঞ্চিয়া।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

শাস্ত্র সঙ্কলন।

৫০। ঊর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকম্।
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ১।২৫।২৬

অদৃশ্য বস্তুর চিন্তা হইতে পারে না, দৃশ্য বস্তুও বিনষ্ট হয়। অতএব যোগিগণ সেই বর্ণহীন পরব্রহ্মকে কিরূপে ধ্যান করেন? সেই চিংস্বরূপ পরমেশ্বর ঊর্দ্ধে পরিপূর্ণ, অধোতে পরিপূর্ণ, মধ্যে পরিপূর্ণ, সকলই পূর্ণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, ঈশ্বরে চিত্ত সমাধানের ইহাই লক্ষণ জানিবে।

৫১। পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ২।২।৩৭

যাঁহারা ভক্তগণের সঙ্গে বসিয়া পরমাত্মার কথামৃত শ্রবণপুটে পান করেন, তাঁহারা আপনাদের বিষয়কলুষিত চিত্তকে পবিত্র করেন এবং তাঁহার চরণারবিন্দ লাভ করেন।

৫২। অতএব শনৈশ্চিত্তং স প্রসক্তমসতাং পথি।
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েৎ বশম্॥ ভাঃ ৩।২৭।৫

অতএব গাঢ়ভক্তিযোগে ও বৈরাগ্যসহকারে অসৎপথাবলম্বী সংসারাসক্ত-চিত্তকে অল্পে অল্পে বশীভূত করিবেক।

৫৩। যস্য যদ্দৈববিহিতং স তেন সুখদুঃখয়োঃ।
আত্মানং তোষয়ন্ দেহী তমসঃ পারমৃচ্ছতি॥ ভাঃ ৪।৮।৩৩

ঈশ্বর যাহাকে যাহা দান করিয়াছেন তদ্দ্বারা সুখদুঃখের মধ্যে আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিলে মনুষ্য মুক্তি লাভ করে।

৫৪। যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণো মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥
ভাঃ ৫।১৮।১২

যাঁহার ভগবানেতে অকিঞ্চন ভক্তি আছে, সমুদায় দেবগুণ আসিয়া তাঁহাতে অধিবাস করে। হরিতে অভক্ত ব্যক্তির মহদ্গুণের সম্ভাবনা কোথায়, কেন না মনোরথযোগে সে বাহিরে বাহিরে অসদ্বিষয়ে ধাবমান।

৫৫। তৈস্তান্যধানি পূজন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া॥ ভাঃ ৬।২।১৭

সাধকগণ তপ, দান ও ব্রতাদি দ্বারা দূষিত কার্য্যকে পবিত্র করেন, কিন্তু কলুষিত হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারেন না, তাহা কেবল ঈশ্বরের পদ-সেবাতেই পবিত্র হইয়া থাকে।

৫৬। যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে। ভাঃ ৯।৪।৬৫

যাহারা স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, আত্মীয়, প্রাণ, বিত্ত, ইহলোক, পরলোক, পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, আমি কিরূপে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি?

৫৭। ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা। ভাঃ ৯।৪।৬৬

যে সকল সমদর্শী সাধু আমাতে নিবদ্ধহৃদয়, তাহারা সতী স্ত্রী যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে, তেমনি আমায় ভক্তি দ্বারা বশীভূত করে।

৫৮। সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।

মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি। ভাঃ ৯।৪।৬৮

সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়, আমাব্যতীত তাহারা আর কাহাকেও জানে না, আমিও তাহাদিগের ব্যতীত কিছু জানি না।

(ক্রমশঃ)

পূর্ব্বজন্ম আছে কি না ?

'কুশদহ'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষে "পূর্ব্বজন্ম আছে কি না ? এই সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচ্য" যে প্রতিজ্ঞা ছিল, এ প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য বিষয়।

ঐ প্রবন্ধে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বর্ত্তমান জন্মের পর এই পৃথিবীতে আর এইরূপ স্থূলদেহে জন্ম না হইয়া সূক্ষ্ম দেহে আত্মার উন্নতি হইতে পারে। তাহাতে স্বতঃই একথা বলা হইয়াছে যে, এই জগতে এইরূপ স্থূলদেহে পূর্ব্বজন্মও ছিল না। কেন না, এ জন্মের পর যদি আর জন্ম না হয়, তবে পূর্ব্বে আরও জন্ম ছিল তাহা বলা চলে না। তাহা হইলে বর্ত্তমান জন্মই যে পর জন্ম নহে তাহা কে বলিল ? এই জগতে একাধিকবার জন্ম স্বীকৃত হইলে ততোধিকবার জন্ম হয় নচেৎ হয় না। সুতরাং পুনর্জন্ম অস্বীকারের সহিত পূর্ব্বজন্ম অস্বীকৃত হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তাহা হইলে এই বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে মানবাত্মার বা মানবজন্মের কীদৃশ অবস্থা ছিল এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ উপস্থিত হইতে পারে। এবং তাহার সঙ্গে এ প্রশ্নও আসিতে পারে যে, যদি পূর্ব্বজন্ম না থাকে, তবে মানুষের একই জন্মে এত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হয় কেন ? তাহার উত্তরে প্রথম কথা এই যে,—

আমরা মানবমণ্ডলী ছাড়িয়া যদি উদ্ভিদরাজ্যে বৃক্ষলতার বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব একটী গাছে যত পাতা কিম্বা ফল পুষ্প হয়, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকটী একরকমের নহে। একটীর সঙ্গে অপরটীর

কিছু না কিছু প্রভেদ আছে। এ ভেদ হয় কেন? বৃক্ষলতা কি পাপপুণ্য কর্ম্মফলের অধীন যে, কোনোটা পুণ্যফলে সুপুষ্ট, সুপক্ক আর কোনোটা পাপের ফলে কাণা কুঁজ অকালপক্ক হইল? অবশ্য একথা কেহই বলিবেন না যে, তাহারা ঐ নিয়মাধীনে হয়। সুতরাং এই কথাই সত্য যে, বৈজিক দোষগুণে মৃত্তিকার রস, জল, বায়ু, তাপ, তেজ আকর্ষণের তারতম্যে ঐরূপ হয়। তবে মানবদেহ উৎপত্তি সম্বন্ধেও যখন ঐ প্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম বিদ্যমান দেখা যায়, তখন তাহাও ঐরূপ বিচিত্র হইবে না কেন?

পাঞ্চভৌতিক উপাদানেই দেহের গঠন হয় একথা সত্য হইলেও কতকটা জল, মাটী, তাপ, তেজ, বায়ু মানবী-গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া দেহ হয় না। ভুক্ত বস্তুর ভিতর দিয়া পাঞ্চভৌতিক উপাদানে, শুক্র শোণিত যোগেই দেহের উৎপত্তি হয়। শুক্র শোণিতের ক্রিয়াপ্রণালী এক হইয়াও অসংখ্য মানব প্রবাহে প্রবাহিত, অথচ প্রত্যেকটী ভিন্ন, এজন্য একাত্মজ, এক ক্ষেত্রজ পাঁচ ভ্রাতা পাঁচ প্রকারের হয়। তাহার আরও এক কারণ, জন্মকালের অবস্থা, সময়, এবং সৌরজগতের গতি পার্থক্যে প্রত্যেকের দেহ, মন ভিন্ন হইয়া যায়। যাঁহারা এ সকলের সূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসু নন, তাঁহারা বিনা চিন্তায় বিনা বিচারে গতানুগতিক ভাবে প্রচলিত সংস্কারে বিশ্বাস করিয়াই চলিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে মানুষ নিজেই নিজের কর্ম্মফল ভোগ করে, একথা আংশিক সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। কেন না, কার্য্যক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, মানুষ কেবল নিজের জন্য নিজে নহে। প্রত্যেকেই বহুর ফলস্বরূপ। প্রত্যেকটী বহুর সঙ্গে ভালমন্দ সুখদুঃখে জড়িত। একে যেমন অপরের সদ্বিষয় লাভে উপকৃত, তেমন পাপ অপরাধের জন্যও প্রপীড়িত। দেহ, মন, প্রকৃতি ইহার কিছুই আকস্মিক নহে, সকলই বংশ পরম্পরাগত ধারাবাহিক। সুতরাং যে যেমন ক্ষেত্র হইতে এই স্থূল দেহ এবং মন প্রাপ্ত হয়, সে তেমনই হয়। কেবল তাহা নহে সমাজ, সঙ্গ, শিক্ষা প্রভৃতি বহুবিধ কারণে একটীকে আর একটী হইতে পৃথক করিয়া ফেলে। সৃষ্টি শক্তিও অনন্ত-মুখী, বিচিত্রতাই তাহার কার্য্য এবং সৌন্দর্য্য। তজ্জন্যও একটী অপরটীর মত হয় না।

এখানে অনেকের মনে এক গভীর সন্দেহ উঠিতে পারে তাহা এই যে, তবে কি সকলই স্বভাবের খেলা, এখানে পাপ পুণ্যের কোন প্রভেদ নাই? উদ্ভিদ রাজ্য ও মানবরাজ্যে একই নিয়ম?

এ প্রশ্নের উত্তর প্রবন্ধের যথাস্থানে দেওয়া হইবে। এখন প্রথম প্রশ্নের উত্তরে পূর্ব্বজন্ম বা পূর্ব্ব কর্ম্মফল ব্যতীত বর্ত্তমান জন্মে যে সকল কারণে একটীর সঙ্গে অপরটীর প্রভেদ ঘটে তাহা বোধহয় প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় উত্তর এই যে, পূর্ব্ব জন্ম না থাকিলে বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে আত্মা এবং দেহের কি অবস্থা ছিল তাহা অগ্রে আলোচ্য।

পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের গবেষণাপূর্ণ অনুসন্ধানে একথা স্বীকৃত হইয়াছে যে, বহু পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া এই মানবদেহ বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে। আদিমাবস্থার কোন কোন জন্তুর অস্তিত্ব এখন পৃথিবীতে নাই। বর্ত্তমানে এমন অনেক জীব আছে যাহারা পূর্ব্বে ছিল না। আর ক্রমোন্নতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে একেবারে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। এক আকার হইতে ক্রমে অন্য আকারে যাহারা পরিণত হইয়াছে, তাহাদের ছোট বড় ভেদ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন বিষয়ও অতি আশ্চর্য্যজনক। কুম্ভীর হইতে হস্তীর পরিণাম কে সহসা ভাবিতে পারে? আর অনেকের মধ্যে অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য আছে। বিড়াল এবং বাঘের সাদৃশ্য প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন। অতএব আমরা চারিদিকে যে অসংখ্য জীবজন্তু কীট পতঙ্গ সকল দেখিতেছি, তাহারা অকারণ সম্ভূত নহে। তাহারাও মানবদেহের অংশ বিশেষ।

এই যে জীবপ্রবাহ যাহা দেখিয়া এদেশের সাধকগণ বলিলেন, চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে এই মানবজন্ম হয়। একথার ভিতর সত্য আছে। চুরাশী লক্ষ হউক বা চুরাশী কোটী হউক একথা সত্য যে, সহসা মানবদেহ-মনের উপাদান প্রস্তুত হয় নাই। মানবদেহের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে যে বহু কোটী বৎসর লাগিয়াছে তাহা সত্য। তথাপি অপর সকল প্রাণীর সঙ্গে মানবের একটা অতিশয় প্রভেদ দেখা যায়, তাহা আত্মার প্রভেদ। অর্থাৎ অপর সকল জীবের দেহ আছে, চেতনা আছে, তদূর্দ্ধে মন আছে, তারপর কিছু কিছু বুদ্ধির বিকাশ আছে এমন কি স্নেহ মমতা, কৃতজ্ঞতা, প্রত্যুপকারের ভাব পর্য্যন্তও কিছু কিছু দেখা যায়, কিন্তু আত্মা নাই। আত্মা মানে এখানে

যে জ্ঞান, বিবেক দ্বারা আপনার স্রষ্টাকে বুঝিতে পারে, এবং তজ্জন্য আপনার ব্যক্তিত্বের দায়ীত্ব বোধ করিতে পারে। দায়ীত্ববোধ বা পাপপুণ্যের জ্ঞান অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় না। আর একটা গভীর প্রভেদ এই যে, অন্যান্য সমস্ত জীবের উন্নতি সীমাবদ্ধ। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। কিন্তু মানবাত্মার উন্নতি এ শ্রেণীর নহে। বাইবেল শাস্ত্রে কথিত আছে, ঈশ্বর আর আর সকল সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বশেষে আপনার সাদৃশ্যে মানবের সৃষ্টি করিলেন। একথার ভিতরও বিলক্ষণ সত্য আছে। অর্থাৎ আত্মার সৃষ্টি পরমাত্মা নিজ সাদৃশ্যেই করিয়াছেন, নতুবা মানবাত্মা কখনই পরমাত্মার ভাব বুঝিতে পারিত না। অতএব এখন স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্যান্য জীবের সঙ্গে মানবের যে পার্থক্য তাহা বুঝিলাম। আর সে পার্থক্য যে আত্মা সম্বন্ধে তাহাও সত্য। সুতরাং অন্যান্য জীবদেহের উপাদান হইতে মানবদেহের উপাদান লইয়া এই মানব জন্ম হয় বটে, কিন্তু দেহের পরিণতি আত্মা হইতে পারে না। আত্মা কেবল পরমাত্মা-জাত। তাহা আত্মার স্বভাব দেখিয়া যোগী ঋষি ধর্ম্মাত্মাগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

এখন দেখা উচিত, আত্মা পশুপক্ষী দেহের পরিণাম ফল নহে। বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বেও মানবদেহে তাহার আর কোন জন্ম ছিল না, তবে মানবাত্মা কোন্ অবস্থায় কোন্ স্থানে ছিল, এবং এমন কি কারণ উপস্থিত হয় যে তজ্জন্য সে সহসা মানবদেহে এই বর্ত্তমান জন্ম পরিগ্রহ করে।

একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, জগদীশ্বর সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা। যেরূপেই হউক তিনি সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা যে এই সৌরজগতে বাস করি, এমন আরও কত কোটী কোটী জগত থাকিতে পারে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। কিন্তু যখন এই সৃষ্টি ছিল না তখনও তিনি আপনাতে আপনি ছিলেন, এখনও তদ্রূপে আছেন। সৃষ্টি থাকিলে বা না থাকিলেও তিনি থাকেন। হিন্দু দর্শনশাস্ত্র বলেন, সৃষ্টি অনাদি। এসম্বন্ধে যে সকল যুক্তি আছে, তাহা সমালোচনার এস্থান নহে। তবে একথার মধ্যে প্রধান আপত্তিজনক কথা এই যে, দুইটী অনাদি হয় না। জগত তাঁহার আশ্রিত, তিনি জগতের আশ্রিত নহেন। আর ঐ কথায় যাহা সত্য আছে, তাহা এই যে, যাহার মূলে যাহা নাই, তাহা হইতে কখন তাহার প্রকাশ হয় না। যেমন

আম গাছে জাম হয় না, মহিষের মেষশাবক হয় না। পক্ষান্তরে ঐ ক্ষুদ্র বটবীজের মধ্যে ঐ প্রকাণ্ড বৃক্ষের সম্ভাবনা থাকে বলিয়াই সময়ে বৃক্ষের বিকাশ হয়। যাহার সন্তান সম্ভাবনা থাকে তাহারই হয় কিন্তু সকলের তো হয় না। অনন্ত ঈশ্বরের, পূর্ণতার মধ্যে বীজাকারে হউক বা সম্ভাবনা রূপেই হউক অনাদিকাল হইতে সৃষ্টির মূল ছিল বলিয়াই যথাসময়ে তাহার প্রকাশ হইয়াছে, এখনও হইতেছে। অতএব এতক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর শেষ হইল এই যে, বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে জন্ম না থাকিলেও আত্মা পরমাত্মার মধ্যে অব্যক্তভাবে অথচ বীজাকারে বা সম্ভাবনারূপে বর্ত্তমান থাকে; তৎপরে তাঁহার অনন্ত অনির্ব্বচনীয় ইচ্ছাশক্তির বিধানে পাঞ্চভৌতিক উপাদানে যাহা অসংখ্য পশুপক্ষী প্রাণীপুঞ্জের দেহের পরিণতি ফল মানবদেহের উপাদানের উপযোগী হইয়া, অসংখ্য মানববংশাবলীর সম্বন্ধের ভিতর দিয়া এই দেহ, মন প্রকৃতির গঠন হইয়া থাকে। সুতরাং এই দেহ মনের বিভিন্নতা হইবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। বিচিত্রতা, দেহ মন, প্রকৃতিতে কিন্তু আত্মাতে নহে, আত্মা সমস্তই এক। এ সম্বন্ধে ও পাপপুণ্যের বিচার এবং কর্ম্মফল সম্বন্ধে আলোচনা বারান্তরের জন্য রহিল; আশা করি তজ্জন্য পাঠকপাঠিকাগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না।

ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা।

ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও ধর্ম্ম। শ্রীমচ্চিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত। এই উৎকৃষ্ট ভক্তিগ্রন্থ খানি অনেক দিন হইল প্রকাশিত হইয়া এক্ষণে ইহার চতুর্থ সংস্করণ হইয়াছে।

বিগত পাঁচশত বৎসর মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনাদর্শ ও ধর্ম্ম এত বিকৃত হইয়াছে যে, সাধারণ বৈষ্ণব সমাজ দেখিয়া তাঁহার জীবনের উচ্চভাব ও ধর্ম্ম প্রায় কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। ভক্তিভাজন গ্রন্থকার সমস্ত বৈষ্ণব শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা ভ্রম কুসংস্কার ভেদ করিয়া মহাপুরুষের জীবনের যে সুবিমল ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছে। ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্য আমাদের প্রিয়তম আদরের ধন এজন্য আমরা সর্ব্বসাধারণকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বিশেষতঃ বঙ্গীয় যুবকগণ এই ভক্তিতত্ত্ব পাঠ করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত সুমিষ্ট ভক্তি-

সুধারস পান করুন ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। বর্ত্তমান সময়ে এই গ্রন্থখানি বাংলার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে সন্ধান করিলে এই পুস্তক পাওয়া যায়। এত বড় গ্রন্থের মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থারম্ভের প্রথমেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন "যে সময় চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন, তখন এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান ও জনসমূহের জ্ঞান ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা আলোচনা করিলে অনেক শিক্ষা লাভ হয়; বর্ত্তমানকালের সঙ্গে তাহার তুলনা করিয়া দেখিলে অনেক বিষয়ে ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়।" তাই আমরা ঐ গ্রন্থের প্রথমাংশ হইতে কিঞ্চিৎ বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম।

নবদ্বীপের প্রাচীনাবস্থা।

"ইংরাজি ১২০৩ সালে মুসলমান সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজি যখন কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে নবদ্বীপ নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন হইতেই হিন্দু রাজত্বের সৌভাগ্য সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। ভীরু স্বভাব লক্ষণেয় শূরসেন যবন সেনাপতির সমাগমবার্ত্তা যাই শুনিলেন, অমনি পশ্চাদ্দ্বার দিয়া সপরিবারে নৌকারোহণপূর্ব্বক জগন্নাথক্ষেত্রে পলায়ন করিলেন, মুসলমানেরা দেশ অধিকার করিয়া লইল। এই সেন বংশীয় রাজাদিগের ভগ্নাবশেষ চিহ্ন কিছু কিছু এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে যে স্থান নবদ্বীপ বলিয়া খ্যাত, ইহার উত্তর পূর্ব্ব অর্দ্ধক্রোশ দূরে রাজা বল্লালসেন একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় এক বৃহৎ দীঘী খনন করেন। ইহা বল্লাল দীঘী নামে প্রসিদ্ধ। দীঘী ও বাটীর চিহ্ন অদ্যাপি কিছু বর্ত্তমান আছে। দীঘীর উত্তর দিকে বল্লালের ঢিবি নামে একটি উচ্চস্থান দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে মৃত্তিকাগর্ভে অনেকানেক প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ চিহ্ন সকল বর্ত্তমান ছিল।

পুরাতন নবদ্বীপ এখন আর নাই, গঙ্গার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্বে এই নগরের দক্ষিণে পশ্চিমে গঙ্গা ও পূর্ব্বদিকে খড়িয়া নদী বহমানা ছিল এই দুই নদী গোয়ালপাড়া নামক গ্রামের নিকট গিয়া মিলিত হয়। কিছু দিনান্তে ভাগীরথীস্রোত পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া নবদ্বীপের উত্তরাংশ ভগ্ন করত বল্লালদীঘীর দক্ষিণে খড়িয়া নদীর মধ্যে গিয়া পড়ে। গঙ্গার স্রোতে নগরের উত্তর দিক্ ভগ্ন হওয়াতে অধিবাসিগণ ক্রমে দক্ষিণ দিকে আসিয়া বাস করেন, এই স্থান এখন নবদ্বীপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

কিছুদিন পর্য্যন্ত ইহা একটি সামান্য পল্লীর ন্যায় ছিল। পরে অনুমান চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এক জন যোগী এখানে আসিয়া এক দেবীর ঘট স্থাপন করেন। তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবীর মাহাত্ম্যও চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়ে। এই উপলক্ষে এবং সংস্কৃত অধ্যয়ন ও গঙ্গাস্নান করিবার মানসে নানা স্থান হইতে লোক সকল আসিয়া এই স্থানকে ক্রমে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে। এক্ষণে নবদ্বীপের উত্তর পূর্ব্বদিকে নির্ম্মল সলিলা স্রোতস্বতী ভাগীরথী প্রবাহিতা। কিন্তু নবদ্বীপকে একটি গণ্ডগ্রাম ভিন্ন এখন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না।

* * * বঙ্গীয় সমাজ অতি আধুনিক সমাজ, পূর্ব্বে এ দেশে সাঁওতাল ধাঙ্গড় কোল্ প্রভৃতিরই বসবাস ছিল। আর্য্যগণ কিরূপে এখানে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিলেন, বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি কি প্রণালীতে হইল, তাহা ঠিক করা যায় না। বোধ হয় রাজা আদিসুরের কিছু পূর্ব্ব সময় হইতে দেশীয় আদিম অসভ্য এবং আর্য্য বংশের সম্মিলনে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইয়া থাকিবে এবং তাহারাই হিন্দুরাজত্বের কালে, ক্রমে ভদ্র বঙ্গীয় সমাজ সংগঠন করিয়াছে। মুসলমানদিগের উৎপীড়নে সামাজিক উন্নতির স্রোত কিছু দিনের জন্য বদ্ধ হইয়া যায়। এখন ইহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে বিলক্ষণ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গসমাজে এখন এক মহা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সে কালের সঙ্গে এখন আর কিছুরই প্রায় ঐক্য দেখা যায় না।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি ভদ্রলোকদিগের সামাজিক অবস্থা অবশ্য কতক পরিমাণে তখন ভাল ছিল। কায়স্থেরা পার্সিবিদ্যা শিখিয়া নবাব-সংসারে রাজকর্ম্ম করিতেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা টোলধারী তাঁহাদের মধ্যেই শাস্ত্রচর্চ্চা অধিক ছিল, তদ্ব্যতীত গুরুপুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও নামমাত্র কিছু কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন, অপর ব্রাহ্মণগণ পাঁচ রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বাঙ্গালা ভাষার তখন জন্ম হয় নাই, প্রাকৃত গ্রাম্য ভাষা পার্সি এবং উর্দ্দুর সহিত মিলিত হইয়া এক প্রকার প্রচলিত ভাষা প্রস্তুত হয়, তাহা দ্বারা কার্য্য চলিত। অধিকাংশ ভদ্রাভদ্র লোকই মূর্খ ছিল। বিদ্যাবুদ্ধি শাস্ত্র ধর্ম্ম এ সমস্ত অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণেরা আপনাদের নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তখনকার স্ত্রী পুরুষদিগের শরীর দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং মন অত্যন্ত শাদা

দিত ছিল। পুরুষেরা খুব খাইতে পারিত, নিমন্ত্রণে গিয়া কেহ কেহ হয়ত এক বগুনা ডালই খাইয়া ফেলিত। আহারের বিষয়ে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। দাড়ি গোঁফ রাখার প্রথা ছিল না, কিন্তু সকলের মাথায় টিকি শোভা পাইত। ঘাড় কামান, থরকাটা, জুল্পি এবং দীর্ঘ কেশ তাহারা ভাল বাসিত। জুতা পায় দেওয়ার রীতি প্রায় ছিল না অনেকেই খড়ম ব্যবহার করিতেন। আহারের মধ্যে মোটা চাউল, পরিধান দেশীয় সূতার স্থূল বসন। চাকুরে লোকেরা অপেক্ষাকৃত সৌখীন ছিলেন। প্রাচীনেরা এখনকার মত পাড়ওয়ালা ফিন্‌ফিনে কাপড় পরা, বার্ণিষযুক্ত বুট পায়, গোঁফে কলপ মাখান সুখপ্রিয় বাবু ছিলেন না, তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; পাড়াপ্রতিবাসীর প্রতি যথেষ্ট স্নেহ মমতা করিতেন, আত্মীয় কুটুম্ব ভাই বন্ধু সকলকে লইয়া এক পরিবারে থাকিতেন, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেন। বাশূলী ও বিষহরির পূজা, মঙ্গলচণ্ডীর গান, ঢাকের বাদ্য, ভেড়ার ঢুঁ, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি আমোদের বিষয় ছিল। ষণ্ডাগোচের ভদ্রলোকেরা খুব পাঁঠা মহিষ ভেড়া বলিদান করিতে পারিত। স্ত্রীলোকেরা মোটা মোটা রূপার গহনা এবং নিজহাতে কাটা সূতার কাপড় পরিতেন। সমস্ত দিন ভাতরাঁধা, ধানভানা, গোবরনেদি দেওয়া, পৈতা তৈয়ার করা, শিকে বুনান, এই তাঁহাদের কার্য্য ছিল। পুরুষদের শাসনে স্ত্রীলোকেরা কাঁপিত, ঘোমটা একটু কম কিম্বা কথা একটু উচ্চ হইলে তাহার নিন্দা বাহির হইত। কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই চরিত্র সাধারণতঃ বিনম্র ধর্ম্মভীত ছিল। তখন সুখবিলাসের প্রতি লোকের এত দৃষ্টি পড়ে নাই।

* * * ব্রাহ্মণদের ভয়ানক প্রতাপ ছিল, তাহাতেই সাধারণ লোকদিগকে ধর্ম্মকার্য্য সাধনে বাধ্য করিত। গুরুপুরোহিতের সঙ্গে কোন কথার তর্ক বিচার চলিত না, কায়স্থ নবশাখ প্রভৃতি জাতিকে ব্রাহ্মণেরা অনায়াসে বাপান্ত করিতে পারিতেন, তাহাতে কাহারো দ্বিরুক্তি করিবার সাহস হইত না। তখন শূদ্র-দিগের পক্ষে সঙ্কটের কাল ছিল, তাঁহারা ব্রাহ্মণের সঙ্গে একত্র বসিতেও পাইতেন না।

ধর্ম্মের নিয়ম অনেকে পালন করিত, কিন্তু কেবল অক্ষরে, ভাব রক্ষা করিতে পারিতেন না। দুই পাঁচজন অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমুদয় স্ত্রীপুরুষ স্বার্থকামনায় এবং ভয় প্রযুক্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিত। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি তাহা

না জানিয়া তাহারা কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সংসার বাসনা চরিতার্থ করিত। নিষ্পাপ হইয়া ভগবানের পদারবিন্দ লাভ করিব, সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিব, চিন্তা বাক্য কার্য্য পবিত্র হইবে, ইন্দ্রিয়গণ বশে থাকিবে, ইষ্টদেবতার প্রতি প্রেমভক্তি অনুরাগ বিকসিত হইবে, এ সকল মহৎভাব তখন ছিল না, এক্ষণেও সাধারণতঃ তাহা নাই। সন্তান সন্ততি আত্মীয় স্বজনের সঙ্কট পীড়া উপস্থিত হইলে সত্যনারায়ণের সিন্নী এবং মঙ্গলচণ্ডীর পূজা দেওয়া, সর্পভয়ে বিষহরির গান শুনা, ধন পরমায়ু বৃদ্ধি এবং সন্তানাদি লাভ, ভয় বিপদ হইতে উদ্ধার ইত্যাদি নিকৃষ্ট কামনা চরিতার্থের জন্য দেবতা বিশেষকে মানস করিয়া পূজা ভোগ বলিদান দেওয়া হইত। ইহা ব্যতীত অন্য অভাববোধ ছিল না, সুতরাং ঠাকুরের অন্য কোন গুণ কেহ দেখিতে পাইত না।

* * * অধিকাংশ ভদ্রলোক শাক্ত ছিল, অল্প দুই পাঁচ জন বৈষ্ণব ছিলেন; কিন্তু সমাজ মধ্যে তাঁহাদের কোন প্রাধান্য দেখা যাইত না। জ্ঞানী হিন্দু দুই এক জন গীতা ভগবত পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু তাহার যথার্থ ভাবার্থ কেহ প্রায় বুঝিতে পারিতেন না। * * * প্রকৃত বিশ্বাস ভক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান অতি অল্প লোকের মধ্যেই ছিল। দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত কেহ কোন নিয়মের অন্যথাচারণ করিলে তজ্জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধি প্রচারিত ছিল। ভিতরে ভিতরে অনেকেই অনেক নিয়ম ভাঙ্গিতেন, প্রকাশ হইলেই তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। ব্রাহ্মণের শূদ্রান্নভোজন, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন, সাক্ষ্যদান শূদ্রের দান প্রতিগ্রহণ, ভিন্ন জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন ইত্যাদি কার্য্য নিষিদ্ধ, কিন্তু বিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিলে এ সকল কার্য্যে বিশেষ আপত্তি থাকিত না। মিথ্যা কথা বলিলে নরক হয়, কিন্তু অবস্থা বিশেষে তাহা বলিবে। অন্যায় উপার্জ্জিত ধনের কিয়দংশ যদি দেবদেবীর পূজায়, ব্রাহ্মণ ভোজনে, কিংবা দাতব্য কার্য্যে ব্যয় করা যায়, তবে তাহাতে আর দোষ স্পর্শে না। * * * একবার কোন বিশেষ পর্ব্বে, বা চূড়ামণিযোগে গঙ্গাস্নান করিয়া কিংবা গ্রহণের সময় পুরশ্চরণ করিয়া তাহার পর পাপ পুণ্যের জমা খরচ কাটিয়া দেখ, পুণ্য চিরকাল ফাজিল দাঁড়াইবে। একবার গঙ্গায় অবগাহন করিলে যদি কোটি জন্মের পাপ ক্ষয় হয় তবে তুমি কত পাপ করিবে? এ প্রকার পুণ্যকার্য্য শত শত ছিল, যাহা অতি সহজে লোকে সম্পন্ন করিতে

পারিত। * * * এমন অবস্থায় কেহ যদি হঠাৎ আসিয়া বলে যে সংসার বাসনা ছাড়িয়া বৈরাগী হও, চরিত্রকে পবিত্র কর, প্রেমভক্তিতে মাত, সাধুসঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে যে নিতান্ত উপেক্ষিত অপদস্থ হইতে হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? মহাত্মা চৈতন্যের সময় ঠিক এইরূপ ছিল। বামাচারী ভক্তিবিরোধী শাক্তগণ এক অদ্ভুত জীব ছিলেন। তাঁহাদের কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, গলে রুদ্রাক্ষমালা, হস্তে সুরাপূর্ণ নর-কপাল, গাত্রে কালীনামাঙ্কিত নামাবলী; যখন মদ্যমাংসাদি পঞ্চমকারের সেবার্থ ভৈরবীচক্রে তাঁহারা উপবেশন করিতেন, তখনকার ভীমমূর্ত্তি দেখিলে হৃৎকম্প হইত। সুরাপান করিয়া ইহারা রাক্ষসের ন্যায় পথে পথে বিচরণ করিতেন। কেহ কেহ বলিতেন, আমরা সুরাকে গঙ্গাজল, এবং মাংসকে জবাফুল করিতে পারি। তাঁহাদিগকে আর আর সকলে সিদ্ধপুরুষ বলিত। শক্তি উপাসনার সমধিক প্রাবল্য হেতু সে সময় অনেক লোক মাংসাশী হইয়াছিল। যাহারা নিতান্ত ষণ্ডামার্ক তাহারা নেশার ঝোঁকে কখন কখন কৃষ্ণবর্ণ কুকুর দুই একটা ধরিয়া টানাটানি করিত। বামাচারীরা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিয়াও তাহা পাপ বলিয়া বুঝিতে পারিতে না।

এদিকে ব্রাহ্মণত্বের গৌরব, জাত্যভিমান, মায়াবাদের কঠোর ধর্ম্মমত, তার্কিকতা, অসার ধর্ম্মাভিমান; অপরদিকে ধর্ম্মযাজকদিগের কপট ব্যবহার, স্বার্থপরতা, বামাচারিদিগের পঞ্চমকার, এবং সাধারণ লোকের সাংসারিকতা, কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, প্রেমভক্তি বিহীনতা, ইহারই মধ্যে ভক্তিভাজন চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। সে সময়ে নবদ্বীপে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ যে কয়জন লোক ছিলেন তাহার মধ্যে অদ্বৈত আচার্য্য প্রধান। নিবাস ইঁহার শান্তিপুরে, কিন্তু নবদ্বীপেও মাঝে মাঝে তিনি থাকিতেন। আর শ্রীহট্ট প্রদেশের শ্রীবাস এবং শ্রীরাম পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর দেব এবং মুরারি গুপ্ত। এই চারিজন এবং চট্টগ্রামবাসী বাসুদেব দত্ত ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি; এই কয় ব্যক্তি ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। ইঁহারা সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। হরিভক্তি যে তখন একেবারে ছিল না তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তির প্রথম প্রবর্ত্তক, গীতা ও ভাগবতোক্ত ভক্তির কথা সকল তাঁহারই মুখবিনির্গত। অর্জ্জুন ও উদ্ধবের সঙ্গে তাঁহার এ বিষয়ে যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা অতি মনোহর। পূর্ব্বকালে ব্যাস, নারদ,

যুধিষ্ঠির অম্বরীষাদি দেবর্ষিরাজর্ষিগণের ও ধ্রুব প্রহ্লাদের এবং পরে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে মাধবাচার্য্য এবং রামানুজ সম্প্রদায়ে যে ভক্তিভাব ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এ সময় বঙ্গদেশেও দেখা যাইত। কয়েকজন বৈষ্ণব, শাক্তদিগের ভয়ে অতি সংগোপনে গভীর রজনীকালে কখন শ্রীবাসগৃহে, কখন বা অদ্বৈতের সঙ্গে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। তাহা শুনিয়া অভক্ত শাক্তগণ বৈষ্ণবদিগকে নিন্দা করিত, ভয় দেখাইত, অভিশাপ দিত এবং তাহাদের সাধন ভজনকে দেশের অমঙ্গলের কারণ মনে করিত। যবন হরিদাস সেই সময়ের লোক। তাঁহাদিগের উপর শাক্তেরা ভয়ানক উৎপাত করিত। শক্তি উপাসকদিগের দল বল বেশী ছিল, তাহাদের ভয়ে হরিভক্তি লোকের মনে স্থান পাইত না। লোকের দুর্ম্মতি ধর্ম্মভ্রষ্টতা কপটাচার দেখিয়া অদ্বৈতাদি ভক্তগণ এইরূপ প্রার্থনা করিতেন যে "হায়! ভগবান্ ভক্তি দিয়া জীবগণকে কবে উদ্ধার করিবেন? কবে তিনি অবতীর্ণ হইবেন?" অদ্বৈত একদিন মনের দুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়া উপবাস করিয়াছিলেন। এমন সময় সেই লুপ্ত প্রায় ভক্তিকে উদ্ধার করিবার জন্য চৈতন্যদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন।

ঘোর অনাবৃষ্টির পর জলপ্লাবনের ন্যায় চৈতন্যের জীবনরূপ ভক্তিরসের উৎস উৎসারিত হইয়া বঙ্গসমাজকে প্লাবিত করিল। ভূতভাবন ভগবান্ যেমন পৃথিবীকে ফল শস্য জীবন জ্যোতিতে সজ্জিত করিবার জন্য সূর্য্যরশ্মি দ্বারা ধরাতলস্থ মলিন জঞ্জালরাশি হইতে বাষ্প নিষ্কর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে মেঘরূপে পরিণত করত সুশীতল বারিধারা বর্ষণ করেন, তেমনি তিনি পাপীর গতি হইয়া আবার যথা সময়ে মনুষ্যকৃত রাশি রাশি পাপ দুর্গন্ধের মধ্য হইতে স্বীয় পুণ্যবলে ভক্ত মহাপুরুষদিগকে উৎপাদন করত ধর্ম্মবিপ্লব ঘটাইয়া দেন। তাঁহার ভক্ত তাঁহার কৃপাবলে নির্ম্মল ভক্তিবারি বর্ষণ পূর্ব্বক জীবদিগের হৃদয়োদ্যান হইতে নানাবিধ ভাব কুসুম এবং পুণ্যফল বিকাশ করিয়া তাঁহারই মঙ্গল চরণে পুনরায় তাহা উপহাররূপে প্রদান করিয়া থাকেন। চৈতন্যদেব এই প্রেমের উদ্যান হইতে যে এক অপূর্ব্ব পুষ্পস্তবক রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধুর আঘ্রাণ এখনও সমাজকে আমোদিত করিতেছে। তাঁহার অভ্যুদয়ে ভক্তি সমুদ্র প্রভূত বেগে উদ্বেলিত হইল, এবং তাহার এক প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া কঠোর কুতার্কিক পাষণ্ড বিষয়ী বামাচারী মদ্যপায়ী সকলকে সবলে আঘাত করিল। একা গৌরাঙ্গের

ভক্তি প্রস্রবণ হইতে শত শত ভক্তিনদী সংরচিত হইয়াছে। শাক্ত ধর্ম্মের আসুরিক আচার ব্যবহার, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের জ্ঞানগর্ব্বে, কঠোর কুতর্কে অপর সাধারণ নরনারীর হৃদয়ও শুষ্ক নীরস হইয়া গিয়াছিল; বিনয় ভক্তি প্রেমোন্মত্ততা সদাচার বৈরাগ্য ধর্ম্মনিষ্ঠা মুক্তির জন্য সরল ব্যাকুলতা পিপাসার কোন চিহ্ন দেখা যাইত না; সেইকালে বহুল প্রতিকূলতার মধ্যে ভক্তচূড়ামণি গৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া অজ্ঞান দীন দুঃখী সাধারণ নরনারীর তৃষিত প্রাণ ভক্তিরসে শীতল করিলেন।"

হিমালয় ভ্রমণ। (৯)

সেবাশ্রমে আসিয়া আমার নামের কয়েকখানি পত্র পাইলাম। তন্মধ্যে শ্রীমান্ শিবনাথ কর্ম্মকারের পত্রখানি অত্যন্ত সদ্ভাবপূর্ণ ছিল। "মেয়েটী তাহার বাড়ী আছে, তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই," এইরূপ লেখা ছিল।

২৬শে কার্ত্তিক। খুল্না হইতে স্ত্রীর একখানা পত্র পাইলাম। তাহাতে বুঝিলাম তিনি এ পর্য্যন্ত গোবরডাঙ্গার এ সমস্ত সংবাদ কিছুই পান নাই। খুলনায় যাঁহার গৃহে আমার স্ত্রী আছেন, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আজ এক পত্র ও স্ত্রীকে এক পত্র লিখিলাম, এবং দুই টাকা মণিঅর্ডার করিলাম এইজন্য যে, আমার স্ত্রী গোবরডাঙ্গায় আসিয়া যেন মেয়েটিকে খুলনায় লইয়া যান। আমি যত শীঘ্র পারি যাইতেছি।

এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া ভাবিতে লাগিলাম এখন কি করা কর্ত্তব্য। আর ত এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। এখন পঞ্জাব হইয়া যাইব, কি বরাবর দেশাভিমুখে যাত্রা করিব? আজসেবাশ্রমে আর একটী ঘটনা ঘটিল। উত্তর-কাশী হইতে পরমহংস মহাশয়ের শিষ্য তুরিয়ানন্দ স্বামী (হরিমহারাজ) আসিলেন। একদিন তাঁহার সঙ্গকরা উচিত মনে করিয়া আমার যাত্রা এক দিনের জন্য স্থগিত রাখিলাম।

তুরিয়ানন্দস্বামী রাত্রে আমার গান শুনিলেন এবং কিছু সৎপ্রসঙ্গ করিলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম "উত্তর-কাশী অতি মনোরম্য স্থান, সাধন ভজনের বিশেষ অনুকূল। তথাকার জল বাতাস আরও সুশীতল। হরিদ্বার হইতে ১০০ মাইল উত্তরে পর্ব্বতোপরি উত্তর-কাশী অবস্থিত।

২৮শে কার্ত্তিক বুধবার। সঙ্গের জিনিষপত্র আরো কমাইয়া ফেলিলাম। একটি ছোট ট্রাঙ্ক ছিল তাহা সেবাশ্রমে কেহই লইলেন না সুতরাং এমনি রাখিয়া দিলাম যাঁহার দরকার হয় লইবেন। জুতা দুই জোড়ার মধ্যে চটী জোড়াও ফেলিয়া দিলাম কেবল কম্বলে দুই খানা গৈরিক কাপড় ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকাদি মাত্র রহিল আর একটি লোটা।

বিদায়কালীন তুরিয়ানন্দ স্বামী আমাকে কিছু ফল উপহার দিলেন, আমার তাহা তত প্রয়োজনীয় মনে না হইলেও সাধুর দান গ্রহণ করিলাম। তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "আপনার আর সমস্তই ঠিক হইয়াছে, কেবল হাতে একটি কিছু থাকা আবশ্যক," এই বলিয়া সেবাশ্রম হইতে একগাছি বে-ওয়ারিস যষ্ঠী (পার্ব্বত্য লতা জাতীয়) আমার হাতে দিলেন। তাহাতে আমার মনে হইল ইহা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই হিতকর হইবে, বাস্তবিক সময়ে সময়ে উহা আমার যেন কিছু 'বল' আনিয়া দিয়াছিল।

যাত্রাকালীন গোবরডাঙ্গা হইতে বন্ধুবর জনার্দ্দনের পত্রের উত্তর আসিল, "যাঁর জিনিস তিনি লইয়া গিয়াছেন, আপনার আর কোন চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই, আপনার যাহা মনোবাঞ্ছা আছে তাহা পূর্ণ করিয়া আসুন।" অর্থাৎ আমার পত্রে শিবনাথ জানিতে পারিয়াছিল, যে আমার স্ত্রী খুলনায় আছেন সুতরাং সে যেমন আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিল তদ্রূপ তাঁহাকেও এইরূপ এক পত্র লেখে যে "আপনার কন্যাকে পাড়ায় রাখিয়া গিয়াছিল কিন্তু সে আমার বাড়ী আমার মেয়ের সঙ্গে মেয়ের মতই আছে, আপনার কোন ভাবনা নাই।" কন্যার মাতা এই সংবাদ পাইবামাত্র বহুদিনের "হারানিধি" সন্তান আসিয়া এইরূপ অবস্থায় আছে শুনিয়াই খুলনা হইতে গোবরডাঙ্গায় আসিয়া তাহাকে লইয়া পুনরায় খুলনায় গিয়াছেন। আমি জনার্দ্দনের পত্র পাইয়া যেমন নিশ্চিন্ত এবং আনন্দিত হইলাম তেমন ইহাতে আমার পঞ্জাব ভ্রমণে ভগবানের ইচ্ছার সায় পাইলাম। সমস্ত ঠিক হইয়া গেল।

কন্খল, ঋষিকেশ ও দেরাদুন, সর্ব্বশুদ্ধ এখানে আমি ২৪ দিন কাটাইয়া আজ সেবাশ্রমের আনন্দজনক বিদায় গ্রহণ করিলাম। (ক্রমশঃ)

প্রধান ঘৃত ব্যবসায়ীগণের বিপদ।

সহরে ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিলে, কলিকাতা-মিউনিসিপাল-আইনে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। প্রত্যহ সহরে দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল ইত্যাদি সহস্রাধিক মণ বিক্রয় হয়। বোধহয় সকলেই জানেন খাঁটী জিনিষ পাওয়া কত কঠিন। এরূপ অবস্থায় মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে ২।১টী ভেজাল খাদ্য বিক্রেতার জরিমানার কথা যাহা শোনা যায়, তাহাতে সাধারণের মনে ঐ আইনের সজীবতা প্রমাণ করে।

এই দণ্ডবিধানের মধ্যে সময় সময় যে সকল ঘৃত বিক্রেতার নাম দেখা যায়, তাহার মধ্যে বড়বাজার এবং হাটখোলার প্রধান ঘৃত ব্যবসায়ীদিগের ২।১ জনের নাম দেখা গিয়াছে। সহরের সকল স্থানেই ঘৃত বিক্রেতা বহু দোকানদার আছে কিন্তু প্রধান ঘৃত বিক্রেতা বা আড়তদার কয়েকজন মাত্র। তাঁহাদের এই ব্যবসায় কলিকাতায় বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। এই শ্রেণীর ঘৃত ব্যবসায়ী বড়বাজারের শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ শ্রীমানি, এবং হাটখোলার পরলোকগত মহানন্দ দত্তের পুত্র শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দত্তের নাম আমরা উল্লেখ করিতে পারি। ইঁহাদের ব্যবসায়ের প্রকৃত প্রণালী ও বর্ত্তমান বিপদের কথা হয় ত অনেকেই অবগত নহেন, সুতরাং সাধারণের অবগতির জন্য তৎসম্বন্ধে দুএক কথা বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

তাঁহাদের এই সহরে এমন কোন কারখানা নাই, যে তথায় ঘৃত গালাই বা অন্য কোনরূপ প্রস্তুতির কার্য্য হয়। এখানে কেবলমাত্র বিক্রয়ের স্থান বড় বড় দোকান বা আড়ৎ আছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের স্থানে স্থানে ইঁহাদের মোকাম আছে। তথায় এক একটি পুরাতন বিশ্বাসী ভদ্র কর্ম্মচারী বা মূলধনীর অন্যতম অংশীদার নিজেই থাকিয়া ঘৃত খরিদ করেন। প্রত্যেক মোকামের গঞ্জে বা বাজারে তাঁহাদের এক একটি কারখানাবাটী আছে। তথায় দৈনিক নানা পল্লীবাসী ব্যাপারিগণ, পল্লী সকল হইতে প্রত্যেকে ২।৫।১০/০ মণ করিয়া ঘৃত আমদানি করে। প্রতি মোকামে ২।৪টি খরিদদারের কারখানা থাকে। সকলেই বাজার দরে ঐ সকল ঘৃত কিছু কিছু খরিদ করেন। খরিদের সময় কাঁচা ঘৃত খরিদ করিতে হয়, তৎপরে তাওয়াই করিয়া তাহা হইতে 'মাটা'

(জলীয় এবং মলিন অংশ) বাহির করিয়া খাঁটী ঘৃত টিনের কানেস্তা বা মাটীর মট্‌কিতে (মট্‌কির ঘৃত বর্ত্তমানে ২।৪টি স্থানে হয় মাত্র) ভর্ত্তি করা হয়। তৎপরে ২।৫ দিনের মধ্যে ঘৃত জমিয়া গেলে, রেলে চালান দেওয়া হয়। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে এবং ঘটনাক্রমে কোন কোন মোকামের কার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে দেখিয়া বিশেষ অবগত আছি যে, ইঁহাদের ঘৃত প্রস্তুত প্রণালীতে কৃত্রিমতা নাই। তবে তাঁহারা কদাচ দণ্ডবিধানের মধ্যে পড়িয়াছেন কেন? তাহাই ইঁহাদের বর্ত্তমান 'বিপদ'।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইঁহারা মোকামে যে সকল ঘৃত খরিদ করেন তাহা দৈনিক বহু লোকের দ্বারা আমদানি হয়। খরিদের সময় তাঁহাদের চির অভিজ্ঞতামূলক পরীক্ষা এই যে—স্বাদ ও সৌগন্ধ গ্রহণ করিয়াই ভাল মন্দ নির্ণয় করেন। তা ছাড়া 'কেমিকেল যন্ত্র' তাঁহাদের নিকট কোনকালে থাকে না এবং তদ্রূপ উপায়ে শত শত জনের নিকট ঘৃত খরিদ করা সম্ভবপর নহে। কাজেই চক্ষু, নাসিকা, এবং জিহ্বা যন্ত্রই ইঁহাদের অবলম্বনীয়। এই যন্ত্রে যদি কখন কোন পদ (কোন ব্যাপারির ঘৃত) সন্দেহজনক হয় তাহা তাঁহারা খরিদ না করিয়া ব্যাপারিকে মৌখিক ভয় দেখাইয়া বিদায় করিয়া দেন। কেননা, তথায় এই কলিকাতা-মিউনিসিপাল-আইনের ন্যায় তদ্রূপ কোন আইন নাই। তৎপরে সেই ঘৃত আর কোথায় বিক্রয় করে তাহাও তাঁহাদের জানিবার কোন সুবিধা নাই। সুতরাং বর্ত্তমানে কি করিলে তাঁহাদের এই ঘৃত খরিদের পথ সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়, এবং তাঁহাদের এই 'কলঙ্ক-বিপদ' দূরীকরণে সক্ষম হইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহারা সম্প্রতি একটি কমিটি গঠন করিয়া এই বিষয় আলোচনা করিতেছেন। তাহাতে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত ইহা স্থির করিয়াছেন যে, পশ্চিম প্রদেশে যে সকল স্থানে তাঁহাদের মোকাম আছে, সেই সেই প্রদেশে যাহাতে এই আইন বিধিবদ্ধ হয় তজ্জন্য তাঁহারা ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া পাঠাইবেন।

———

কুশদহ (৭)

কালীপ্রসন্ন বাবু—খেলারাম বাবু যে বিষয়-বৃক্ষবীজ রোপণ করেন, কালীপ্রসন্ন বাবু তাহার মূলদেশে জল সিঞ্চন দ্বারা বর্দ্ধিত করেন এবং সারদাপ্রসন্ন বাবুর সময়ে তাহা ফুল-ফলে শোভিত হয়। ইংরাজী ১৮২২ সালে বৈদ্যনাথের মৃত্যু হয় এবং ইহার কয়েক বৎসর পরে বৈদ্যনাথের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। বৈদ্যনাথ বাবুর মাতা বার্ষিক ৪৮০০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া ৺ কাশীধামে বাস করেন।

কালীপ্রসন্ন বাবু বাল্যকাল হইতে দুর্দ্দান্ত ছিলেন; নিজের জেদ্ বজায় রাখিতে কখন পশ্চাৎপদ হইতেন না; সেই জন্যই তিনি বিষয় সম্পত্তি বাড়াইতে পারিয়াছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত ছাতুবাবু লাটুবাবুদিগের খুলনা জেলার অন্তর্গত চিরুলিয়া মধুদিয়া পরগণা জমীদারী ছিল, কিন্তু তথাকার প্রজারা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত বলিয়া তাঁহারা উক্ত জমীদারী বশে আনিতে না পারায় উহা কালীপ্রসন্ন বাবুকে ইজারা দেন। কালীপ্রসন্নবাবু অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া উক্ত পরগণা শাসন করেন। এই দাঙ্গার জন্য কালীপ্রসন্ন বাবুকে ২৪ ঘণ্টা জেলে থাকিতে হইয়াছিল, এবং গোবরডাঙ্গার দেওয়ানজী বাড়ীর কুঞ্জবাবুর পিতামহ এই সময়ে মোকর্দ্দমার তদ্বির করিয়া তাঁহাকে জেল হইতে বাহির করিয়া আনেন। কালীপ্রসন্ন বাবু ১৮৪৪ খৃঃ অঃ প্রাণত্যাগ করেন। কালীপ্রসন্নবাবুর সময়ে কুশদহতে দুইটি স্মরণীয় ঘটনা সংঘটিত হয়। একটি ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন, অন্যটি "মহামারীর" সূত্রপাত।

১। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে খ্রীষ্টান মিসনরি রেভারেণ্ড মে সাহেব চুঁচুড়াতে একটি মিসনরি স্কুল সংস্থাপন করেন। এতদ্দেশীয় ইংরাজী স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি সর্ব্বপ্রথম সংস্থাপিত হয়। তৎপরে হেয়ার স্কুল তৎপরে হিন্দু স্কুল স্থাপিত হয়। ইহাতে ইংরাজী শিক্ষার তত সুবিধা না হওয়ায় মহাত্মা রামমোহন রায় ১৮২৩ খৃঃ অঃ উক্ত বিষয়ে গবর্ণর জেনারল লর্ড আমহার্ষ্ট সাহেবকে ইংরাজী শিক্ষার অনুমোদন করিয়া একখানি পত্র লিখেন। এই আবেদন পত্রের ফলে ১৮৩৫ সালের ৭ই মে দিবসে এই স্থিরীকৃত হয় যে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই ইংরাজী শিক্ষার তরঙ্গ কালীপ্রসন্ন বাবুর সময়ে প্রথম কুশদহতে প্রবেশ করে।

কালীপ্রসন্ন বাবু নিজ পুত্র সারদাপ্রসন্নকে "শীল" সাহেব নামক একজন ইংরাজ শিক্ষক দ্বারা ইংরাজী শিক্ষা দিয়াছিলেন।

২। কুশদহতে যে বিষম মহামারী হইয়াছিল তাহা প্রথমে যশোহর জেলার অন্তর্গত গদখালি নামক গ্রামে আরম্ভ হয়। গদখালির এই মহামারী সম্বন্ধে কোন ভদ্রলোকের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহা নিম্নে লিখিত হইল।—

গদখালি গ্রামের প্রান্তভাগে দুইজন সিদ্ধ গোঁসাই বাস করিতেন। একজনকে বড় গোঁসাই অন্য জনকে ছোট গোঁসাই বলিত। বড় গোঁসাইএর দেহত্যাগের সময় হইলে ছোট গোঁসাইকে তিনি বলিলেন যেন তাঁহার দেহ সেইস্থানে সমাধি করা হয়। বড় গোঁসাইয়ের কথামত ছোট গোঁসাই, তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার দেহকে সেইস্থানে পুঁতিয়া রাখিলেন। তৎপরে ছোট গোঁসাইয়ের কালপূর্ণ হইয়া আসিলে তিনি গদখালির তাৎকালিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রায়চৌধুরী মহাশয়কে ডাকাইয়া তাঁহার দেহ বড় গোঁসাইয়ের পার্শ্বে সমাধি করিতে অনুরোধ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন, কিন্তু রায়চৌধুরী মহাশয় ও অন্যান্য লোকে তাঁহার দেহকে পুড়াইতে লাগিলেন। তখন শীতকাল। বাতাস উত্তর দিকে প্রবাহিত হইলেও সেই চিতাধূম শ্মশানের উত্তর দিকস্থ গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া গ্রামকে আচ্ছন্ন করিল। তাহার পর হইতে কয়েকমাসের মধ্যে শ্মশানে পরিণত করিল, এই মহামারী যে বৎসর কালীপ্রসন্ন বাবু দেহত্যাগ করেন সেই বৎসর কুশদহতে প্রবেশ করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব "প্রভা" সম্পাদক।

সম্বৰ্দ্ধনা।

(স্থানীয় বিষয়)

বিগত ২৫শে আষাঢ় শনিবার অপরাহ্নে, গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপাল আফিসে গ্রামবাসীগণ এক সভা করিয়া, স্থানীয় জমিদার বাবু গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভে আনন্দ প্রকাশ ও তাঁহাকে সম্বৰ্দ্ধনা করিয়াছিলেন। এই সভা আহ্বানে শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়, বি, এল মহাশয়

প্রধান উদ্‌যোগী হইলেও, দেশের গণ্য মান্য ও মধ্যবিৎ বহুলোক সমাগত হইয়া গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও সদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনিও স্বাভাবিক বিনয় ও প্রীতি প্রকাশ করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

সহসা এ ঘটনা কেন ঘটিল? ইহা কি কেবল মানুষের দ্বারা মান-সম্মান আদান-প্রদানের একটি সাংসারিক খেলামাত্র? ইহার ভিতর কি কিছুই ঐশ্বরীক ক্রিয়া নাই? আমরা এমত কথা কখনই বলিতে পারিব না, আমাদের বিশ্বাস অন্য রকম।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কুশদহবাসীর নিকট গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর যে প্রকার সম্মান আছে, এমন কি তাঁহার উর্দ্ধতম পুরুষ পর্য্যন্ত এদেশের ব্যবসায়ী শ্রেণীর নিকট কত উচ্চ ভক্তি ও সম্মান পাইয়া আসিতেছেন, তাহা একটি বিগত ঘটনার উল্লেখ করিলেই আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার হইবে।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বাবু, সারদাপ্রসন্ন বাবুর অন্নপ্রাশনে গ্রামস্থ তাম্বুলী শ্রেণীকে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহারা সকলেই এই অনুষ্ঠানে যথাযোগ্য কিছু কিছু যৌতুক স্বরূপ, প্রণামী দিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন বাবু নিজে দাঁড়াইয়া সকলকে যত্ন ও সমাদরপূর্ব্বক পান ভোজনে পরিতোষ অন্তে সর্ব্বসমক্ষে বলেন, "তোমরা সকলেই উপস্থিত হইয়াছ, তোমরা আমার 'রাজা' প্রজা। আজ আনন্দের দিনে তোমাদের নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে।" এ কথায় সকলে সত্রস্তে করযোড়ে বলিলেন, আপনি আমাদের ভূস্বামী 'রাজা' বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, আপনি আমাদের দেবতার স্থানীয়। আপনার আশীর্ব্বাদেই আমাদের সকল, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন আমরা তাহাই শিরোধার্য্য করিব।" তখন কালীপ্রসন্ন বাবু বলিলেন "তোমাদের নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, আজ তোমরা যে যাহা 'নবকুমার'কে যৌতুক দিয়াছ তাহা তোমাদের প্রত্যেকের খাজনার সহিত 'বার' হইবে। অর্থাৎ যাহার যত বার্ষিক খাজনা আছে, তাহার সঙ্গে ঐ যৌতুকের সংখ্যা যোগ হইয়া, উহাই তোমাদের বরাবরের খাজনা ধার্য্য হইল।" বর্ত্তমান সময়ের পক্ষে এইরূপ প্রস্তাব কেমন বিসদৃশ তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু তখনকার সময়ে ঐ সকল 'নেহাৎ সরল' লোকের নিকট, প্রস্তাব মাত্রেই শিরোধার্য্য হইয়া গেল। গোবরডাঙ্গার ভিটা জমীর খাজনা যে এত অধিক, তাহার কারণ আমরা এইরূপ শ্রুত আছি। যাহা হউক এক্ষণে বক্তব্য এই

যে, দেশের নিকট যাঁহার সম্মান এইরূপ, যাহারা চলিত কথায় প্রায়ই যাঁহাকে 'রাজা' শব্দে সম্বোধন করে, তাঁহার প্রতি লৌকিক সম্বর্দ্ধনা আর অধিক কি গৌরবের হেতু হইতে পারে? তাই আমাদের বিশ্বাস এটি লৌকিক ব্যাপার নহে। কিন্তু এ বিধাতার ঈঙ্গিত; ভগবান্ এই ঘটনাচ্ছলে গ্রামবাসীর হৃদয় বেদনা আজ গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর নিকট জ্ঞাপন করিতেছেন, তাঁহাকে দায়ীত্ব শৃঙ্খলে বাঁধিতেছেন। তিনি দেশের প্রতি উদাসীন থাকিতে যেন না পারেন। কিসে দেশের দুর্দ্দশা ঘুচিবে, কিসে দেশের মুখে আবার হাসির রেখা দেখা দিবে, কিসে নিরুৎসাহী প্রাণে (দেশের রাজার প্রাণে দেশহিতৈষণা দেখিয়া) উৎসাহ জাগিবে, এই ব্রতে তিনি এখন হইতে আত্ম নিয়োগ করুন, এই আশীষবাণী বলিয়া ভগবান্ তাঁহার মস্তকে সম্মানের মুকুট পরাইয়া দিয়া আরো উন্নত করিয়া ধরিলেন।

এই যে সে দিন গিরিজাপ্রসন্ন বাবু সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের "স্মৃতি রক্ষা" (Memorial) ফণ্ডে ২৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন, ইহাও এখন তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্যের বিষয় হইয়াছে, কেননা, এখন আর তিনি সাধারণ কাজে আত্মগোপন রাখিতে পারিবেন না। কিন্তু এই সঙ্গে দেশের প্রতি তাঁহার যে কর্ত্তব্য ভার বৃদ্ধি হইল, তাহা কি তিনি অনুভব করিতেছেন না?

গিরিজাপ্রসন্ন বাবু মনে না করেন যে, আমরা তাঁহাকে এখন উপদেশ দিতে বসিলাম। কিন্তু আমাদের যাহা বিশ্বাস, আমরা তাঁহার প্রতি দেশের জন্য যে দাবী পোষণ করি, তাহা বেদনার সুরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। পরন্তু শ্রদ্ধেয় কুঞ্জবাবুর আহ্বান-পত্র পাইয়াও শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখিত ছিলাম। সম্ভবতঃ সভায় আমাদের কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে, এই ভাবই প্রকাশ হইত।

স্থানীয় সংবাদ।

বালিকাবিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভে—আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ১১ই আষাঢ় পূর্ব্ব প্রস্তাবিত খাঁটুরা বালিকাবিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ

হইয়াছে। প্রারম্ভে প্রতিষ্ঠাতৃগণের উদ্‌যোগে দত্ত-বাটীতে এক সভা হইয়াছিল। তাহাতে জমীদার গিরিজাপ্রসন্ন বাবু সভাপতি হইয়া এ কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উপস্থিত একজন শিক্ষক, একটি পরিচারিকা দ্বারা কার্য্য চালাইয়াও মাসিক ১০৲ টাকা ব্যয় হইতেছে। স্কুলের সমুদায় ব্যয়ভার বহন করা গ্রামবাসীগণেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু যে গ্রামে একটি বালক-বিদ্যালয়ের অবস্থাই সন্তোষজনক নহে, এবং যাঁহাদের অধিকাংশেই বালিকার লেখাপড়ার আবশ্যকতা বোধ করেন না, সেখানে আর্থিক অবস্থা যাহা দাঁড়াইবে তাহা সহজেই অনুমেয়; তবে কি স্কুল চলিবে না? আমরা তাহা বলি না, কেন না যেখানে প্রারম্ভেই ছাত্রী সংখ্যা ৩০।৩৫টি হইয়াছে, সেখানে সহজেই বোঝা যাইতেছে উহার প্রয়োজন আছে। যাহার প্রয়োজন আছে, তাহার প্রাণ থাকা স্বাভাবিক। প্রতিষ্ঠাতৃগণ ধরিয়া থাকুন, চেষ্টা করুন, ভগবানের আশীর্ব্বাদ তাঁহাদের জন্য বিদ্যমান আছে।

মনোমালিন্য—ইতিপূর্ব্বে গৈপুর নিবাসী বনগ্রাম স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত জমীদার গিরিজাপ্রসন্ন বাবুর বৈষয়িক ঘটনায় মনোমালিন্য ঘটিয়া বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে; এমন কি, তাহা আইন আদালতের মধ্যেও আসিয়া পড়িয়াছে। দেশের যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে উহা দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিজনক। এ ঘটনায় দেশের লোক বিশেষ দুঃখিত। আমাদের বোধ হয় চারুবাবুর মত লোকের এরূপ বিবাদে লিপ্ত থাকা ভাল নয়। কেন না তিনি শিক্ষাবিভাগীয় শিক্ষিত ব্যক্তি।

যমুনার ঘাট—বিগত বর্ষে আমরা যমুনার ঘাটগুলি পরিষ্কার করা সম্বন্ধে গোবরডাঙ্গা-মিউনিসিপালিটীর নিকট অনেক প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া, এক সময় গভর্ণমেণ্ট নমিনেটিকেল্‌ কমিসনার, ডাক্তার বাবু কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট ঘাট পরিষ্কারের আশ্বাসবাণী পাইয়াছিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন কার্য্য হইতে দেখা গেল না।

Printed by J. N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and
Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

সূচী ও নিয়মাবলী ভিতরে দেখুন।

দ্বিতীয় বর্ষ]   শ্রাবণ, ১৩১৭।   [১০ম সংখ্যা।



গাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়

সম্বলিত, ধর্ম্ম, সমাজ ও

বিবিধ বিষয়ক

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

কুশদহ-কার্য্যালয়

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১।০ মাত্র।   এই সংখ্যার নগদ মূল্য /১০ পয়সা

২য় বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩১৭। [১০ম সংখ্যা।

দয়ার বিচার।

(প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩১৭।)

[মিশ্র ইমন্‌কল্যাণ—জলদ একতালা।]

আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে,
গর্ব্ব করিতে চূর ;
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলি করেছে দূর।
ঐগুলো সব মায়াময় রূপে,
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন আতুর ;
আমায়, সকল রকমে কাঙাল করিয়া,
গর্ব্ব করিছে চূর।
যায় নি এখনো দেহাত্মিকামতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,
এই দেহটা যে আমি, সেই ধারণায়
হয়ে আছি ভরপুর,
তাই, সকল রকমে কাঙাল করিয়া,
গর্ব্ব করিছে চূর।

ভাবিতাম, "আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ"
তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা দিল প্রচুর ;
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে,
গর্ব্ব করিতে চূর !

মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতাল,
২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭। } শ্রীরজনীকান্ত সেন।

শাস্ত্র সঙ্কলন।

৫৯। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥

গীতা ২।৪৭

তোমার কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবার অধিকার আছে, কিন্তু ফল প্রত্যাশা করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। কর্ম্মের ফল-কামনায় যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়, এবং কর্ম্ম না করিতেও যেন তোমার আসক্তি না হয়।

৬০। যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥

গীতা ২।৪৮

হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হইয়া আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম কর। ফলাফলে সমান হইয়া যে মনের সাম্যাবস্থা হয় তাহাকে যোগ বলা যায়।

৬১। প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ! মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

গীতা ২।৫৫

হে পার্থ, যখন মনুষ্য মনের সমুদায় কামনা পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে স্বয়ং পরিতুষ্ট হয়েন, তখন তাঁহাকে সমাহিত বলা যায়।

৬২। নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥

গীতা ৪।৩৮

ব্রহ্মজ্ঞানের সদৃশ পবিত্র পদার্থ আর কিছুই নাই। যোগসংসিদ্ধ ব্যক্তি স্বয়ং কালসহকারে উহা আত্মাতে লাভ করেন।

৬৩। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥

গীতা ৪।৩৯

শ্রদ্ধাবান্ ও সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিয়া শীঘ্র পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।

৬৪। যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥

গীতা ৫।৭

যোগী শুদ্ধচিত্ত বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সর্ব্বভূত সহ একাত্মা হইয়া কার্য্য করিয়াও তাহাতে আসক্ত হয়েন না।

৬৫। ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

গীতা ৫।১০

যে ব্যক্তি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মেতে আত্মসমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করে, পদ্মপত্র যেমন জল দ্বারা লিপ্ত হয় না, সে তদ্রূপ পাপে লিপ্ত হয় না।

(ক্রমশঃ)

কর্ম্মফল।

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়ের "কুশদহ"তে পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া "কর্ম্মফল" প্রবন্ধের প্রারম্ভেই অনেকের মনে এই প্রশ্ন হইতে পারে, যাহার পূর্ব্বজন্ম নাই পরজন্ম নাই, স্বভাবে জন্মে স্বভাবে মরে, স্বভাবতঃ কেহ সুখী কেহ দুঃখী, কেহ পাপী কেহ পুণ্যবান, তবে তাহার কর্ম্মফল আলোচনার প্রয়োজন কি ?

আমরা জানি জন্মান্তর-বাদীর মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রথমেই বলিয়াছি জন্মান্তর-বাদ খণ্ডন করিয়া এই স্বভাবিক 'মত' সাধারণে প্রতিষ্ঠা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং সে জন্য আমাদের কোন দুঃখ বা অকৃতকার্য্যতার বিষয় নাই। সত্য মাত্র প্রকাশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য, এ আলোচনায় যদি কোন সত্য থাকে, যদি তাহা একজনের মনেও সায় দিয়া থাকে, তবে ঐ প্রবন্ধের অবশিষ্ট উত্তর এই 'কর্ম্মফল' আলোচনারও প্রয়োজন আছে।

পূর্ব্ব দুই প্রবন্ধে বোধ হয় একথা একপ্রকার স্থির হইয়াগিয়াছে যে, বর্ত্তমান জন্মের অবসানে অর্থাৎ মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম দেহে আত্মার উন্নতি অসম্ভব নয়, তজ্জন্য জন্ম মৃত্যু চক্রে এই জগতেই বারম্বার ঘুরিতে হয় না। এখানে জন্মান্তর-বাদীর সহিত এইটুকু পার্থক্য হইল যে, এজগতে এরূপ স্থূল দেহে জন্ম হয় না; কিন্তু পরলোক অস্বীকৃত হইল না। দ্বিতীয় কথা—পূর্ব্বজন্ম না থাকিলেও মানব জীবনের বৈচিত্রতা দেখিয়া পূর্ব্বে যে কিছু ছিল না তাহা মনে হইতে পারে না। আমাদের মতেও বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে দেহ এবং আত্মা ছিল না তাহা বলি নাই; এখানেও কেবল এইটুকু পার্থক্য যে, মানবদেহের উপাদান আগে পশু পক্ষীর দেহে ছিল আর আত্মা পরমাত্মায় ছিল।

এইখানে আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধের স্বীকৃত আর একটী কথার উত্তর দিয়া রাখিতে চাই, তাহা এই যে, প্রত্যেক মানবে যে ভিন্নতা দেখা যায় তাহা দেহ মন বা দেহ মনের সমষ্টি যাহাকে প্রকৃতি বলা যায়, সেই প্রকৃতি সম্বন্ধে, কিন্তু আত্মায় আত্মায় কোন ভেদ নাই, সকল আত্মাই অভেদ ভাবে উৎপন্ন। পক্ষান্তরে সকল আত্মাই প্রকৃতি জড়িত, সুতরাং অজ্ঞান দৃষ্টিতে ভেদযুক্ত বোধ হয় মাত্র। প্রকৃতি-মুক্ত উচ্চ জ্ঞানীতে জ্ঞানীতে মূলে কোন পার্থক্য

দেখা যায় না। এমন কি দেশ ভেদে, কালভেদেও জ্ঞানীগণের সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের ঐক্য দৃষ্ট হয়। ফলতঃ সকল আত্মাই যে অভেদ তাহা দিব্য-জ্ঞান সম্মত-সত্য। তৎপরে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে-কথা, এইখানে আরও একটু পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক।

মানবদেহ, ইতর প্রাণীর উন্নত অবস্থার পরিণতি হইলেও মানবদেহ উৎপত্তির সঙ্গে তাহাতে পরমাত্মা জাত আত্মার সন্নিবেশ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কেননা অপর প্রাণীর সহিত মানবাত্মার যে পার্থক্য তাহাও পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। আদিম অবস্থার মানুষ বন-মানুষ বা তাহা হইতে কিছু উন্নত, যাহা অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে দেখা যায়। তৎপরে মানব সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু যুগ যুগান্তর হইতে মানুষ মানুষেরই সন্তান, অথচ এখনও পশুপক্ষী দেহের পরিণতি আদিম মানুষ জন্মাইতেছে না তাহা বলা চলে না। পরন্তু যে লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে পূর্ব্বেও মানবের জন্ম ছিল এখানে সে লক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকিতেছে। পার্থক্য এইটুকু যে ব্যক্তিগত ভাবে ছিল না কিন্তু ব্যক্তিত্বের মধ্যেই ছিল। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে কি মানুষ বংশ পরম্পরা-গত একের পাপ-পুণ্য কর্ম্মফল অন্যেও ভোগী হয়? নিশ্চয়ই হয়। আর ইহাতে ভগবানের কোন পক্ষপাত নাই, কেন না মানুষ যেমন পুরুষানুক্রমের পাপ, ক্রটী-দুর্ব্বলতার ভাগী হয়, তেমন জ্ঞান, ধর্ম্ম, সদ্গুণেরও উত্তরাধিকারী হয়। এমন কি শারীরিক রূপ, গুণ, এবং ব্যাধিও সংক্রমিত হয়। ইহা সত্য বলিয়া ধারণা হইলে, মানব জীবনের দায়ীত্ব কত গুরুতর বলিয়া বোধ হয়। তখন বুঝিতে পারা যায়, আমার পাপ কেবল আমার ভোগের বিষয় নহে, কিন্তু সমস্ত বংশের জন্য। পক্ষান্তরে পুণ্য পবিত্রতা, জ্ঞান, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও বংশানুক্রমে চরিত্রের আদর্শ যদি রাখিয়া যাইতে পারা যায়, তাহা কত আনন্দদায়ক। সুতরাং পূর্ব্বজন্ম না হইলেও বংশগত পাপ পুণ্যের সূত্র প্রকৃতিরূপে আমাদের বর্ত্তমান জন্মের সঙ্গেও অলক্ষিতে আসিয়া থাকে।

এখন আর একটি কথার আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাঁহারা এজগতে আত্মিক জীবন লাভ করিয়া—ভগবানের কৃপায় আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহারা সূক্ষ্ম দেহে আত্মার উন্নতি লাভ করেন। পাপাসক্ত ব্যক্তিও মৃত্যুর পর অনুতপ্ত হইয়া ক্রমে উন্নত

সোপানে আরোহণ করিবে। সুতরাং উভয় শ্রেণীর পরিণাম উত্তমগতি হইলেও মৃত্যুর পর যে একই অবস্থা হয় না, তাহার আভাস পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু প্রস্তাব ততোধিক পরিষ্কার হয় নাই, এজন্য তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন আছে।

একথা বলা বাহুল্য মাত্র যে জ্ঞানবস্তুকে বর্ণনার সময় "জ্যোতিঃ" "আলোক" বলা হয় বটে, কিন্তু তাহা চন্দ্র সূর্য্যের আলোক বা জ্যোতিঃ নহে। জ্ঞানের স্বরূপ, জ্ঞানীগণই বুঝিতে পারেন। জ্ঞানীর মৃত্যুতে যখন তাঁহার নিকট চন্দ্র সূর্য্যের আলোক অপসারিত হয়, তৎপূর্ব্ব হইতে তাঁহার অন্তর-চক্ষুর সম্মুখে জ্ঞানের আলোক আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সুতরাং মৃত্যুতে তাঁহাকে অন্ধকার দেখিতে হয় না। কিন্তু অজ্ঞানী যখন এই চন্দ্র সূর্য্যের আলোক ব্যতীত আর কোন আলোক দেখে নাই, তখন তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার তো দেখিতে হইবেই। আত্মা, ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া ক্রমাগত অস্থির হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত অশান্তি অনুভব করিতে থাকে, কেন না আত্মা অন্ধকার চায় না আলোকই তাহার স্বভাব। যে মানব এ জগতে স্বভাবের পথে না চলিয়া ক্রমাগত অস্বভাবের পথে—পাপ-পথে চলিয়াছে, তাহার পর তাহার কত কষ্ট, তাহা সহজেই অনুমেয়। অসহায় অবস্থায় পাপের স্মৃতি মাত্র অবলম্বন লইয়া অবস্থান করা, ইহাই তো কারাগার যন্ত্রনা। কিন্তু এই অন্ধকারে পড়িয়া আত্মা যখন ক্লেশে কাতর হইয়া, অজ্ঞানতার মূল—"আমি আমার" জ্ঞানের পরিণাম বুঝিতে পারিয়া, অনুতপ্ত হৃদয়ে সেই অন্ধকার হইতেই প্রকৃত আমার 'আমিকে' ডাকিতে থাকে—কোথায় দয়াল! তুমি কোথায়! তখন তাহার কাতর-প্রার্থনায় ভগবান্ অল্পে অল্পে তাহার নিকট প্রকাশ হন, একটু একটু করিয়া জ্ঞানের আলোক দান করেন। সেই জ্ঞানালোকে সূক্ষ্ম দেহস্থ আত্মা, সূক্ষ্ম-আত্মিক জগত দেখিতে পায় এবং অন্যান্য আত্মার সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ক্রমে তাহার সদ্গতি হয়।

পাপের পরিণাম যে ভীষণ, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। পরন্তু পাপ যে কেবল পরিণামের দণ্ডদায়ক তাহা নহে। যাঁহারা বর্ত্তমান পাপ পুণ্যের ভেদ বুঝিয়াছেন ;—ধর্ম্ম কত উপাদেয়, ধার্ম্মিক ব্যক্তি কত সৌভাগ্যবান, পক্ষান্তরে পাপ কত তীব্র, পাপী কেমন কৃপা পাত্র, তাহা তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারেন।

অন্যথা অজ্ঞানীর নিকট সহস্র "কুম্ভীপাক নরক" বা "সপ্তম সর্গের" ভয়,প্রলোভনের বিষয় বর্ণিত হইলেও বিশেষ কোন ফল ফলে না। ভয়ে বা প্রলোভনে ধর্ম্ম করা, আর প্রেমে প্রেমাস্পদকে চাওয়া সামান্য প্রভেদ নহে। যাহা হউক এখন শেষ সার কথা এই যে, বিশ্বাসের মধ্যে "ঈশ্বর-বিশ্বাস" একমাত্র সার বস্তু। আর আর সকল বিশ্বাসই আনুসঙ্গিক বিশ্বাস। মঙ্গলময় ঈশ্বরে যাঁহার খাটী বিশ্বাস আছে, তিনি জানেন যে পূর্ব্বাপর জন্মের গতি যাহাই হউক তাহা মঙ্গলজনক হইবেই। এই বিশ্বাসে সাধক নিশ্চিন্ত। দাস-লেখক এইখানে পাঠকপাঠিকার চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছে।

আহ্বান।

ওরে, মান কুড়াইয়ে কি হবে?
যা আছে রে তোর পথে-প্রান্তরে
দান কর্ তুই নীরবে;
আর, মান কুড়াইয়ে কি হবে?
দেরে দেরে লাজ ভাসা'য়ে,
আজ সাজ তুই পথের পাগল
ঘৃণায় প্রণয় মিশায়ে।
খুলে ফেল ফুল-আঙিয়া—
বালুকার ঘরে লুকোচুরি খেলা
সন্ধ্যায় যায় ভাঙিয়া।
আয় বুকে বল বাঁধিয়া,
আজ ডাকে তোরে চিরসাথী তোর
বুকফাটা দুঃখে কাঁদিয়া।
কে ওই করুণা যাচে রে!
প্রাণের ভিতরে পুড়িয়া গিয়াছে,
চল্ চল্ ওর কাছে রে!

জীবনে বরিষ অমিয়া—
সকলের কাছে মহিমার মাঝে
ফলভরে থাক' নমিয়া।
সমস্ত যাও সহিয়া,
শত অবজ্ঞা শত বিদ্রূপ
যাও নতশিরে বহিয়া।
মিছে, মান কুড়াইয়ে কি হবে ?
যা আছে রে তোর পথে-প্রান্তরে
দান কর্ তাই নীরবে ;
আর, মান কুড়াইয়ে কি হবে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাজারিবাগের পথে।

কোনরকমে আহার করিয়া তিন জনে হাওড়া ষ্টেসনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদিগকে হাজারিবাগ রোড্ ষ্টেসনের টিকিট কিনিতে হইল। দশ ঘণ্টাকাল বৈচিত্রহীন বাষ্পীয়যানে বাস করিয়া প্রায় রাত্রি সাড়ে দশটার সময় হাজারিবাগ রোড্ ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। তখনও সে রাস্তায় মোটরগাড়ী (motor car) চলিত না। ষ্টেশন হইতে হাজারিবাগ ৪১ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা তখনই দুই খানি পুস্‌পুস্ ভাড়া করিয়া চলিতে লাগিলাম। পথে কেবল আঁকা বাঁকা পাথুরে রাস্তা, কেবল চড়াই ও উৎরাই, তাহাতে আবার "পুস্‌পুস্" নামক ঠেলাগাড়ীতে যাওয়া, তাহাতে নিদ্রা হইবার কোন রকম উপায়ই ছিল না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কি করি চলিতে চলিতে কবির "বিঘোরে বিহারে চড়নু এক্কা"র সহিত পুস্‌পুসের সাদৃশ্য কল্পনা করিতে লাগিলাম। শেষ রাত্রে অল্প নিদ্রা আসিল। কিন্তু হঠাৎ অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রুতিকটু উৎসাহ সূচক কুলিদের হুঙ্কারে জাগিয়া উঠিলাম। এখনও এ প্রদেশে ব্যাঘ্রের উৎপাত মধ্যে মধ্যে হয়। রাত্রে কুলিরা এইরূপ শব্দ করিয়া ব্যাঘ্রকে দূরে রাখে। ক্রমে পাখীদের জাগরণকাল নিকটবর্ত্তী হইল। পর্ব্বত সন্নিকটস্থ জঙ্গলে পাখীদের

গৌরব চিরকালই অধিক। শকুনি সকল যেন একটা দীর্ঘকাল রজ্জুর আকারে পাণ্ডুবর্ণ আকাশে উড়িয়া যাইতে লাগিল। তখনও নভপটে সূর্য্য উঠে নাই। ক্রমে আকাশের সীমাপ্রান্ত হইতে জলভরা ক্ষেত্রের উপর দিয়া ধীরে ধীরে উঠিল। শিশির স্নাত বৃক্ষগুলি সূর্য্যকিরণ পতনে সমুজ্জ্বল হইল। কিছুক্ষণ পরে আমরা 'বগোদরা' পৌঁছিলাম। সেখানে একটি ডাক-বাংলা আছে। বাজারের ভিতর দিয়া আমাদের দ্বিচক্রযান প্স্পুস্ চলিতে লাগিল। এই দূর দেশেও মাড়োয়ারীদিগের দোকান দৃষ্ট হইল। আমরা সেখানে আর না নামিয়া চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে এতদ্দেশীয় অনেক লোককে চক্ষুরোগ-গ্রস্ত দেখিলাম। এতদ্দেশের ধূলায় প্রস্তর বাহুল্য থাকায় গ্রীষ্মকালে চোখ উঠা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হয়।

যখন বেলা সাড়ে নয়টা তখন কতিপয় কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন অভিলাষী বাঙালী বাবুদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাস্তাঘাটের অজ্ঞতাহেতু আমরা বিশেষ কিছু বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই; অপরিচিত হইলেও তাহাদের নিকট পানীয় জল প্রার্থনা করিয়া পান করিলাম। জলযোগের পর, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম। এই বিজন পথে চলিতে চলিতে একটি শিলারাশির পাদদেশে এক বৃহৎ উচ্চমুখী দেবালয় দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। দেবালয়ের বৃহৎ চত্বর প্রাচীর বেষ্টিত ছিল; কিন্তু তখন বেলা এগারটা, সুতরাং জঠরানলের প্রকোপ, সেই দেবালয় দর্শন লালসা অপেক্ষা অধিক হইল। কাজেই আমরা আর অপেক্ষা করিলাম না। ইহার পর 'ভেস্সোরা' নামক গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। দ্বিপ্রহরেই এই জঙ্গল দেখিয়া আতঙ্ক হয়, রাত্রের বিভীষিকা সহজেই অনুমেয়। পথে মধ্যে মধ্যে বাঘ মারিবার মাচান্ দৃষ্ট হয়। এই জঙ্গলের পরেই টাটিঝরিয়ার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। দূরে বড় বড় শালবৃক্ষ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে—পরে বৃক্ষ সমুদ্র তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়াছে।

বারটার সময় 'টাটিঝরিয়া' নামক স্থানে পৌঁছিলাম। সেখানকার ডাক-বাংলায় স্নান ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পুনরায় যাত্রা করা গেল। তখন বেলা প্রায় দেড়টা। সন্নিকটবর্ত্তী 'কোদারমা' নামক স্থানে বৃহৎ অভ্রখনি থাকায় রাস্তাগুলিতে অভ্রকণা সকল রজত খণ্ডের ন্যায় সূর্য্যকিরণে চিক্‌মিক্ করিতেছিল।

টাটিঝরিয়ার পর হইতে নৈসর্গিক দৃশ্য অতি সুন্দর। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের ধারে অল্প জল বিশিষ্ট ছোট ছোট ঝরণা দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার ফেণিল তরঙ্গ-তাড়নে প্রস্তরখণ্ড সমূহ বিক্ষোভিত হইতেছিল। দূরে ক্ষেত্রের ধারে ছোট ছোট মেঘে ঢাকা গ্রামগুলি ছবির মত দেখাইতেছিল; এবং ক্ষেত্রের ক্রমোচ্চ আলগুলি ঠিক সিঁড়ির মত বোধ হইতেছিল। তখন বর্ষাকাল। সমুদয় মকাই ক্ষেত্রগুলি জলে ভাসিতেছিল। আমরা একটি ঝরণার স্নিগ্ধ বারি পান করিলাম। সেই জলের স্নিগ্ধতা বর্ণনা করা যায় না, কেবল সম্ভোগ করা যায়।

অভাবই মনুষ্যকে অসুখী করে। পুস্‌পুসের কুলিদিগের অর্দ্ধনগ্ন সরলতা শ্রীযুক্ত বপু দেখিয়া আমাদের পাশ্চাত্যাভিমানী সভ্য লোক অপেক্ষা অধিক সুখী মনে করিলাম। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম ও বিলাসিতার ছায়ায় তাহারা আশ্রয় লইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ কি হিন্দুসমাজের ইহাদের জন্য করিবার কি কিছুই নাই? ইহাদের মধ্যে এখনও পার্ব্বতীয় আদিম জাতিদিগের ন্যায় কাউয়া, চন্দনা প্রভৃতি পক্ষী ও পশুবাচক নাম প্রচলিত আছে।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তমোময় পাষাণপিণ্ডের পাদদেশ দিয়া আমাদের গাড়ী সশব্দে চলিতে লাগিল। ধরণীর উষ্ণশ্বাসে কুলিদের স্বেদধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সূর্য্য-দগ্ধ বৃক্ষান্তরাল হইতে ঘুঘুর দূরাগত শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। ৪টার সময় 'মেরু' নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এখন হইতে রাস্তায় ক্রমে অপেক্ষাকৃত অধিক লোকের সমাগম দেখিতে পাইলাম। চলিতে চলিতে কিছুক্ষণ পরে মৃদুগুঞ্জন সদৃশ শব্দ শুনিতে পাইলাম। কিন্তু শব্দের কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া দেখিতে পাইলাম, অদূরে গোচারণ ক্ষেত্রে অনেক গরু চরিতেছে। তাহাদের প্রত্যেকের গলায় নানাবিধ লৌহপিত্তলের ঘণ্টা বাঁধা রহিয়াছে। কাহারও কাহারও বা গলায় কাঠের একপ্রকার কচ্ছপের মুখের ন্যায় যন্ত্র বাঁধা আছে। রাখালেরা ইহা দ্বারা বিপথগামী পশুগণকে শব্দ দ্বারা অনুসরণ করিতে পারে। দূর হইতে ইহাই আমাদের অভিনব গুঞ্জনবৎ শব্দ প্রতীয়মান হইয়াছিল।

বেলা পড়িতে লাগিল। দীপ্ত সূর্য্য মধ্য গগন হইতে সীমাপ্রান্তে উপনীত হইল—সিন্দুর রাগরঞ্জিত গগনে পক্ষিগণ তাহাদের দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া

নিজ নিজ আবাসাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল— ক্রমে ম্লানপ্রভ আলোক-চ্ছায়া সন্ধ্যার আগমনবার্ত্তা জানাইয়া দিল এবং হঠাৎ শৈত্যের আবির্ভাব হইল। হাজারিবাগে যাইয়া ধূসর আকাশ ও শীতের লক্ষণ দেখিব প্রত্যাশা করি নাই। রজনীর অন্ধকারের সহিত আমরা হাজারিবাগে পৌঁছিলাম। আমাদের গন্তব্য স্থান সহরের বাহিরে থাকায় বাড়িতে পৌঁছিতে কিছু দেরি হইল। নিদ্রান্তে পর দিন প্রাতে সমস্ত শরীরে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিলাম। হাজারিবাগের পথের কথা অন্তত বেদনার দরুণ কখনও ভুলিতে পারিব না।

শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত।

ভেজাল খাদ্য।

বর্ত্তমান সময়ে দেশের লোকের ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবে সকল বিষয়েই ভেজাল চলিতেছে। ধর্ম্মে ভেজাল, সমাজে ভেজাল, আচারে ভেজাল, ব্যবসায়ে ভেজাল —এইরূপ ভেজালে ভেজালে দেশটা তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে। আজকাল যে,কোন কোন ব্যবসায়ী খাদ্য দ্রব্যে বিষম অনিষ্টকর ভেজাল দিয়া দেশের মহানিষ্ট সাধন করিতেছে, ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবই কি ইহার কারণ নহে? পূর্ব্বে লোকের ধর্ম্মভয় ছিল সুতরাং খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল মিশাইতে তাহারা ভীত হইত। যাহা দেবতাকে দিতে হইবে, যাহা ব্রাহ্মণে খাইবে, তাহাতে কোন অখাদ্য দ্রব্য ভেজাল দিলে নিজের অমঙ্গল ঘটিবে, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস ছিল। কেহ কেহ এই বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলিতে পারেন, কিন্তু এই বিশ্বাসের ফলে তখন লোকে এই পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকিত। আজকাল জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের এই কুসংস্কার দূর হইয়াছে এবং তাহার ফলে আমরা অশেষ দুঃখ ও কষ্টভোগ করিতে বসিয়াছি। বাজারে খাঁটি দ্রব্য প্রায় মিলে না, যাহা পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। কৃত্রিম জিনিষই সুলভ দেখা যায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র এবং স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানহীন। অজ্ঞানতা বশতই হউক অথবা অর্থাভাবেই হউক তাহারা ঐ সকল বিষ খাইয়া বহুবিধ পীড়া ভোগ করিতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের কোন পল্লীতে অম্লরোগ ছিল না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। আজ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন

১০০ জনের মধ্যে ৭৫ জন অল্পাধিক অম্ল রোগাক্রান্ত। চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখুন ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বা পরিপাক-বিকার নাই এমন একটি লোক খুঁজিয়া মিলিবে না। বাজারের ভেজাল খাদ্য খাওয়াই এই সকল রোগের একটি প্রধান কারণ তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। আমরা নির্ব্বুদ্ধিতা বশত একান্ত অসার বিলাসিতায় অযথা ব্যয় করিয়া শরীর রক্ষাকল্পে কার্পণ্য করিয়া থাকি। সামান্য দুই চারি পয়সা সস্তার জন্য বাজারের জঘন্য ভেজাল খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করি; কিন্তু ইহা দ্বারা যে আমাদের লাভের গুড় পিপীলিকায় খাইতেছে, তাহা এক বারও চিন্তা করি না। মহাত্মা সুশ্রুত বলিয়াছেন "তথাহারবৈষম্যাদস্বাস্থ্যম্।" আহার হইতেই বল, আরোগ্য বর্ণ ও ইন্দ্রিয়প্রসন্নতা জন্মে। আহারের বৈষম্যেই অস্বাস্থ্য হইয়া থাকে।

সম্প্রতি 'বেরী বেরী' নামে এক নূতন রোগ আমাদের দেশে দেখা দিয়াছে। এই রোগে জ্বর, পদস্ফীতি ও অত্যধিক স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। রোগীর হৃদ্‌পিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া হঠাৎ রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদিও এই অভিনব রোগের নিদান সম্বন্ধে চিকিৎসক-মণ্ডলীর মধ্যে মতের বিলক্ষণ অনৈক্য দেখা যায়, কিন্তু অনেক প্রবীন ডাক্তার বলেন যে, ভেজাল তৈল খাইয়া লোকে এই রোগে আক্রান্ত হইতেছে। শুনিতে পাই, আজকাল অনেক ব্যবসায়ী সর্ষপের সহিত শোরগোঁজা, পচা বাদাম প্রভৃতি ভাঙিয়া খাঁটি সর্ষপ তৈল বলিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। এই ভেজাল তৈলের সহিত 'বেরী বেরী' রোগের কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানি না, কিন্তু ইহা যে স্বাস্থ্যের ঘোর অনিষ্টকর তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে ঘৃত আমাদের পরম হিতকর ও পুষ্টিকর খাদ্য, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র যে ঘৃতকে স্মৃতি, মেধা, কান্তি, লাবণ্য, সৌকুমার্য্য, ওজঃ, তেজঃ ও বলবর্দ্ধক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, পণ্ডিতগণ ঋণ করিয়াও যে ঘৃত খাইতে উপদেশ দিয়াছেন, আজ সেই পরম কল্যাণকর রসায়ন চর্ব্বি প্রভৃতি দ্বারা দূষিত। বাজারের এই দূষিত ঘৃতে ভাজা লুচি কচুরি প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। অজ্ঞ বালকেরা এবং অপরিণামদর্শী যুবকগণ প্রত্যহ এই অস্বাস্থ্যকর খাদ্য খাইয়া থাকেন। অগ্নিবলের আধিক্য হেতু সঙ্গে সঙ্গে ইহার অপকারিতা বুঝা যায় না বটে, কিন্তু সময়ে ইহার কুফল নিশ্চয় প্রকাশ পাইয়া থাকে।

দুগ্ধ আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধ সকলেরই নিত্য পানীয়। ইহার ন্যায় জীবনী-শক্তি-বর্দ্ধক খাদ্য অল্পই দৃষ্ট হয়। দেহের পুষ্টির জন্য যে সকল পদার্থের প্রয়োজন, দুগ্ধে সে সমুদয় বর্ত্তমান আছে। কলিকাতায় বা অপরাপর সহরে যে দুগ্ধ সরবরাহ হইয়া থাকে তাহার দোষ বহুলতা দৃষ্ট হয়। খাঁটি দুগ্ধ মিলান বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ব্যবসায়ীগণ দুগ্ধের সর বা মাখন তুলিয়া লইয়া অথবা দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে। দুগ্ধে জল মিশাইলে তাহার পুষ্টিকরী শক্তি নষ্ট হয় এবং নানা স্থানের দূষিত জল মিশ্রিত করায় দুগ্ধ দূষিত হয়। দূষিত দুগ্ধ হইতে অনেক সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হইয়া থাকে। দুগ্ধই শিশুর প্রধান খাদ্য। দূষিত দুগ্ধ পানে শিশুর যকৃৎ-পীড়া জন্মিয়া থাকে। আজ প্রতি সহরে শিশুর মৃত্যু হার এত বাড়িতেছে, দূষিত দুগ্ধ পানই তাহার প্রধান কারণ। আশা করি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া দেশবাসিগণ সতর্ক হইবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (ডাক্তার) গোবরডাঙ্গা।

কুশদহ। (৮)

সারদাপ্রসন্ন বাবু—১৮৩৪ সালে সারদাপ্রসন্ন বাবু জন্মগ্রহণ করেন। সারদা-প্রসন্ন বাবুর বিবরণ আমরা "কুশদ্বীপ কাহিনী" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কালীপ্রসন্ন বাবুর দুই পুত্র—সারদাপ্রসন্ন ও তারাপ্রসন্ন। এই পুত্রদ্বয় নাবালক থাকায় মৃত্যু কালে কালীপ্রসন্ন বাবু এক উইল করিয়া যান, তাহাতে সারদাপ্রসন্নের মাতা বিমলা দেবীকে ও তারাপ্রসন্নের মাতা শ্যামাসুন্দরীকে আপনার বিষয় সম্পত্তির একজিকিউট্রিক্স এবং কলিকাতার খ্যাতনামা আশুতোষ দে ও প্রমথনাথ দে (যাঁহাদিগকে লোকে ছাতুবাবু ও লাটুবাবু বলিত) ইঁহাদিগকে একজিকিউটার নিযুক্ত করিয়া যান। কালীপ্রসন্ন বাবুর মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৪৯ সালে তারাপ্রসন্ন বাবুর মৃত্যু হয়। তারাপ্রসন্ন বাবুর সন্তান সন্ততি না থাকায় সারদাপ্রসন্ন বাবুই বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু তারাপ্রসন্নের মাতা সারদাবাবুকে নিষ্কণ্টকে বিষয় ভোগ করিতে দেন নাই। অবশেষে তারাপ্রসন্নের মাতা বার্ষিক চৌদ্দ হাজার টাকা মুনফা লইয়া কাশীতে বাস

করেন। তাঁহার সৎকার্য্যের জন্য কাশীর লোকে তাঁহাকে "গোবরডাঙ্গার রাণী" বলিত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সারদাপ্রসন্ন বাবুর বাল্যকালে শীলসাহেব নামক এক জন ইংরেজ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ইনি বরাবর সারদা বাবুকে পড়াইতেন। যখন তারাপ্রসন্ন বাবুর মাতার সঙ্গে সারদাপ্রসন্ন বাবুর দাঙ্গা হয়, তখন ঐ সাহেব চাকরি ছাড়িয়া দেন। সাহেব কর্ম্ম ছাড়িলে পর বরাহনগরের মুরারিমোহন শীল ইঁহার গৃহ-শিক্ষক হন। সারদাপ্রসন্ন বাবু ইংরাজীতে বিলক্ষণ শিক্ষিত হইলেও তিনি নিজ জাতীয় ধর্ম্মত্যাগ করেন নাই। প্রতিদিন সন্ধ্যা আহ্নিক ও শ্রাদ্ধ শান্তি এবং নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেন। জমিদারী কার্য্যে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, এজন্য তিনি নিজ চেষ্টায় জমীদারীর আয় ২০।২৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি করেন।

সারদাপ্রসন্ন বাবুর দ্বারা দেশের সমূহ উপকার হয়। গোবরডাঙ্গায় যে সকল বড় বড় রাস্তা ঘাট দেখা যায়, তাহা তাঁহার চেষ্টায় ও অর্থানুকুল্যে নির্ম্মিত হয়। দুর্ভিক্ষের সময় ইনি প্রতিদিন ৫।৭ হাজার লোককে অন্নদান করিতেন। এবং এইরূপ অন্নদান ৮।১০ মাস পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার আতিথেয়তা এত দূর ছিল যে, তাঁহার সময়ে গোবরডাঙ্গার বাজারে কাহাকেও রাঁধিবার জন্য হাঁড়ি কাঠ কিনিতে হইত না। গ্রামে বা বাজারে আগুন লাগিলে তিনি তাহাদিগের বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেন। যে যে সদ্‌গুণ থাকিলে লোকরঞ্জক হওয়া যায়, তাঁহার সে সমুদয় সদ্‌গুণই ছিল। তিনি একজন আদর্শ জমীদার ছিলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে গোবরডাঙ্গার বর্ত্তমান ইংরাজী বিদ্যালয়টী স্থাপন করেন, একটী চতুষ্পাঠীতে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তিনি যমুনা নদীর উপর একটী সেতু প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১২৭৫ সালে বঙ্গদেশে যে ভীষণ বাত্যা হয় তাহাতে অনেকেই গৃহহীন ও নিঃস্ব হইয়া যায়, কিন্তু সারদাপ্রসন্ন বাবুর অনুগ্রহে সে সময়ে গোবরডাঙ্গা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের লোকে কোন কষ্ট অনুভব করিতে পারে নাই। তাঁহার এই দানশীলতা ও পরোপকারিতা গুণ দেখিয়া তদানীন্তন স্কুল ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেব তাঁহার এডুকেশন রিপোর্টে লেখেন যে, সারদা বাবু বিগত ভীষণ বাত্যায় যেরূপ অর্থ

ব্যয় ও কায়িক শ্রম করিয়া প্রজাপুঞ্জের উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যদি তাঁহার গবর্ণমেণ্টের নিকট উপাধি লাভ করিবার মানস থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে অনেক উপাধিতে ভূষিত করিতে হইত। (কিন্তু তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় নূতন সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। এই উপাধি গভর্ণমেণ্ট স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে দিয়াছেন)। সারদাপ্রসন্ন বাবুর বদান্যতা সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ আছে। বাহুল্য ভয়ে দু'একটী উল্লেখ করিতেছি।

"একজন ব্রাহ্মণ সারদাপ্রসন্ন বাবুর পিতার নিকট ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। অনেকদিন যাবৎ কিছুতেই ঐ টাকা আদায় না হওয়ায় দ্বারবানেরা ব্রাহ্মণকে একদিন দুপুর বেলায় জমিদারী কাছারীতে ধরিয়া লইয়া আইসে। সারদাবাবু তখন বৈঠকখানায় ছিলেন। মুন্সী ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের পোষাক পরিচ্ছদ ও মুখশ্রী দেখিয়া, বিশেষতঃ অনাহারী অবস্থায় দুপুর বেলা তাঁহাকে আনা হইয়াছে বলিয়া সারদাবাবু আমলাদিগকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণকে অগ্রে ভোজন করাইতে বলিলেন। আহারের পর ব্রাহ্মণ যখন সারদাবাবুর নিকট আনীত হইল, তখন তিনি ব্রাহ্মণের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন। এবং সমুদায় আমলাদিগের সম্মুখে ঐ ব্রাহ্মণের পাঁচহাজার টাকার খৎ ছিঁড়িয়া দিলেন এবং ব্রাহ্মণকে আর দেনা দিতে হইবে না বলিলেন। অধিকন্তু উঁহাকে পাঁচ টাকা পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন।"

পল্লীস্থ কোন নিঃস্ব ব্যক্তির পীড়ার সংবাদ পাইলে সারদাপ্রসন্ন বাবু তৎক্ষণাৎ ঔষধ, ডাক্তার ও পথ্যাদি পাঠাইয়া দিতেন। কোন কোন সময়ে নিজেও রাত্রি দু'প্রহর পর্য্যন্ত পীড়িতের বাটীতে উপস্থিত থাকিতেন। "একবার গৈপুরের মাধব বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের উকস্তম্ভ পীড়া হয়। পীড়া অত্যন্ত সাংঘাতিক ছিল। ডাক্তারেরা তাঁহাকে বরফ ও মাংস ব্যবহার করিতে বলে। কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা বড় মন্দ ছিল, বরফ ও মাংস যোগাইবার ক্ষমতা ছিল না। বাড়ুয্যে মহাশয়ের পুত্র ১০।১২ বৎসরের বালক, পিতার এরূপ সাংঘাতিক পীড়া ও চিকিৎসার অক্ষমতার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে বাজারে যাইতেছিল। সারদাপ্রসন্ন বাবু উপর হইতে দৈব ঘটনায় তাহা দেখিতে পান। এবং বালকটীর নিকট তাহাদের

অবস্থা ও তাহার পিতার পীড়ার বিবরণ শুনিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন। তাহার পিতার জন্য কলিকাতা হইতে বরফ ও মাংস আনিবার ডাক বসাইয়া দিলেন (তখন রেল হয় নাই)। যতদিন মাধব বাড়ুযো জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি তাঁহাকে বরফ ও মাংস যোগাইয়াছিলেন। কিন্তু অধিকদিন তাঁহাকে বাঁচিতে হয় নাই। ঐ উরুস্তম্ভ পীড়াতেই সত্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।"

দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ সারদাপ্রসন্ন বাবু অপরিণত বয়সে ১৮৬৯ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

রায় দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার "সুরধুনী" কাব্যে এক স্থানে সারদাপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

"দেখিব গোবরডাঙ্গা সারদাপ্রসন্ন, ধনশালী তমোহীন বন্ধুতা-সম্পন্ন;

পবিত্র কলত্র তত্র ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী, স্বভাবে সাবিত্রী কিংবা সীতা বিম্বাধরী"

দীনবন্ধু বাবু তাঁহার "বিয়ে পাগলা বুড়ো নামক পুস্তকখানি সারদাপ্রসন্ন বাবুর নামে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার উপর অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় দিয়াছেন। সারদাপ্রসন্ন বাবুর একজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী, বিয়েপাগলা ছিল, সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত পুস্তক রচিত হইয়াছিল। (ক্রমশ)

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব 'প্রভা' সম্পাদক।

হিমালয় ভ্রমণ।

(পরিশিষ্ট)

এতদূরে আমার হিমালয় ভ্রমণ একপ্রকার শেষ হইল। কিন্তু প্রথমেই বলা হইয়াছে, আমার ভ্রমণের প্রধান লক্ষ্য দুটী স্থান। তাহার অন্যতম, পঞ্চনদ ক্ষেত্রে গুরু নানক-তীর্থ "অমৃতসর" এখনও বাকি আছে। ইতিমধ্যে যে এক বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল,—যেপ্রকার কর্ত্তব্যানুরোধে আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে মনে করিয়াছিলাম যে, ঐ সাধ বুঝি পূর্ণ হইল না। কিন্তু বিধাতার করুণায় সকলই অনুকূল হইয়া গেল; সুতরাং তাহাতে আজ আমার কি প্রকার আনন্দ হইল তাহা পাঠক পাঠিকাগণ অনুভব করুন।

এখানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। আমার এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার সম্ভাবনা ছিল না, (সে কথাও প্রথমে বলা হইয়াছে)

কেবল একজন লোক নিজের বিশ্বাস মতে নিঃসম্বলে—স্বাধীনভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছে মাত্র ; তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশযোগ্য নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশে এবং তত্তৎ স্থানের বিবরণসহ বর্ণনাটী যে সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইবে তাহা আশা করা যায় না। শরণাগতের সঙ্গে ভগবানের যে 'খেলা' তাহার বর্ণনা বিশ্বাসী ভক্তের সদা স্পৃহনীয় হইলেও একাধিকবার এ দীর্ঘ-বর্ণনা সাধারণ পত্রিকায় আর কেন ? এই মনে করিয়া এইখানে এ প্রবন্ধ শেষ করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু যে বন্ধুর আদেশের ভিতর দিয়া ভগবান্ ইহা প্রকাশ করাইলেন (অন্ততঃ আমার এইরূপ বিশ্বাস) তিনি পুনরায় বলিলেন "তাহা উচিত নহে।" অর্থাৎ উভয় স্থানের নাম করিয়া যে বর্ণনার কথা প্রথমে স্বীকার করা হইয়াছে তাহা পূর্ণ করা আবশ্যক। এইজন্য আমার "অমৃতসর" দর্শন এবং যাওয়া আসার পথে যে সকল স্থানে ও বিষয়ে, ভগবানের মহিমা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা "হিমালয় ভ্রমণ (পরিশিষ্ট)" রূপে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বর্ণনা যথাসাধ্য সংক্ষিপ্তভাবেই করিতে চেষ্টা করিব। আশাকরি পাঠক পাঠিকাগণের তজ্জন্য ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না।

২৮শে কার্ত্তিক বুধবার হরিদ্বার হইতে বেলা ৯টার ট্রেণে যাত্রা করিলাম। অমৃতসর যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য কিন্তু ঘটনা আমাকে যেন আরো কিছুর মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে চাহে। সঙ্গে ট্রেণ ভাড়া অল্প থাকায় আজ রুড়্‌কি পর্য্যন্ত টিকিট করিলাম, এবং বেলা প্রায় ১২টার সময় রুড়্‌কি ষ্টেশন হইতে ভিতরে আসিলাম। অসময় হইয়াছে, বিশেষ এখানে কেহই পরিচিত নাই। একটী বাঙালী বাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। সাম্‌নে চাকর ছিল, তাহার নিকট জানিলাম এ বামাচরণ বাবুর বাড়ী ; তিনি এখন মিরাট গিয়াছেন, বাড়ীতে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা আছেন মাত্র। আরো জানিলাম এ সহরে বাঙালী ২।৩ জন আছেন এখন সকলেই কর্ম্মস্থানে গিয়াছেন। আমি বামাচরণ বাবুর বাড়ী স্নান করিয়া চাকরের নিকট আমার আসন রাখিয়া বেড়াইতে চলিয়া গেলাম।

"রুড়্‌কি ব্রীজ" অর্থাৎ হরিদ্বার হইতে দক্ষিণাভিমুখে গঙ্গার ক্যানাল আসিয়া এখানে একটী পূর্ব্বপশ্চিমবাহিনী অগভীর নদী থাকায় তাহার উপর দিয়া সেতুযোগে ক্যানাল লইয়া যাইতে হইয়াছে। সেতু বা ব্রীজ্ প্রায় আধ মাইল পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার নির্ম্মাণ কৌশল অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। তলদেশ ও দুইপার্শ্ব খিলানের গাথ্‌নি অতি আশ্চর্য্যজনক এবং বহু ব্যয় সাপেক্ষ। তৎপরে খুব খোলা জায়গায় রুড়্‌কি কলেজের সম্মুখে গিয়া পড়িলাম, কিন্তু ভিতরে যাইতে আর ইচ্ছা হইল না, কিছু পরিশ্রান্ত হইয়া ছিলাম। আর একটু অগ্রসর হইয়া

একটি উদ্যান বাটিকার দ্বারে লেখা দেখিলাম R. P. Mission, বুঝিলাম খৃষ্টীয় মিশন। ভিতরে গেলাম তখন স্কুলের কার্য্য হইতেছে দেখিয়া চলিয়া আসিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় একটি শুভ্র শ্মশ্রুধারী মিষ্টভাষী ভদ্রলোক (হিন্দুস্থানী বোধ হইল) আসিয়া আমার আবশ্যক জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার ভাব বুঝিয়া একটা ঘরে বসিতে দিয়া কিছুক্ষণের জন্য বিদায় লইলেন। তৎপরে আসিয়া আলাপ করিলেন, তাঁহার নাম নারায়ণ দাস। এখানে একটী অনাথ আশ্রম এবং বালক-বালিকা-স্কুল আছে। নারায়ণদাস বেশ সদালাপী, আমাকে কথাবার্ত্তায় এবং জল—(বোধ হয় কিছু খাদ্যও ছিল) পান করাইয়া তৃপ্ত করিলেন। তাঁহার সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম ও একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। যখন সহরে ফিরিয়া আসিলাম তখন বেলা ৫টা বাজিয়া গিয়াছে।

বামাচরণ বাবুর বাড়ী হইতে আমার আসন লইয়া বাবু শ্যামাচরণ সুরের বাসায় গেলাম ও তথা হইতে হেমবাবুর বাসায় আসিলাম। এখানে রাত্রিতে ভগবানের নামগান হইল। দিনের বেলায় আমার আহার হয় নাই শুনিয়া শীঘ্র শীঘ্র খাদ্য প্রস্তুত করিতে বলিলেন। আহার করিয়া শ্যামবাবুর সদর ঘরে আসিয়া রাত্রে শয়ন করিলাম।

২৯শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার। প্রাতে স্নানাদি করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া যখন বামাচরণ বাবুর বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছি, হঠাৎ আমার পশ্চাতে বামাচরণ বাবুর চাকর আসিয়া আমার হাতে একটী সিকি দিয়া বলিল, "মহারাজ! কাল মাইজীর বাড়ী আপনার আহার হয় নাই, ইহা আপনার জন্য তিনি দিয়াছেন।" আমি মনে করিলাম যদি ইহা না লই তবে বৃদ্ধা মনে ও সংস্কারে আঘাত পাইবেন। বোধ হয় তিনি আমাকে হিন্দুস্থানী সাধু মনে করিয়াছিলেন।

শ্যামবাবুর বাড়ী আহার করিয়া বেলা ১০টার পর ষ্টেশনে আসিলাম, সাহারাণপুরের টিকিট করিয়া ট্রেণে উঠিলাম। বেলা ৪টার পর সাহারাণপুর পৌঁছিয়া, ষ্টেশনে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম এখানে সাধুদিগের থাকিবার স্থান কোথায় পাওয়া যাইবে, সে ব্যক্তি বলিল "মহারাজ! বাবু গঙ্গারামের বাগিচায় চলে যান।" ষ্টেশনের নিকটেই বাবু গঙ্গারামের বাগিচায় আসিয়া দেখিলাম, বাগিচা মানে বাড়ী; স্থানটা অনেক যায়গা লইয়া একটা পল্লীর

মত। কতকগুলা বাড়ী ঘর বসতি আছে, কিছু কিছু শস্য ক্ষেত্রেও আছে, তাহার মধ্যে বাবু গঙ্গারামের ছোটখাট পাকা বাড়ী। অনেক লোকজন বালক বালিকা ও গো, মহিষ লইয়া—একটা বড় পরিবার বোধ হইল। বাবু গঙ্গারাম তখন বাড়ী ছিলেন না। তিনি রেলওয়ে কন্‌ট্রাক্টার। আমি তাহার গৃহে অতিথি হইলাম।

আজ আমি এই প্রথমে পঞ্জাবী গৃহস্থের বাড়ী অতিথি হইয়া এখানে একটু বিশেষত্ব দেখিলাম। ইহারা যে এরূপ সাধুসেবা প্রিয় তাহা আমি আজ প্রত্যক্ষ করিলাম। গুরু নানকের ধর্ম্মের প্রভাবে সাধুভক্তি এই জাতির অস্থি মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। আমি আহারাদি করিয়া শুইয়াছি তখনও নিদ্রা আসে নাই, হটাৎ দেখি আমার কে যেন পা টিপিয়া দিতেছে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখি, সুন্দর সুন্দর ৩টী বালক, "মহারাজ সেবা করে, সেবা করে" বলিতেছে—তখন বুঝিলাম তাহারা গৃহস্বামীর পুত্রগণ। তাহাদের শিক্ষাই এই যে, গৃহে সাধু শান্ত আসিলে তাঁহাদের পদসেবা করিতে হয়। অতঃপর আমি তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া গল্প শুনাইলাম এবং তাহারা আমার নিকট বাংলা বর্ণমালা লিখিয়া লইয়াছিল।

৩০শে কার্ত্তিক। প্রাতে বাবু গঙ্গারামের সঙ্গে আলাপ হইল। তৎপরে স্নানাদির কার্য্য শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান অন্তে সহরের মধ্যে চলিয়া গেলাম। বঙ্কিমবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল বাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ হইল। তিনি অনেক সৎপ্রসঙ্গ করিয়া শেষ এক সাধুর কথা বলিলেন যে, তিনি সাধন দ্বারা এমন শক্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, সর্ব্বজীবে তাহার একান্ত সমবেদনা অনুভব হইত। একদা তিনি দেখিলেন এক গাড়োয়ান গোরুর পীঠে দুই ঘা চাবুক মারিল, সাধু তাহাতে নিজদেহে ব্যথার ভাব প্রকাশ করেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে তাঁহার পীঠের কাপড় তুলিয়া দেখিতে বলেন, তখন দেখা গেল তাঁহার পাঠে দুইটী চাবুকের দাগ পড়িয়াছে। আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাহাতে মনে হয় বঙ্কিমবাবু যেন এ ঘটনা সচক্ষে দেখিয়াছিলেন বলেন, এবং উক্ত সাধু বোধ হয় তাঁহার গুরু ছিলেন। অতঃপর শেষ কথা হইল, আগামী কল্য প্রাতে যেন তাঁহার বাড়ী আমি মধ্যাহ্ন ভোজন করি, আর আমার সঙ্গীত শুনাইবার অভিপ্রায়

বুঝিয়া বলেন প্রাতেই সঙ্গীত হইবে। এখানে নৈনিতাল সন্নিহিত ভীমতাল আশ্রমস্থ 'সোহং স্বামী'র (ভূতপূর্ব্ব সার্কাসের প্রফেসর শ্যামাকান্ত চাটুয্যের) এক শিষ্যের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সাহারাণপুরে আরও ২।৪টী বাঙালী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

১লা অগ্রহায়ণ। বঙ্কিমবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বেলা ২টার সময় সাহারাণপুর ছাড়িলাম। যাত্রাকালীন ষ্টেশন সন্নিহিত কারখানায় বাবু গঙ্গারামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে তিনি বলিয়াছিলেন। আমি আজ অম্বালা পর্য্যন্ত যাইতে চাই শুনিয়া তিনি একখানি টিকিট করিয়া দিলেন এবং বলিলেন "অম্বালা বাবু মুক্তাসিংএর গুরু দরবারায় থাকিবেন।"

(ক্রমশঃ)

দুঃখ।

ওহে দুঃখ তুমি মোরে কি দেখাও ভয়,
অতি নিদারুণ তুমি ভবের মাঝারে,
পাষাণ সমান তুমি নির্ম্মম নিষ্ঠুর,
তথাপি করিনা ভয় আমি তো তোমারে।

ভীষণ ভ্রূকুটি করি যার পানে চাও,
তব কোপানলে ভস্ম করি সেই ক্ষণে
অতুল বিভব রাশি, জনমের মতো
রাখো সেই অভাগার মরণ-জীবনে।

যেখানে নির্দ্দয়, তুমি কর পদার্পণ,
স্বর্গের মাধুরী যদি তার কাছে হারে,
তাহ'লেও মুহূর্ত্তেকে চূর্ণ হ'য়ে যায়;
সাজাইয়া ধ্বংস-রাশি নষ্ট কর তারে।

সুখ যথা মন-সুখে করেন বসতি
অটল অচল সম অনন্তের তরে,—
একবার তব দৃষ্টি পড়িলে তথায়,
আকাশ-কুসুম-সম ভাঙে হু হু করে'।

শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা অন্নপূর্ণা সদা
দীন হীন দরিদ্রের বসতি অন্তর,
এমন সুখদ স্থানে তোমার কৃপায়
দুর্ভিক্ষের ভীম দৃশ্য উঠে নিরন্তর।

সাহসী নির্ভীক বীর, প্রতিজ্ঞা পালনে
নিজ প্রাণ তুচ্ছ মানি দেয় জলাঞ্জলি ;
এহেন বীরেশ উড়ে আবর্জ্জনা মতো
সহিতে নারিয়া তব ভীম-শরাবলী।

ধার্ম্মিক প্রধান, যাঁর ধর্ম্মে রত মন,
পরদ্বেষ পাপকার্য্য পৃথিবীতে যতো
স্পর্শিতে যাঁহার অঙ্গ নারে কদাচন,
সেও ছাড়ে নিজ-পথ কণ্টকের মতো।

এহেন ভীষণ তুমি শার্দ্দূল-বিজয়ী
তব উপক্রমে ভাঙে সুখ সাধ যত,—
শূন্যে অট্টালিকা সম, কটাক্ষ সন্ধানে ;
তোমার তাড়নে কাঁপে সবাই সতত।

কে বলে গরল 'সেঁকো' অতি ভয়ঙ্কর,
যাহার পরশে হয় বিলুপ্ত চেতন,
একেবারে খুলে যায় ভবের শৃঙ্খল
জ্বালিয়া হৃদয়-মাঝে আক্ষেপ-জ্বলন।

কিন্তু তব ভীম শ্বাস স্পর্শে তনু যার,
চির দিন কাঁদে সেই এ ভব-ভবনে;
তাহার সুতীব্র জ্বালা থামেনা কখন
আলিঙ্গন করে তোমা সজল নয়নে।

যদিও মূরতি তব অতীব ভীষণ,
তথাপি হৃদয় মম নহে বিচলিত,
চির সখা তুমি মোর শৈশব যৌবনে,
তাই সদা তোমা হেরি হই আনন্দিত।

অভ্যাসে গরল হয় অমৃত সমান,
শ্বাপদে মানবে হয় অক্ষয় প্রণয়,
তবে তোমা সনে মোর সুদৃঢ় সদ্ভাব
কেন না হইবে ভবে ?—হ'য়েছে নিশ্চয় !

শৈশবের ক্রীড়া-সঙ্গী তুমি দুঃখ মোর,
কৈশোরের বন্ধু তুমি বিধির বিধানে,
তবে এ যৌবন কালে ভ্রূকুটি বিস্তারে
কেন মিছে ভয় মোরে দেখাও বয়ানে ?

এস এস প্রিয় বন্ধো, তুমি মোর সখা,
আজীবন তব সনে রহিব জড়িয়া ;
কেবলে তোমায় দুঃখ অতি নিরদয়,
তুমি যে আমার সঙ্গে রয়ে'ছ মিশিয়া !

উঠুক্ সহাস্য-মুখে তব নিন্দা-ধ্বনি,
গাহুক কল্পনা-কবি তব নিন্দা গান ;
জগত বিপক্ষ হ'লে তবুও বলিব—
"অন্ধের নয়ন দুঃখ শীতলিতে প্রাণ।"

তুমি মোর চির সখা চির দিন থাকো
আমারে ঘেরিয়া, দূরে যেওনা কখন।
জগদীশ-পদে সদা করি এ প্রার্থনা
সহাস্যে তোমারে পারি করিতে বরণ।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

সংগ্রহ।

মার্কিনের বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারগণ এক বিরাট সভায় বহু পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন;—তুঁতে জলের দূষিত বীজাণু বিনষ্ট করে। টাইফয়েড্ জ্বর, কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি সকল দূষিত জলস্থ বীজাণুর দ্বারাই হইয়া থাকে। তুঁতে দ্বারা শোধিত জল পান করিলে ঐ সকল রোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। জলকে সিদ্ধ করিয়া অত্যন্ত উষ্ণ করিলেও যে সকল বীজাণু মরেনা, তুঁতে দ্বারা তাহারা মরিয়া যায়। জলে এরূপ পরিমাণে তুঁতে মিশ্রিত করিতে হয়, যাহাতে বর্ণ বা আস্বাদের কোনো ব্যতিক্রম না ঘটে। আমেরিকার সায়েন্টিফিক্ পত্রে লিখিত হইয়াছে, এক শত মণ জলে সওয়া তিন তোলা বা প্রতি আড়াই হাজার মণ জলে একসের পরিমিত তুঁতে ব্যবহার করিতে হয়। পল্লীগ্রামের দূষিত জলপান করিয়া যাঁহারা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাবিধ রোগে ভুগিতেছেন, তাঁহারা পানীয় জলে ঐ পরিমাণ তুঁতে মিশ্রিত করিয়া তৎপরে সেই জল ছাকিয়া পান করিতে পারেন। তুঁতে মিশ্রিত করিবার তিন চারি ঘণ্টা পরেই জলের দূষিত বীজাণু মরিয়া যায়।

সিহোরের প্রবাসী ডাক্তার মিঃ উইলিয়াম এফ্, ব্রেণ, আই-এম্ এস্, সর্প-দংশনের এক নূতন চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই নবপ্রণালীর চিকিৎসার কথা 'পাইওনিয়ার' পত্রিকায় লিখিয়া পাঠাইয়া-ছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে,—"একটি কাচের গ্লাসে করিয়া কিঞ্চিৎ স্পিরীট্ রাখিয়া, তাহাতে কার্পাসের তুলা ভিজাইয়া যে স্থানে সর্পে দংশন করিয়াছে, সেই ক্ষত স্থানের উপরে ঐ গ্লাসটি রাখিয়া স্পিরীট্ সংযুক্ত কার্পাস

তুলায় অগ্নি সংযোগ করিয়া দাও। তুলা পুড়িয়া গ্রাসের মধ্য দেশে বায়ুশূন্য হইলে দেখা যাইবে যে, গ্রাসে বিষাক্ত রক্ত সঞ্চিত হইয়াছে। এইরূপে বায়ুশূন্যতার প্রাবল্য বিলক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেন না দেখা যায় যে, ক্ষত স্থানের চর্ম্ম ঐ গ্রাসে আঁটিয়া লাগিয়া যায়।" যে স্থান সর্পদষ্ট হইলে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিবার উপায় থাকে না, তিনি সেইরূপ স্থানে এই চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। যাঁহারা সর্পদষ্ট ব্যক্তিগণের চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখিতে পারেন। আমাদের দেশে 'মাল' বৈদ্যগণ এবং ওঝাগণ দংশন কঠিন জ্ঞান করিলে, 'অনল-বাণ' প্রভৃতি করিয়া থাকে, তাহাতে তুলার সলিতা ঘৃতে ভিজাইয়া কলার পাতার উপরে করিয়া ক্ষত স্থানে রাখিয়া ঐ সলিতা জ্বালিয়া দেয়। বোধ হয়, ডাক্তার উইলিয়ামের চিকিৎসার সহিত ঐ চিকিৎসার বিজ্ঞান-সঙ্গত কোনো সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

স্থানীয় সংবাদ।

পীড়িত শরৎচন্দ্র—খাঁটুরা দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ রক্ষিতের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র রক্ষিত অত্যন্ত পীড়িত হইয়া চিকিৎসার্থে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; তাহাতে আমরা চিন্তিত হইয়াছিলাম। ঈশ্বর কৃপায় এক্ষণে তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, শরৎ বাবু এই সময় তাঁহার পিতৃকীর্ত্তি ডাক্তার খানার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য একটা ট্রাষ্ট্ সম্পত্তি দ্বারা উহার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়, নতুবা ঐ কার্য্য স্থায়ী হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। খাঁটুরা গোবরডাঙ্গার ব্যবসায়ী শ্রেণী, কোন কোন সৎকার্য্য করিয়াও তাহাকে স্থায়ী করিতে পারেন নাই, প্রায় এক পুরুষেই তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলেরই একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, সুব্যবস্থার গুণে জগতে কত কত সৎকীর্ত্তি সুদীর্ঘ-কাল স্থায়ী হইয়াছে।

Printed by J, N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

দ্বিতীয় বর্ষ] ভাদ্র, ১৩১৭। [১১শ সংখ্যা।



খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়

সম্বলিত, ধর্ম্ম, সমাজ ও

বিবিধ বিষয়ক

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

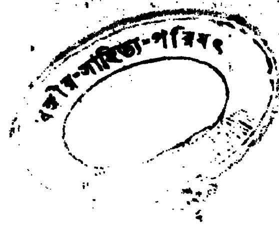
দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

কুশদহ-কার্য্যালয়

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১।০ মাত্র। প্রতি সংখ্যা /১০ পয়সা,

/১০ টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান যায়।



কুশদহ মাসিক পত্র,
ভাদ্র ১৩১৭।

প্রার্থনা।

গাও কণ্ঠ, বাজ বীণা, মিলি সম-সুরে,
ঈশ-ইচ্ছা, জীব-ইচ্ছা মিলে যে প্রকারে।

হে সর্ব্বগত সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা বিশ্বপতি ভগবন্! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি যে তোমার অপার করুণা প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু সকল নরনারী তো তোমার করুণা অনুভব করিতেছে না, বরং তোমার করুণায় এবং তোমার স্বরূপে স্থির-বিশ্বাসের অভাবে কি প্রকার অশান্তি জ্বালা অনুভব করিতেছে তাহা তো আমরা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিতেছি। প্রভু! আমরা যে তোমার করুণা দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম; তাই কি চারিদিকে অবিশ্বাস অশান্তি দেখিয়া আমরা এরূপ ব্যথিত? অতঃপর বিশ্বাস সূত্রের সাক্ষ্যদান করিতে—তোমার করুণার সমাচার ঘোষণা করিতে তুমি যে আমাদিগকে আদেশ করিয়াছ ইহা যদি কল্পনা না হয়, এবং তাহার উপায় বিধান ও তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ একমাত্র তোমার করুণাতেই হইতেছে এ সকল আমরা স্পষ্টরূপে দেখিয়া, সভয়ে অতি কাতরে তোমার শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি যে অভিপ্রায়ে যে ভাবে, তোমার মহিমার কথা বলাইতে চাও, আমরাও যেন ঠিক সেই ভাবে সেই অভিপ্রায়টীই প্রকাশ করিতে পারি। কেন না এ পথে প্রধান দুইটী বাধা দেখিয়া সম্প্রতি বড় ভীত হইয়াছি। একটা বাধা নিজের আমিত্ব, দ্বিতীয়টী লোকরঞ্জন স্পৃহা। তুমি কৃপা করিয়া আশু এই বাধাবিঘ্ন হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া তোমার মহিমা প্রকাশ করিতে সক্ষম কর। আমরা যেন তোমার আদেশ বিকৃত না করি, এবং লোকরঞ্জন স্পৃহায় সাংসারিক বুদ্ধির অধীন হইয়া তোমার সত্যকে যেন খর্ব্ব না

করি। এই কার্য্যে যখন প্রথম হইতেই তোমার করুণা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন তোমার মঙ্গল অভিপ্রায় কি ব্যর্থ হইবে? ইহা তো কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। অতএব তুমি যে অভিপ্রায়ে এই 'কুশদহ' পত্র প্রকাশ করাইলে ইহাতে তোমার শুভ-ইচ্ছা যাহা, তাহাই পূর্ণ হউক; আমরা যেন যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য সাধন করিয়া, তোমার মহিমা দর্শন করিতে করিতে কৃতার্থ হই।

সঙ্গীত।

ঝিঝিট মিশ্র—একতালা।

বিশ্বাসী হও ওরে মন, সকল অভাব যাবে দূরে।
হয় আশার বায়ু প্রবাহিত সদা বিশ্বাসীর অন্তরে।
জাননা বিশ্বাসের বলে, অটল পর্ব্বত টলে,
অনায়াসে শিলাভাসে গভীর সাগর নীরে।
যে হয় বিশ্বাসী সন্তান, মানে না কোন ব্যবধান,
(সে যে) প্রাণ-মন্দিরে, প্রাণেশ্বরে দেখে সদানন্দ ভরে।
বিশ্বাস হলে সঞ্চার, রহে না পাপ ব্যভিচার,
মায়ের কোলে শিশু ছেলে আনন্দে বিরাজ করে।

(বিধান-সঙ্গীত)

শাস্ত্র সঙ্কলন।

৬৬। শাশ্বতং ব্রহ্ম পরমং ধ্রুবঃ জ্যোতিঃ সনাতনম্।
যস্য দিব্যানি কর্ম্মাণি কথয়ন্তি মনীষিণঃ॥

মহাভারত—আদিপর্ব্ব ১।২৫৫

জ্ঞানীরা যাঁহার পবিত্র কার্য্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনি নিত্য ধ্রুব জ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন পরব্রহ্ম।

৬৭। নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
　　ন হি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে।

আদি ৭৪।১০৪

সত্যের সমান আর ধর্ম্ম নাই, এবং সত্য হইতে প্রকৃষ্ট বস্তুও আর কিছুই নাই, ইহলোকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্থও আর নাই।

৬৮। তপশ্চ দানঞ্চ শমো দমশ্চ হ্রীরার্জ্জবং সর্ব্বভূতানুকম্পা।
　　স্বর্গস্য লোকস্য বদন্তি সন্তো দ্বারাণি সপ্তৈব মহান্তি পুংসাম্॥

আদি ৯০।২২

সাধুলোকেরা বলেন—তপস্যা দান, শম, ইন্দ্রিয়সংযম, লজ্জা, সরলতা ও প্রাণিগণের প্রতি দয়া এই সপ্তবিধ গুণ মনুষ্যের স্বর্গলোকে যাইবার শ্রেষ্ঠদ্বার।

৬৯। এতদ্ধি পরমং নার্য্যাঃ কার্য্যং লোকে সনাতনম্।
　　প্রাণানপি পরিত্যজ্য যদ্ভর্ত্তৃহিতামচরেৎ॥

আদি ১৬০।৪

প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও স্বামীর হিতসাধন করিবে, ইহলোকে নারীগণের ইহাই শ্রেষ্ঠ সনাতন ধর্ম্ম।

৭০। ক্ষমা ধর্ম্মঃ ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা বেদাঃ ক্ষমা শ্রুতম্।
　　য এতদেবং জানাতি স সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হতি॥

বনপর্ব্ব ২৯।৩৬

যিনি জানেন যে, ক্ষমাই ধর্ম্ম, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই বেদ, ক্ষমাই শাস্ত্র, তিনি সকলকেই ক্ষমা করিতে সমর্থ হয়েন।

৭১। ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাম্।
　　ইহ সম্মানমৃচ্ছন্তি পরত্র চ শুভাং গতিম্॥

বন ২৯।৪২।৪৩

জ্ঞানী ব্যক্তির সতত ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; যখন মনুষ্য সকলকে ক্ষমা করেন, তখন তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। অতএব ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগেরই ইহলোক ও ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগেরই পরলোক। তাঁহারা ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে সদ্গতি লাভ করেন।

৭২। যৎকল্যাণমভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিয়োজয়েৎ।
ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ॥

বন ২০৬।৪৪

যাহা কল্যাণ জানিবেক, তাহাতে আপনাকে নিয়োগ করিবেক। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচরণ করিবেক না, সর্ব্বদা সাধুই থাকিবেক।

৭৩। যথাদিত্যং সমুদ্যন্ বৈ তমঃ পূর্ব্বং ব্যপোহতি।
এবং কল্যাণমাতিষ্ঠন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

বন ২০৬।৫৬

সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার তিরোহিত হয়, সেইরূপ পাপ করিয়া কল্যাণ আচরণ করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

অদৃষ্ট-বাদ।

প্রায় সকল লোকই অদৃষ্টবাদী। কিন্তু অদৃষ্ট-বাদে বিশ্বাস সকলের সমান দেখা যায় না। এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা মুখে বলেন "অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে" অথচ এ বিশ্বাসে তাঁহারা নিশ্চিন্ত নহেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, ওরূপ একটা 'মত' মুখের কথায় থাকিলে কিছু আসে যায় না, উহার ফল বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করে। যাঁহারা স্বভাবতঃ বিশ্বাসী, নির্ভরশীল তাঁহারা যে ভাবেই হউক অদৃষ্টবাদের সুফল অনেকটা লাভ করিতে পারেন। এজন্য অদৃষ্টবাদের সঙ্গে বিশ্বাসের নিতান্ত নিকট সম্বন্ধ বলা যায়। যেখানে জ্ঞান অপেক্ষা বিশ্বাসের ভাব অধিক, সেখানে অদৃষ্টবাদের ভাবও অধিক। জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্টবাদের ভাব অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; তাই শিক্ষিত শ্রেণীর অধিকাংশে এখন 'যা'তা' একটা অদৃষ্ট-বাদে ঠিক বিশ্বাসী নহেন। অতএব এই মতভেদ ভাবভেদের মধ্যে অদৃষ্টবাদের সুফল আমরা কি লাভ করিতে পারি তাহাই প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু যাঁহারা অদৃষ্টকে প্রাক্তন বা ভাগ্য বলেন, যাহা পূর্ব্বজন্মের

কর্ম্মফলে হয়, এ প্রবন্ধে আমরা সে সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বলিবার প্রয়োজন দেখি না, কেন না পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে আলোচনা পূর্ব্ব প্রবন্ধে হইয়াছে। এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, অদৃষ্ট শব্দের সহজ অর্থ, যাহা আমাদের দৃষ্টির অগোচর বা জ্ঞানের অতীত, আমরা কিরূপে সেই অ-দৃষ্ট অজ্ঞাত বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে কার্য্যক্ষেত্রে বা জীবন-পথে চলিতে পারি, এবং সেই অজ্ঞাত বিষয় বা বস্তু বাস্তবিক কি পদার্থ তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

যাহা দৃষ্টির অগোচর তাহাই অ-দৃষ্ট। দেখা যায় না, জানা যায় না, বুঝা যায় না এমন কতই অসীম-বিষয় আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, জানিতে পারি, বুঝিতে পারি, এমন বিষয় কত অল্প, অথচ নিয়ত আমাদিগকে না দেখা, না জানা, না বুঝা বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতেই হয়। প্রতি নিয়তই আমাদিগকে অ-দৃষ্টের মধ্যে প্রবেশ করিতেই হইতেছে। সুতরাং সেই অদৃষ্ট বস্তু কি ? আমরা কোন্ অজ্ঞাত বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করি তাহা প্রথমতঃ দেখা উচিত। দ্বিতীয়তঃ সে বস্তু আমাদিগকে কোনও নির্ভরশীলতা নিশ্চিন্তত। দিতে পারে কি না তাহাও দেখা আবশ্যক।

আমরা সহজজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে পারি যে, আমাদের জ্ঞান কত অল্প— আমরা কতটুকু বুঝি, কিবা জানি ; অথচ আমাদের এই অল্প জ্ঞানও প্রকাশ পাইত না যদি ইহার মূল অনন্তজ্ঞান না হইত। যদি আমরা অনন্ত জ্ঞানের আশ্রিত না হইতাম, তবে আমাদের স্থিতিরও সম্ভাবনা ছিল না। বোধ হয় এখন বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না যে, এ অনন্ত জ্ঞান বস্তু ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা অল্প জ্ঞান সম্পন্ন হইলেও অনন্ত জ্ঞানময় ভগবানের আশ্রিত হইয়া, তাঁহার দ্বারা ওতপ্রোতভাবে পরিবেষ্টিত হইয়া আছি। আমাদের ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সকলই তিনি জানিতেছেন, দেখিতেছেন। আমরা প্রকৃতপক্ষে সেই অসীম জ্ঞানময়—করুণাময়, পরমদয়াল পিতার হাতে আছি। আমরা আমাদিগকে তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি। আমাদের ভালমন্দ,আমরা কি বুঝি, কি বা জানিতে পারি কিন্তু তিনিই আমাদের প্রকৃত মঙ্গল বুঝিতেছেন, তিনিই আমাদের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল বিধান করিতেছেন। আমরা যতক্ষণ বাসনা বিকারে জড়িত থাকি, তাঁহার উপর নির্ভর না করিয়া নিজের

ক্ষুদ্র বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া চলি, ততক্ষণ কিছুতেই সুস্থির—নিশ্চিন্ত-চিত্ত হইতে পারি না; অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াও নিশ্চিন্ত হই না। কিন্তু অদৃষ্ট অর্থে সেই অনন্ত জ্ঞানময়-পুরুষের উপর যখন নির্ভর করিতে পারি তখন নিশ্চিন্ত হই।

এখানে এই এক প্রশ্ন আসিতে পারে যে, আমরা ভগবানের উপর নির্ভর করিলেও কর্ম্মফল জনিত দুঃখ হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইতে পারি? উত্তর। কর্ম্মইতো সজীবতার লক্ষণ, যেখানে জীবন আছে সেখানে কর্ম্মও আছে। ফলভোগী হইব বলিয়াই পিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে সন্তানরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মে এবং তাহার ফলভোগে আমাদের কোনও দুঃখের কারণ নাই কিন্তু কর্ম্মফল অর্থে এখানে যাহা নিজ-বাসনাকৃত কর্ম্ম, যাহা ঈশ্বর-ইচ্ছা না বুঝিয়া কর্ম্ম করা হয়, যাহাকে অকর্ম্ম বলে, তাহার ফল ততদিন ভোগ করিতেই হয়, যতদিন তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া—তাঁহার অধীন হইয়া কর্ম্ম না করা হইবে। যখন তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করা যায়, তখন তিনিই আমাদিগকে বিগত অকর্ম্ম-পাপ, ক্ষমা করিয়া বর্ত্তমান অকর্ম্ম হইতে রক্ষা করেন। বালক যখন পিতার হাত ধরিয়া চলে, তখন সে হাত ছাড়িয়া দিতেও পারে, কিন্তু পিতা যখন বালকের হাত ধরিয়া লইয়া যান তখন বালক নিরাপদে চলে। অতএব এখন বোধ হয় স্বচ্ছন্দে বলিতে পারা যায় যে, আমাদের প্রত্যেক অজ্ঞাত মুহূর্ত্ত একমাত্র অনন্ত অজ্ঞাত ভবিষ্যৎকালের অংশ মাত্র; সেই কালের নিয়ন্তা যখন একমাত্র অনন্ত জ্ঞানময় ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ নন, তখন অনন্ত জ্ঞানময় ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলা আর অজ্ঞাত অ-দৃষ্ট অবস্থায় নির্ভর করা প্রায় একই কথা। সুতরাং যাঁহারা অদৃষ্টের প্রতি এই ভাবে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই তাঁহারা কি অনির্দ্দিষ্ট অন্ধকার আচ্ছন্ন অবস্থার কল্পনা লইয়া সুস্থির থাকিতে পারেন? কখনই না।

শিক্ষিত শ্রেণীর যাঁহারা বলেন অদৃষ্ট বলিয়া এমন কোন অবস্থা থাকিতে পারে না, যাহা বিনা কারণে স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। সকলই কার্য্য কারণ সম্ভূত। কারণ ভিন্ন কোন কার্য্য হয় না। সুতরাং অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা অজ্ঞতা মাত্র। তাঁহাদের এ কথায় আপত্তি করিয়া কেহ কেহ বলেন, "সকল বিষয় যদি এই বর্ত্তমান অবস্থার একমাত্র চেষ্টার ফলেই

হয়, তবে যেখানে দেখা যায় শত চেষ্টা করিয়াও বিদ্যাবুদ্ধি স্বত্বেও কেহ অন্ন সংস্থানে অপারক, আর কেহ বিনা চেষ্টায় লক্ষপতি হয় ইহার কারণ কি ?"

আমরা এখানে শিক্ষিত শ্রেণীর প্রথমোক্ত 'মত' সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াও নির্ভর-শীল চেষ্টার\পক্ষপাতি, অর্থাৎ চেষ্টা বা পুরুষকার প্রয়োগ করিব বটে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ রূপে অনন্ত জ্ঞানময় বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া করিব। তৎপরে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, বিনা চেষ্টা বা যথেষ্ট চেষ্টা না করিয়াও সহসা প্রচুর ফল লাভের কারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে "পুর্নজন্ম" ও "কর্ম্মফল" প্রবন্ধে যে সকল তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। অর্থাৎ "মানুষ কেবল নিজের জন্য নিজে নহে। প্রত্যেকেই বহুর ফল স্বরূপ। প্রত্যেকটী বহুর সঙ্গে ভাল মন্দে, সুখ দুঃখে জড়িত। একে যেমন অপরের সদ্বিষয় লাভে উপকৃত তেমন পাপ অপরাধের জন্যও প্রপীড়িত।" সুতরাং একের সৌভাগ্য অপরে সংক্রমিত হইবে না কেন ? তেমন আর দশের ভারে ভারাক্রান্ত একও কখন কখন ক্ষতিগ্রস্ত। তবে ব্যক্তিগত দোষগুণ যে একেবারেই ব্যর্থ হয় তাহা নহে। যেমন একব্যক্তি কিছুই উপার্জ্জন না করিয়াও উত্তরাধিকারী সূত্রে লক্ষপতি হইয়াও যদি সে ধন সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে তাহার যোগ্যতা না থাকে, তবে বিনা ক্লেশে ফল লাভ করিয়াও তিনি সফল হইতে পারেন না। যাহা হউক ইহার মধ্যে সার কথা এই যে সুখ দুঃখ, সুকৃতি দুস্কৃতি বা সৌভাগ্য এবং দুরাদৃষ্ট সকলের পক্ষে একই বাহ্যিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না। একে যে বস্তু লাভের জন্য লালায়িত, অন্যে তাহা ত্যাগের জন্য ব্যাকুল। একে যে সুখে মগ্ন, অন্যে সে সুখ ত্যাগে সদাসুখী। সুখ দুঃখের প্রকৃত কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞানতার উপর নির্ভর করে। জ্ঞানীর নিকট সকল অবস্থাই সুখকর, অজ্ঞানীর পক্ষে সকল অবস্থাই অশান্তির হেতু হয়। যে জ্ঞানের বিমলানন্দের সংবাদ জানে না, তাহার নিকট সম্পদ ও পার্থিব সুখই কিছুকালের জন্য শ্রেষ্ঠ সুখ বিবেচিত হয়। কিন্তু সম্রাটকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিও বলিবেন বিষয় সুখে প্রাণ সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয় না। প্রাণ আরও কোন অজ্ঞাত—অ-দৃষ্ট বস্তুর আকাঙ্ক্ষী। অতএব বাহ্যিক কোন অবস্থাকে বাস্তবিক সুকৃতি বা দুরাদৃষ্টের ফল স্বরূপ বলা যায় না, উহা প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষে আবির্ভাব ও তিরোভাব নিয়ত হইয়াই থাকে। অজ্ঞানী তাহার ভিতর

হইতে সুখ দুঃখের কল্পনা করিয়া থাকে। বাস্তবিক দুঃখ বলিয়া কোন বস্তু নাই। বিধাতা কেবল মানবের জন্য সুখ বা আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা প্রাপ্তির সহজ-সরল পথ "ঈশ্বর-বিশ্বাস"। ভগবানের কৃপায় সকল মানুষ তাঁহাতে বিশ্বাসী এবং নির্ভরশীল হউন ইহাই আমাদের প্রাণের কামনা।

মাৎসর্য্য।

বরষার ধরাখানি হলে রসবতী
শিখিগণ নাচে গায় করিয়া আরতি,
মুঞ্জরিলে তরুবর অলিগায় গান,
গগনে হাসিলে রবি ধরা পায় প্রাণ।

অখিল জগতে যদি কখন কোথায়
একটি আনন্দ রেখা হাসিয়া লুকায়,
তবে তার অগণন লহরী কম্পন
হাসায় নাচায় বিশ্বে মধুর মোহন।

এক প্রেম সূত্রে বাঁধা বিশ্বচরাচর,
একের আনন্দে হাসে সকলে অপর,
তবে কেন মানবের হৃদয়েতে হায়,
পর সুখে সুখ বিনা দুঃখ দেখা যায়!

প্রেমময় বিশ্বপানে ফিরালে নয়ন
হৃদয়ে নীচতা অত থাকেনা কখন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রশ্ন-উত্তর।

প্রশ্ন। আপনি কি কাজ করেন?

উত্তর। আমি অর্থ বিনিময়ের জন্য কোনও ব্যক্তির বা কোম্পানির কাজ করি না।

প্রশ্ন। তবে কি আপনি কোন ব্যবসা করেন?

উত্তর। অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে আমি কোনরূপ ব্যবসা করি না।

প্রশ্ন। আপনার বুঝি বিষয়-সম্পত্তি আছে, তাহা দ্বারাই আপনার সংসার নির্ব্বাহ হয়?

উত্তর। এক্ষণে আমার কোন বিষয়-সম্পত্তি নাই।

প্রশ্ন। তবে কি আপনি সন্ন্যাসী?

উত্তর। আমি সংসার এবং সমাজ ত্যাগী সন্ন্যাসী নহি।

প্রশ্ন। ওঃ বুঝেছি, আপনি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে বেড়ান; আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের?

উত্তর। আমি সম্পূর্ণরূপে আমাকে কোন সম্প্রদায়ের বলিতে পারি না।

প্রশ্ন। আপনি যখন সংসারে স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করেন, তখন আপনার একটা সমাজ আছেই, সে সমাজ আপনার কোন্ সমাজ?

উত্তর। যে সমাজ বা মণ্ডলীর সহিত আমার উদ্দেশ্য এবং ভাবের অধিকাংশ মিল আছে, তাহাই আমার সমাজ হইলেও, আমি সম্পূর্ণরূপে আমাকে এক সমাজের বলিতে পারি না, কেন না, জগতের কত কত জন-মণ্ডলীর সহিত আমার ভাবের ও উদ্দেশ্যের মিল আছে, সুতরাং সেই বাস্তবিক বিশ্ব-সমাজকে অস্বীকার করিয়া একটী সমাজের নামে আমার পরিচয় দিলে অসত্য বলা হয়।

প্রশ্ন। যে সমাজ আপনারই ন্যায় জগতের সকল মানবের মধ্যে আপনার ভাব ও উদ্দেশ্যের ঐক্যতা দেখিয়া সকলকেই আপনার বলিয়া স্বীকার করেন, এমত সমাজের সহিত আপনার পরিচয় দিতে আপত্তি কি?

উত্তর। এক সমাজ-মধ্যেও যখন সকলের উদ্দেশ্য ও ভাবের ঐক্যতা দেখা যায় না, এমন কি বিপরীত ভাবের ব্যক্তির সহিত এক সমাজের নামে পরিচয় দিতে হয়; পক্ষান্তরে আমার উদ্দেশ্য ও ভাবের মিল জগতের

সকল সমাজের মধ্যেও আছে, ইহা আমি যখন হইতে বুঝিতে পারিয়াছি তখন হইতে আমাকে (আমার নাম একটী ধর্ম্ম-সমাজের নামে পরিচিত থাকিলেও) কোনও এক সমাজের নামে পরিচিত করিতে আমি প্রস্তুত নহি।

প্রশ্ন। আপনার নাম কি ?

উত্তর। আমার নামের সঙ্গে বোধ হয় আমার জাতি জানাই আপনার প্রধান উদ্দেশ্য ?

প্রশ্ন। কতকটা তাহা বটে।

উত্তর। আমার দেহ, প্রচলিত জাতি-সংস্কার অনুসারে যে জাতি হইতে উৎপন্ন, বিশেষ প্রয়োজন হইলে আমি তাহার পরিচয় দিতে অপ্রস্তুত নহি, এবং সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে আমি প্রধানতঃ চারিটী ভাবের (আত্মিক, মানসিক, শারীরিক, এবং অতি স্থূলদর্শী) ভেদ স্বীকার করিয়াও উহাকে জাতি বা বর্ণ এবং তাহা জন্মগত বা বংশগত রূপে স্বীকার করি না। অতএব আপনি যে ভাবে আমার জাতি নির্ণয় করিতে চাহিতেছেন, তাহা ভ্রান্তি মাত্র, সুতরাং অপ্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন। আপনি কি ব্রহ্মজ্ঞানী ?

উত্তর। ব্রহ্ম অনন্ত-অসীম, তাঁহার জ্ঞানও অশেষ, তাঁহার জ্ঞানের কতটুকু আমি লাভ করিয়াছি তাহা ঠিক করিতে পারি না, সুতরাং সে অর্থে আমি আমাকে "ব্রহ্মজ্ঞানী" বলিতে পারি না। আমি জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষী মাত্র।

প্রশ্ন। আপনি যে প্রকার স্বাধীনতা এবং উদারতার কথা বলিতেছেন, তবে কি আপনি কোনও সমাজ এবং সাধু ভক্তের নিকট উপকৃত নহেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাদের বাধ্যতা স্বীকার করেন না ?

উত্তর। আমি জগতের সকল সাধু-ভক্ত মহাজনকেই ভক্তি করি, বিশেষ বিশেষ ভাবের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকেও ভক্তি করি, কেবল এক ভগবান্ ভিন্ন কোন সমাজ বা ব্যক্তির নিকট আত্ম-বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক নহি।

প্রশ্ন। আপনার কথাগুলি শুনিতে মন্দ নয়, আচ্ছা মহাশয়! আর একদিন অনুগ্রহ করে দর্শন দিবেন, আরও অনেক প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা রহিল। আজ একটু কাজের জন্য ব্যস্ত আছি।

উত্তর। যে আজ্ঞা, নমস্কার।

কশ্চিৎ "ব্রহ্মজ্ঞান" আকাঙ্ক্ষী।

হিমালয় ভ্রমণ। (পরিশিষ্ট)

২

অম্বালা পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। ষ্টেশন হইতে বাবু মুক্কাসিংএর গুরুদরবারা উদ্দেশে চলিতে চলিতে একটু অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতে যাইতে একজন বাঙালীর সঙ্গে দেখা হইল। সে ব্যক্তি বলিল "আজ আপনি এই নিকটেই কালীবাড়িতে থাকিতে পারেন, মুক্কাসিংএর দরবারা আরও বাহির পথে দূরে আছে এ অন্ধকারে যাইতে আপনার কষ্ট হইবে।" সুতরাং আমি কালীবাড়ি গেলাম।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কোন কোন স্থানে বাঙালীর দ্বারায় কালীবাড়ি স্থাপিত হইয়াছে, এখানে সহসা কোন ভদ্রলোক আসিলে, এমন কি সপরিবারেও থাকিবার স্থান প্রাপ্ত হন। তবে সাধু সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে এ সকল স্থান উপযুক্ত নহে ; তাঁহাদের প্রয়োজনও হয় না, কেননা সে জন্য 'ছত্র', 'মঠ' বা আশ্রম সকল যথেষ্ট। যাহা হউক আমি এক রাত্রির জন্য কালীবাড়ি রহিলাম। ইতিমধ্যে একব্যক্তি আমার নাম জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে আমি বলি, আমি যে বাঙালী তাহাতো বুঝিয়াছেন, তারপর আমার নাম জিজ্ঞাসায় বোধ হয় আমার জাতি জানাই আপনার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি ওরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলা অনাবশ্যক মনে করিয়াছি। সুতরাং তাহা জানিয়া আমার সম্বন্ধে আপনাদের কোন ফল নাই ; এই কথার মধ্যে আর একটি ভদ্রলোক বলিলেন, "সাধুর নাম জিজ্ঞাসা করা অন্যায়," তখন পূর্ব্ব প্রশ্ন কর্ত্তা কিছু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "হাঁ! আমার অন্যায় হইয়াছে।" তাঁহাকে আমি বলিলাম, না মহাশয়! এ আর আপনার অন্যায় কি, আমিতো সন্ন্যাসী সাধু নহি। যাহা হউক অবশেষে তাঁহাদের সঙ্গে কিছু ভাল কথাবার্ত্তা হইল।

২রা অগ্রহায়ণ, প্রাতে কালীবাড়ি আসন রাখিয়া মুক্কাসিংএর গুরুদরবারার অনুসন্ধানে গেলাম। অল্প দূরে গিয়াই তাহা পাইলাম। দরবারার দ্বার দেশে একটী যুবক সাধু দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার সহিত আমার প্রথমে আলাপ হইল। তিনি আমার সঙ্গে আসিলেন এবং কালীবাড়ি হইতে আমার আসন লইয়া পুনরায় দরবারায় গেলাম।

শিখদিগের গুরুদরবারা প্রায় হিন্দুর ঠাকুরবাড়ি তুল্য, তবে এখানে কোন দেবমূর্ত্তি নাই এবং সাধুদিগের জাতিভেদ নাই। সাধু মাত্রেই যিনি ইচ্ছা ও সাহস করিয়া যাইতে পারেন তিনিই স্থান পাইয়া থাকেন।

অল্পক্ষণের ম

মধ্যে এখানে

কেন জানি না,

উপস্থিত হইল।

লাগিলেন, অথচ

তেজস্বী, ধর্ম্মপিপ

হইল তাহা প্রায়

বেশ তৃপ্তি বোধ

হাঁটু পর্য্যন্ত একা

নিঃসঙ্গভাবে বি

ভেক-চিহ্ন এবং

বিরোধী। তাঁহ

প্রাণের অনুরাগ

পরমহংস সন্ন্যাসি

কথাবার্ত্তা হইল। তৎপরে স্নান আহারান্তে বসিয়া কথাবার্ত্তার মধ্যে বলিলেন, "এক সাধুর কথা আমি অনেকদিন হইতে শুনিয়াছি, সে স্থানের নিকট দিয়াও কতবার গিয়াছি কিন্তু কখন তাঁহাকে দেখি নাই, আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে উভয়ে যাওয়া যায়।" (অবশ্য আমাদের সকল কথাই হিন্দি ভাষায় হইতেছিল।) আমি বলিলাম, কতদূর যাইতে হইবে? তিনি বলিলেন, "এখান হইতে চলিয়া গেলে আজ রাত্রে এক গ্রামে থাকিয়া আগামী কল্য বেলা দুই প্রহরের মধ্যে তথায় পৌঁছিতে পারা যাইবে। আর অল্প দূর ট্রেণে গেলে কল্য ৮৷৯টার সময় পৌঁছিতে পারা যায়, কিন্তু ট্রেণে যাইবার প্রয়োজন কি? আমি বলিলাম, আমার নিকট কিছু রেলভাড়া আছে চলুন, কতকটা ট্রেণেই যাওয়া যাক্। এই বলিয়া যেমন সঙ্কল্প অমনি যাত্রা করা হইল। কিন্তু মনে হইল বাবু গঙ্গারাম, মুক্তাসিংএর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন, বিশেষতঃ,

তাঁহার আশ্রমে রহিলাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। ইহা শুনিয়া সাধু বলিলেন, "বাজারে তাঁহার দোকানে, তিনি এক্ষণে বোধ হয় আছেন।" আমরা বাবু মুক্তাসিংএর দোকানে গিয়া, আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলাম, সাহারাণপুরে বাবু গঙ্গারাম আপনার দরবারায় থাকিতে আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি আজ আপনার দরবারায় ছিলাম, এক্ষণে এক মহারাজের সহিত আর এক মহাত্মার দর্শনে যাইতেছি। বাবু মুক্তাসিং প্রবীণ শান্তমূর্ত্তি পুরুষ। তিনি বলিলেন, "আজ আমাদের দরবারায়, দরবার অর্থাৎ সভা হইবে, আপনি থাকিলে ভাল হয়।" আমি বলিলাম, সঙ্কল্প করিয়া যাত্রা করিয়াছি, সঙ্কল্প ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নহে। তখন তিনি একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভিতর হইতে একটী টাকা আনিয়া আমার হাতে দিলেন।

আমরা ষ্টেশনে আসিয়া যথা সময়ে ট্রেণে উঠিলাম। কয়েকটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া সারাণ্ডী ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণ হইতে গ্রামাভিমুখে চলিয়া এক গ্রামে এক গৃহস্থ বাড়িতে রাত্রি যাপন করিলাম। গৃহস্বামী সামান্য অবস্থাপন্ন হইয়াও আমাদিগকে খুব যত্নে আহার ও শয্যা দিলেন। বোধ হইল, আমার সঙ্গী সাধুর সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বেও পরিচয় ছিল।

৩রা অগ্রহায়ণ প্রাতে চলিয়া আমরা বেলা ৯টার মধ্যে 'বাধৌচি' গ্রামে সাধুর আশ্রমে পৌছিলাম। গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কিছু দূরে দূরে এক এক ঘর বসতির চারিদিকে ক্ষেত্র সকল। মধ্যে মধ্যে এক একটা কূপ, তাহা হইতে মহিষের দ্বারা চালিত এক প্রকার কাষ্ঠের যন্ত্রে শত শত কলস জল উঠিয়া ক্ষেত্র সকল অভিষিক্ত হইতেছে। এ প্রদেশে চাষ কার্য্যে বৃষ্টির জলের জন্য প্রায় নির্ভর করিতে হয় না। ঐ গ্রামের এক প্রান্তে আশ্রম; আশ্রমের পর কেবল জঙ্গল, কিন্তু এ নিবিড় বন-জঙ্গল নহে, ছোট ছোট গাছে এক প্রকার 'ঝাঁটি-জঙ্গল' বলে। এক একটি ঝোপের চারিধার এমন পরিষ্কার, বোধ হয় এক্ষণেই কেহ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে, অথচ তাহা স্বাভাবিক। এমত অসংখ্য জঙ্গল শ্রেণীতে শুনিলাম ১২ মাইল স্থান ব্যাপিয়া এই বন। এই স্থান পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত। আরও শোনা গেল পাতিয়ালা মহারাজা এবং ঐ স্থানের জনমণ্ডলী সাধুর প্রভাব অনুভব করেন। এই জঙ্গলে কোন ইংরাজ শিকারী আসিয়া বন্দুক চালাইয়া জীব হিংসা করিবার হুকুম নাই।

তারপর আমরা যাঁহাকে দেখিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া এতদূরে আসিলাম, তিনি কখন আশ্রমে থাকেন না। আশ্রমের বাহিরে ঐ জঙ্গলের মধ্যে কতকগুলি পর্ণ-কুটীর আছে, তাঁহার যখন যেটায় ইচ্ছা থাকেন। জঙ্গলের অনতিদূরেই তিনি তখন আছেন শুনিয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। প্রথমে যাহা দেখিলাম, তাহাতে শ্রদ্ধা ভক্তির বিষয় কিছুই মিলিল না। তিনিতো উলঙ্গ এবং দেখিতেও সুন্দর-সুশ্রী নহেন। তারপর আমরা একটু নিকটস্থ হইতে চেষ্টা করিতেছি এমন সময় তিনি আমাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া ভয়ানক ধমক দিয়া "আরে, চলি যা, চলি যা" বলিয়া উঠিলেন। আমরা সাধুবাক্য শোনাই কর্ত্তব্য জ্ঞানে তখন আশ্রমে আসিলাম। আশ্রমটী অতি সুন্দর মনোরম বোধ হইল। প্রশস্ত প্রাঙ্গন মধ্যে রোপিত এক একটী বকুল, আম্র, নিম্ব বৃক্ষ-শ্রেণীতে সুশোভিত এবং ছায়াযুক্ত। বৃক্ষমূলে বেদীগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তথায় বসিয়া সাধন ভজনের পক্ষে অতি অনুকুল স্থান। আমি একটী বৃক্ষতলে স্থান করিয়া লইলাম। আশ্রমে আর একটী প্রশস্ত পাকাগৃহ মধ্যে একদিকে রন্ধনাদি হয়, অপর দিকে রাত্রে অনেকেই শয়ন করিয়া থাকে। আমরাও রাত্রে ঘরের ভিতর ছিলাম। প্রতিদিন অনেক নরনারী সাধুজীকে দর্শন করিতে আসেন। অনেক ভোজ্য দ্রব্যাদিও আসিতে দেখা গেল। আশ্রমে অনেক লোক আহার করে। একজন 'সেবক' আছেন তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশীয় ত্রৈলঙ্গী বলিয়া বোধ হইল, তিনিও সন্ন্যাসী সাধু নাম রাড্ডুমলজী। ক্ষুধা পাইলে সাধু জঙ্গল হইতে "আরে অন্নপাণি লায়" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। প্রাতে একবার ভোজ্য পাঠাইতে হয় আর যখন ইচ্ছা ডাকিলে পাঠান হয়। অনেকগুলি কলসী জলপূর্ণ করা থাকে তাঁহার ইচ্ছা মত ব্যবহার করেন। আশ্রম মধ্যে একটী পাকা ইঁদারা আছে তাহার জল অতি উত্তম বোধ হইল। এই স্থানটীতে তখন অধিক শীত বা অধিক গ্রীষ্ম বোধ না হওয়ায় অতিশয় আরাম বোধ হইতে লাগিল। বনমধ্যে পাখী সকল এবং ময়ূর দেখা গেল।

আমারা স্নানাহার এবং বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সাধুজীকে দেখিতে গেলাম। তখন আরও কতকগুলি নরনারী তাঁহাকে দেখিবার জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া একস্থানে বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন সাধু সেভা

স্বরূপ ছিলেন দেখা গেল। আমরা প্রথমে সাধুজীকে একটী কুটীরে শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমার সঙ্গী সাধু কিছু পশ্চাতে ছিলেন। আমি যেমন একটু অগ্রসর হইয়া নিকটে গিয়াছি, অমনি "কো হ্যায় রে, কো হ্যায় রে" বলিতে বলিতে যষ্টী লইয়া মারিতে আসিলেন, আমরা সটান প্রস্থান করিয়া আশ্রমে আসিয়া রক্ষা পাইলাম। পরে অপরদিকে দর্শকদিগের নিকট কি একটা গোলযোগ হইতে লাগিল। শুনিলাম, সেই যাত্রিদলের নেতা সাধুকে মারিতে গিয়া ছিলেন, তখন তিনি বলেন "মারো মহারাজ, এবি আপ্‌কাই অঙ্গ হ্যায়" ইহা শুনিয়া একেবারে অনেক দূর জঙ্গল মধ্যে চলিয়া গেলেন। আমরা আশ্রমে আসিয়া তাঁহার বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। তারপর দেখি আশ্রমের ভিতর আর এক উলঙ্গ সাধু রহিয়াছেন। তাঁহার ভাব স্বভাব মহাত্মাজী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইঁহার বয়স বোধ হয় ত্রিশের বেশী নয়, দেহখানি বেশ সুস্থ সবল, কান্তি শ্রীও মন্দনয়, কিন্তু তিনি মৌনী। নিতান্ত শান্ত শিষ্টভাব। আপন মনেই কখন হাস্য করেন কখন গাম্ভীর্য্যভাবে যা'তা' একটা কাজ লইয়া থাকেন। ডাকিয়া আহারীয় দিলে খান নচেৎ পড়িয়াই থাকেন। রাত্রিতে একখানি বালাপোষ দেওয়া হয়, কখন গায়ে দেন কখন তাহা যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকে। শুনিলাম প্রায় দুই বৎসর কাল তিনি এই আশ্রমে আছেন।

রাত্রিকালে আশ্রমে অনেক লোক থাকিতে দেখিলাম। সকলেরই আহার হইল। আমার সঙ্গী সাধুর সহিত রাড্ডুমলজীর কিছু তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল।

৪ঠা অগ্রহায়ণ। আমার সঙ্গী সাধুজী আমাকে অতি প্রত্যূষে ডাকিয়া বলিতেছেন, "চলিয়ে মহারাজ!" অর্থাৎ তিনি আজই এখান হইতে চলিয়া যাইতে চাহেন কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল এতদূরে আসিলাম, সাধুর ভাবতো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না এখনই চলিয়া যাইব? কেমন অতৃপ্ত, অনিচ্ছার ভাব মনে হওয়ায় বলিলাম, মহারাজ! হামারা আবি যানেকো ইচ্ছা নেহি হোতা। সাধু বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছি বাৎ হ্যায়, ইয়া সাধুকী মৌউজ্ হ্যায়, আপ্ রহিয়ে ম্যায়নে, চলোঙ্গে।" প্রাতে আমি তাঁহাকে কতকদূর অগ্রসর করিয়া কিঞ্চিৎ ট্রেণ-ভাড়া দিয়া বিদায় লইলাম, তিনি আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। আশ্রমে আসিয়া রাড্ডুমলজীকে সম্মুখে পাইলাম, তিনি আমাকে দেখিয়া

বলিলেন, "তুম্ কুছ্ দিনা হিঁয়া রহো, ও মহারাজ আবি চঞ্চল হ্যায়।" আমি তখন একটু কাতর ভাবে তাঁহাকে বলিলাম, মহারাজ! আপ্‌কা কৃপা বেগর এ মহারাজকো মহিমা হাম্‌সে বুঝনে সক্তা নেহি; আপ্ বাতায়ে উন্‌কো ক্যা স্বভাব হ্যায়। তাহাতে রাড্ডুমলজী বলিলেন, "রহো রহো উন্‌কো লীলা দেখো! উন্‌নে বালক স্বভাব হ্যায়, যব্ য্যায়সা মউজ (ইচ্ছা) ত্যায়সা করতা হয়।" আমি এই দিন এখানে থাকিয়া একবার জঙ্গলের দূর পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিলাম, যতই যাই ততই যাইতে ইচ্ছা হয়। পাখী সকল নির্ভয়ে সানন্দে ডাকিতেছে, হরিণও ২।১টী দেখিলাম। পিপীলিকা এবং পাখী সকলের জন্য প্রাতে জঙ্গলের কতক দূর পর্য্যন্ত আটা, চিনি, শস্য ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

আশ্রমে যখন যাহা যেমন আসে সেই মতই খাদ্য প্রস্তুত হয়, বিশেষতঃ এ প্রদেশের লোকে সাধারণতঃ খুব মোটা খায় কিন্তু আমি বাঙালী, এজন্য রাড্ডুমলজী আমার আহারের একটু বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বোধ হইল, অর্থাৎ গমের আটার রুটী পাইয়াছিলাম। এইরূপে সামান্য সামান্য বিষয়েও ভগবানের করুণা দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। পরন্তু এই বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া তখন যাহা বুঝি নাই এখন তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।

ঐদিন রাড্ডুমলজী আমাকে একটী টাকা দিয়া বলিলেন "ইস্‌কো রাখো, তুমারা আস্তে আয়া হ্যায়।" আমি এই সন্ন্যাসীর অযাচিত দানের জন্য অবাক হইয়া গেলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মহাত্মার কোন প্রসন্ন ভাব লাভ করিতে পারিলাম না। এদিনও অপরাহ্নে একবার শুনিলাম জঙ্গলের মধ্য হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "রাড্ডুমলজী, রাড্ডুমলজী, পত্তি তোড়।" অর্থাৎ ইক্ষু ক্ষেত্রে পাতা ভাঙ্গিতে বলিতেছেন। তাঁহার সকল কথার উত্তরে রাড্ডুমলজী বলিতেন, "সত্য বচন মহারাজ।" পাতা ভাঙ্গার কারণ কি, আমি রাড্ডুমলজীকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "বোধ হয় শীঘ্র অনেক লোক আসিবে, গো মহিষের আহার আবশ্যক হইবে তাই একার্য্য করিতে বলিলেন, উঁহার কোন কথা অর্থ হীন হয় না।" কিছুক্ষণ পরে যখন তিনি একটা ইক্ষুক্ষেত্রের নিকট বসিয়া তাহার শুষ্ক পত্র ভাঙ্গাইতে লাগিলেন, তখন আমি একটু দূর হইতে তাঁহাকে দেখিলাম, তখন মূর্ত্তি বেশ প্রশান্ত বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু আর কোন কথাই শোনা গেল না, কেবল মধ্যে মধ্যে "আউর তোড়, আউর তোড়" বলিয়াছিলেন। প্রায় সন্ধ্যা

পর্য্যন্ত এই কার্য্য হইল আমি কিছু আগেই চলিয়া আসিলাম। রাত্রি শেষে নিদ্রাভঙ্গের পর, স্থির ভাবে সাধুর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মনে এই ভাব হইল, উনি আমাদের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা লৌকিকভাবে কত মিথ্যার সঙ্গে মিশিয়া আছি; উনি সর্ব্বতোভাবে সঙ্গ রহিত। কোন মনুষ্য, জীব বা বিষয় হইতে ভয় প্রাপ্ত হন না, উহাঁকে বুঝা আমাদের এ বুদ্ধির ঠিক সাধ্য বিষয় নহে। এরূপ একটী অলৌকিক উজ্জ্বল চরিত্রের আদর্শ আমার মনে প্রকাশিত হইয়া, মনের বিষাদ ভাব চলিয়া গেল এবং অত্যন্ত আনন্দ হইল। ইহাতে বুঝিলাম এক্ষণে আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, এতদাপেক্ষা অধিক চেষ্টার এ সময় নয়।

৫ই অগ্রহায়ণ—প্রাতে উঠিয়া বাড্ড্‌মলজীকে জানাইলাম অদ্যই আমি যাইব। তিনি বলিলেন, "আউর নেহি রহোগে? আচ্ছা! থোড়া ভোজন কর্‌কে চলো।" ঠিক যেন দেশীভাব। আমি স্নান করিয়া কিছু আহার করিলাম। সাধুজীকে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বাদৌচি-আশ্রম হইতে যাত্রা করিলাম। একব্যক্তি আমাকে কতক দূর রাখিয়া গেল, আমি তাহাকে বিদায় দিয়া একাই ষ্টেশনে বেলা ১১টার পর আসিলাম। তারপর একটু বিশ্রাম করিয়া ট্রেণের সময় হইলে, আমি লুধিয়ানার টিকিট করিয়া ট্রেণে উঠিলাম। (ক্রমশঃ)

প্রহেলিকা।

মরিয়া তবু অমর হয় কেবা?
পরের লাগি' পরাণ দেয় যেবা।
কাঁদিয়া ফিরে' কাঁদিতে চায় কে?
পিরীতি-রীতি যেবা জানিয়াছে।
হারিয়া তবু জয়ের যশ কার?
প্রণয় মাঝে বিনয় আছে যার।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

কুশদহ। (৯)

সারদাপ্রসন্ন বাবুর দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণগ্রামের সহিত, গুণগ্রাহিতা এবং সঙ্গীত বিদ্যার প্রতিও বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। বিখ্যাত মহাম্মদ খাঁ সেতার এবং বীণ্ (বীণা) বাদনে যেমন উৎকৃষ্ট ছিলেন, তদ্রূপ তারাপ্রসাদ রায় মহাশয় পাখওয়াজ (মৃদঙ্গ) বাদ্যে সুনিপুণ ছিলেন। ইহাঁরা সারদাপ্রসন্ন বাবুর নিকট বরাবর সম্মান ও বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাবু (সেজবাবু) বাল্যকালে মহাম্মদ খাঁ সাহেবের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন।

সারদাপ্রসন্ন বাবুর সংসারে হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক স্বসম্পর্কীয় এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি লেখাপড়ায় তেমন শিক্ষিত ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি ছিল। তিনি অনেক গান রচনা করিয়া তাৎকালিক গ্রাম্যঘটনার আন্দোলন করিতেন। তখন ব্যক্তিবিশেষের নামে বা কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছড়া ও গান বাঁধিয়া প্রকাশ করা একটা প্রথা ছিল।

বাবুপাড়া—স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বাবুর সময় হইতেই তাঁহার জামাতাগণ ও অন্যান্য আত্মীয়দিগের বসবাসে জমিদার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী পল্লী হইয়াছে, তাহাকে সাধারণে 'বাবুপাড়া' বলিয়া থাকে। কালীপ্রসন্ন বাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্যান্য গুণগ্রামের সহিত, এমারতী কার্য্যে তাঁহার (Engeneering Head) স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। তাঁহার নিজ বাটীর নির্ম্মাণকার্য্যে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে; সচরাচর যে সকল স্থানে কাষ্ঠের ব্যবহার করা হয়, তিনি সেখানে খিলান দ্বারা সে কার্য্য সৌষ্ঠব করিতেন। আমরা পুরাতন রাজমিস্ত্রীদিগের মুখে এ বিষয় অনেক কথা শুনিয়াছি। স্বর্গীয় হরিশ বাবুর পুত্র নগেন্দ্রনাথও বহুগুণের আধার সজ্জন, সুশীল হইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি অল্প বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

স্বর্গীয় হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইনি কালীপ্রসন্ন বাবুর ভাগিনেয় অর্থাৎ সারদাপ্রসন্ন বাবুর পিতৃষস্রীয় (পিস্তুত ভাই) ছিলেন। ইহার সরল অমায়িকতার বিষয় উল্লেখ যোগ্য। সাধারণের প্রতি তাঁহার স্নেহ, সহানুভূতি চির দিন অক্ষুণ্ণ ছিল। কিছু কাল তিনি চিনির কারখানা করিয়া কাজ কর্ম্মের ভিতর দিয়া সর্ব্বসাধারণের সেই শ্রদ্ধা ভক্তি আরও আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র বর্ত্তমান

বিহারীলালও পিতৃ ভাবের অধিকারী হইয়াছেন। তৎকনিষ্ঠ সুশিক্ষিত বাবু কিশোরীলালের জীবনে ইতিমধ্যেই যে বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে,—তাঁহার প্রাণে ভগবান্ যে জনহিতৈষণার ভাব (Public spirit) দিয়াছেন তাহা তিনি দেশের সেবায় নিয়োগ করুন ইহাই আমাদের প্রাণের কামনা।

গোবরডাঙ্গার দেওয়ানজী বংশ—জলেশ্বরের সন্নিহিত চণ্ডীগড় নামক স্থানে গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাস ছিল। তিনি নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক ও স্বাধীন-চেতা ব্যক্তি ছিলেন। নানা কারণে তাহার চণ্ডীগড়ে বাসের অনিচ্ছা হওয়ার পর, স্বর্গীয় খেলারাম মুখোপাধ্যায় যখন সেরেস্তদারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও গোবরডাঙ্গার জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন তৎকালে কোন সূত্রে খেলারাম মুখোপাধ্যায়ের সহিত গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় হয়, তৎপরে তাহারই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া গোকুলচন্দ্র আত্মীয় স্বজনের সহিত গোবরডাঙ্গা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই হইতে গোবরডাঙ্গায় চাটুয্যে পাড়ার আরম্ভ।

গোকুলচন্দ্রের তিন পুত্র তারাচাঁদ, জয়নারায়ণ, শিবনারায়ণ। সর্ব্ব কনিষ্ঠ বলিয়া শিবনারায়ণকে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হয়। তিনি কলিকাতায় তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টে ওকালতি করিয়া বহু অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার সৎকার্য্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি হাবড়া ও গোবরডাঙ্গার মধ্যবর্ত্তী কয়েক মাইল রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দেন, অদ্যাপি তাহা "শিবনারায়ণ চাটুয্যের রাস্তা" বলিয়া উল্লিখিত হয়। তৎপুত্র চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পিতৃপদ অনুসরণ করিয়া ২৪ পরগণা-কোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করিয়া, শেষ সরকারি উকিল নিযুক্ত হইয়া বিশেষ সম্মান ও খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ভবানীপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন এবং ঈশ্বরকৃপায় বহু পুত্র পৌত্রে ও ধনে, মানে পরিবেষ্টিত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। ভবানীপুরে তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন। তাঁহার জনৈক পৌত্র বাবু নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সপরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ বিলাসিতা এবং অসদৃষ্টান্তের পথ হইতে নীরব শান্ত জীবনে, সুখে দুঃখে ভগবানের চরণাশ্রয় করিয়াছেন। 'চন্দ্রনাথ চাটুয্যের লেন' নামে ভবানীপুর মিউনিসিপালিটীর একটী সদর রাস্তা তাঁহার স্মরণার্থে বিদ্যমান রহিয়াছে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র তারাচাঁদ, খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জমিদারী প্রতিষ্ঠায়

অনেক সহায়তা করিয়া উক্ত জমিদারীর দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। এই হইতে চাটুয্যে বংশে দেওয়ানজী নাম উল্লিখিত হইয়া আসিয়াছে।

তারাচাঁদের অন্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন চট্টোপাধ্যায় ঐ পদে নিযুক্ত হন। তখনকার জমিদারী কার্য্যে নিযুক্ত লোকে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন কিন্তু রাধামোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ধার্ম্মিক ও দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বাক্সে একটী মাত্র টাকা পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা দেখিয়া জমিদার কালীপ্রসন্ন বাবু চিরুলিয়া পরগণায় তাঁহার বৃত্তির জন্য অনেক ভূমি দান করেন। কিন্তু রাধামোহন এমন ধার্ম্মিক ও ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন যে, ঐ ব্রহ্মোত্তর ভূমি তাঁহার অপর ভ্রাতাকেও অংশ দিয়াছিলেন।

রাধামোহনের কনিষ্ঠ রাধানাথ. চন্দ্রনাথের সমধ্যায়ী ছিলেন। তিনিও কলিকাতায় আসিয়া ওকালতি পরীক্ষা দেন, কিন্তু পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া সরকার হইতে মুন্সেফ পদে নিযুক্ত হন। রাধানাথ বাবু অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সুন্দর পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে, ঐ সময় একদা গোবরডাঙ্গার ধনাঢ্য উমাচরণ দত্তের বাড়ী ডাকাতি পড়ে। তিনি রাত্রিকালে ডাকাতদিগের "রে রে রে রে হৈ" শব্দ শুনিয়া একগাছি 'রুল' মাত্র হস্তে লইয়া তৎসন্নিধানে উপস্থিত হন। ডাকাতদিগের কাহাকে কাহাকে চিনিতে পারিয়া বলেন "বেটারা আমার প্রজা হয়ে আমার গ্রামে ডাকাতি করতে এসেছিস?" কিন্তু তখন, তাহারা উন্মত্তপ্রায়, সুতরাং তাহাদের একজন মুনসেফ বাবুর হাতে সড়কি বিদ্ধ করিয়া বলে "স'র ঠাকুর এখন।" তিনি আহত হস্তে রাস্তায় আসিয়া দেখিলেন জমিদার বাড়ী হইতে 'বক্তার' নামক হাতী সহ অনেক লোক ও লাঠিয়ালগণ আসিয়া উপস্থিত। তাহাতে ডাকাতরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

রাধামোহনের মৃত্যুর পর রাধানাথ মুন্সেফ-পদ পরিত্যাগ করিয়া ঐ দেওয়ানি পদ গ্রহণ করেন। তখন হয়দারপুরের প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদার হবিবল হোসেন অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত জমিদার ছিলেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর সহিত তখন হবিবলের ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল। এই বিবাদ বিসম্বাদ সম্বন্ধে অনেক কথা কিম্বদন্তী আছে, আদালতে সাক্ষ্য দিবার ভয়ে দেশের নিরীহ ভদ্রলোক অনেকেই স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক রাধানাথের অন্তে তৎপুত্র যোগেন্দ্র-

নাথও দীর্ঘজীবী হন নাই। পুনরায় রাধামোহনের উপযুক্ত পুত্র রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায় ঐ দেওয়ানী পদে দীর্ঘকাল সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ পরলোকগমন করিয়াছেন (এই সংবাদ অগ্রহায়ণ সংখ্যার কুশদহতে উল্লিখিত হইয়াছিল।) তৎকনিষ্ঠ সহোদর সদাশয় কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় প্রথমে সবডেপুটীর কর্ম্ম করিয়া, পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করেন। তৎপরে বসিরহাট মহকুমায় ওকালতী কার্য্যে এ পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকিয়া চরিত্রগুণে সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন এবং যশস্বী হইয়াছেন। তৎপুত্রও পিতৃপদানুসরণের আয়োজন করিতেছেন। কুঞ্জ বাবুর অবসর প্রাপ্ত জীবনে নিজ জন্মভূমির প্রতি তাঁহার যে কর্ত্তব্য আছে তাহা সাধনে তৎপর দেখিতে দেশের সরল সহৃদয় ব্যক্তিগণ আশা করিতেছেন।

স্বর্গীয় রাসবিহারী বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু বিজয়বিহারী বি, এ পাশ করিয়া সবডেপুটী ও অন্যান্য সরকারী কার্য্য করেন। এক সময় তিনি দেশহিতৈষণার ভাবে কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি National Echo (ন্যাসান্যাল একো) ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার করিয়া, প্রায় দুই বৎসর কাল সৎসাহসের সহিত তাহার সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ইহাতে তাঁহাকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তৎপরে তিনি ওকালতি পরীক্ষা দিয়া বর্ত্তমানে হাইকোর্টে এবং ছোট আদালতে ওকালতি করিতেছেন।

জয়নারায়ণের তিনপুত্র হরমোহন, কালীমোহন, উত্তমচন্দ্র। হরমোহন নড়ালের বিখ্যাত জমীদার রতন রায়ের সময়ের লোক, তিনি তাঁহার জমীদারীর নায়েবী পদে নিযুক্ত থাকিয়া "কঞ্চিমারা নায়েব" বলিয়া খ্যাত ছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁহার কাছারী বাড়িতে অন্নদান অবারিত ছিল। দেওয়ানজী বাড়িতে দুর্গোৎসব তাঁহারই দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

তৎপুত্র স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র বা পুরন্দার চট্টোপাধ্যায় বারমাস বাড়ী থাকিয়া বিষয় কর্ম্ম দেখিতেন, এবং তৎসঙ্গে প্রতিবাসীর বিপদাপদে সাহায্য এবং রোগীর সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করা, তাঁহার জীবনের বিশেষ কাজ ছিল। তিনিও তেমন দীর্ঘজীবি হন নাই। উত্তমচন্দ্র প্রথমে বাদুড়িয়া সবরেজেষ্টারির কার্য্য করেন, তৎপরে স্থানীয় জমিদার বাড়ীতে 'জায়নিশি' পদে নিযুক্ত ছিলেন।

কালীমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজরাজ চট্টোপাধ্যায় প্রথমে দীর্ঘকাল সুবিখ্যাত

রামগোপাল ঘোষের কার্য্যে অংশীদার ছিলেন, শেষ জীবনে তিনি প্রায় বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জ্ঞান চর্চ্চায় জীবন কাটাইয়াছিলেন। তৎপুত্র বর্ত্তমান যতীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বড় দুষ্ট ছেলে ছিলেন, যৌবনের প্রারম্ভেই মাত্র ১৫৲ টাকা সম্বল লইয়া বাড়ি হইতে একাকী কলিকাতায় আসিয়া স্বাবলম্বীর পথানুসরণ করেন। নিজ চেষ্টায় অবিশ্রান্ত দুঃখ কষ্টকে তুচ্ছ করিয়া উদ্ভিদ্ তত্ত্বের সাক্ষাৎ ব্যবহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয় কি এক দৈব প্রতিভাবলে আজ পঞ্চাশ সহস্রাধিক মুদ্রার বিষয় সম্পত্তি করিয়া স্বাধীন-জীবন যাপন করিতেছেন। তিনি বর্ত্তমান শিক্ষিত যুবক শ্রেণীর যাহারা দাসত্ব বা চাকুরীর জন্য লালায়িত হইয়া জীবনের সকল উদ্যম ও স্বাধীনবৃত্তি নষ্ট করাকে পছন্দ করেন না, এমন কতকগুলিকে বিনা বেতনে কার্য্যকরী উদ্ভিদ্ তত্ত্বের শিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন। (তাহার বিবরণ 'কুশদহ'র সংবাদ স্তম্ভে দ্রষ্টব্য।) যতীন্দ্রনাথের সন্তানাদি হয় নাই, ঈশ্বর যাহা করেন, মঙ্গলের জন্য। এক্ষণে তাঁহার অর্থ, সামর্থ্য দেশের সেবায় নিযুক্ত করিতে দেখিলে দেশ যে আনন্দিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

স্বর্গীয় কালীমোহনের তৃতীয় পুত্র স্বর্গীয় চন্দ্রভূষণও প্রৌঢ়াবস্থার প্রারম্ভেই পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শিক্ষা বিভাগে প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করিয়া, সর্ব্বত্রই চরিত্রগুণে সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

(সম্পাদক কর্ত্তৃক সংগৃহিত।)

এ অভদ্রতা কেন?

বর্ত্তমানে, লেখাপড়া জানা যে সকল বঙ্গীয় যুবকগণের চরিত্রে ভদ্রতা, সভ্যতা,—সংযত বাক্যাদির অত্যন্ত অভাব দেখা যায় তাহার কারণ কি? অল্পক্ষণের জন্য রেলগাড়িতে যাইতে এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে যে, কোন যুবকের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে সময় কাটান গেল। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অধিকাংশ দিনে এইরূপই ঘটে যে, তাহাদের অসার চিৎকার, কুরুচিপূর্ণ সমালোচনাতে কর্ণ বধির হয়।

সম্প্রতি বিরাতী ষ্টেশনমাষ্টারকে, কতকগুলি ভদ্রলোক 'মামা' বলিয়া ব্যঙ্গ করায় কত গণ্ডগোল হইয়া গিয়াছে—এমন কি, ষ্টেশনে পুলিশ মোতাএন

করিতে হইয়াছিল এবং তজ্জন্য কয়েক জনের বারাশাত কোর্টে জরিমানা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, একথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। তাই আমরা বলি এ অভদ্রতা করা কেন?—আমাদের বিশ্বাস বিস্তৃত বঙ্গের যুবকগণের চরিত্রে যে এমন চপলতা—অশ্লীলতা ঘটিতেছে, ইহার অন্যান্য কারণ সত্বেও একটী প্রধান কারণ বারাঙ্গনা সংশ্লিষ্ট থিয়েটার। যিনি যতই যুক্তি দেখান, যতই তর্ক করুন না কেন, যাঁহারা চরিত্র বলিয়া একটা জিনিষের আদর বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কখনই ঐরূপ থিয়েটারের পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন না। যাহারা তরল মতি তাহারা যে থিয়েটার দেখিয়া ভিতরে ভিতরে শিথিল চরিত্র হইয়া যায় তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। যে ক্ষেত্রে পাপের প্রতি ঘৃণা নাই, যাহাদের হইতে মানুষ দূরে থাকিবে, কিন্তু তাহাদের কার্য্যকে ভদ্র সমাজে ভদ্র লোকের সঙ্গে, এখন তো শত শত স্ত্রী পরিবারের সমক্ষে পর্য্যন্ত, সুসাজে সাজাইয়া তাহাদের গুণ গরিমা দেখান হইতেছে; ইহাতে কি বুঝায়? বলত, ইহা কোন্ উচ্চ নীতির পরিচয়? আমরা একান্ত মর্ম্মাহত হই যে যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের সেবক—যাঁহাদের নাম সাহিত্যিক শ্রেণীভুক্ত, যাঁহারা সংবাদ পত্রের সম্পাদক, তেমন ব্যক্তিরও কেহ কেহ এই 'বিষময়' বিষয়ের পক্ষ সমর্থক। তাঁহাদের যে কি চমৎকার 'মত' তাহা তো আমরা বুঝিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন, যাহারা খারাপ হইবে তাহারা থিয়েটার না থাকিলেও খারাপ হইবেই। এই কি যুক্তি? থিয়েটার না থাকিলেও হইবে, তবে দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া, স্বার্থ সাধন করিতে বিরত থাকা যায় কেন? এই কি যুক্তি নাকি? অভিনয়ের আমরা কোন দিন বিরোধী নহি এ সংসার ভগবানের অভিনয় ক্ষেত্র। ধর্ম্মাভিনয় অতি উচ্চ-মহৎ-কঠিন কার্য্য; পবিত্র আমোদ সময় সময় মানব সমাজের প্রয়োজনীয় কিন্তু অপবিত্র সংশ্লিষ্ট, পাপের প্রশ্রয়দান চিরদিন বর্জ্জনীয়। ভদ্র বালক-যুবকগণের দ্বারা স্ত্রীলোকের অভিনয় হইলে বিশেষ অনিষ্ট না হইতেও পারে। বারাঙ্গনা সংসৃষ্ট থিয়েটারে দেশের নীতি চরিত্র উৎসন্ন যাইতেছে, তথাপি লোকের চৈতন্য নাই।

স্থানীয় সংবাদ।

মৃত্যু।—সম্প্রতি খাঁটুরা নিবাসী ডাক্তার হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি সজ্জন, বিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। খাঁটুরা গ্রামে অনেকের গৃহ চিকিৎসক ছিলেন এবং প্রতিবাসীর অনেক উপকার করিয়াছেন। ভগবান্ ইহার আত্মার মঙ্গল করুন।

অবৈতনিক শিক্ষা।—গোবরডাঙ্গার দেওয়ানজী বাটীর মিঃ জে,চাটার্জি,ভূতপূর্ব্ব দ্বারভাঙ্গা মহারাজের গার্ডেন সুপারিটেণ্ডেট, এক্ষণে কলিকাতা (শ্যামবাজার) ১৮৮নং অপার সারকুলার রোডে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি দেশের হিতার্থে কতকগুলি ছাত্রকে বিনাবেতনে 'ইকনমি বটানি' (আয়কর উদ্ভিদ্ তত্ত্বের) শিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন। শিক্ষার্থীগণ সচেষ্ট হউন। পত্র লেখালেখি দ্বারাও কার্য্য হইতে পারে।

দান।—স্বর্গীয় সপ্তম এড্ওয়ার্ডের স্মৃতিরক্ষা ফণ্ডে জমিদার রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ২৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।—যদিও দাতার নাম প্রকাশে তাঁহার সবিশেষ আপত্তি আছে, তথাপি এ কথা উল্লেখ না করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত অকৃজ্ঞতার বিষয় মনে করিয়া আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত মাসে প্রকাশকের শারীরিক অসুস্থতাদি নিবন্ধন ও অর্থাভাবে 'কুশদহ' বাহির করিতে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া কোন সহৃদয় ব্যক্তি দয়া পরবশ হইয়া কুশদহর মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে ২০৲ কুড়ি টাকা সাহায্য করিয়াছেন। আমরা তজ্জন্য আর অধিক কি বলিব, ভগবান্ দাতার হৃদয়-কমল আরও বিকশিত করুন।

Printed by J, N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.

সূচী ও নিয়মাবলী [illegible]

দ্বিতীয় বর্ষ] আশ্বিন, ১৩১৭। [১২শ সংখ্যা।



খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়

সম্বলিত, ধর্ম্ম, সমাজ ও

বিবিধ বিষয়ক

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

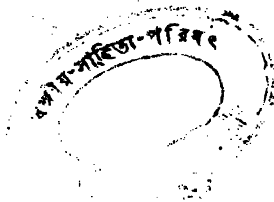
দাস যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু সম্পাদিত।

কুশদহ-কার্য্যালয়

২৮।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা অগ্রিম ১৷৹ মাত্র। প্রতি সংখ্যা /১০ পয়সা,

৴১০ টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান যায়।



বর্ষ শেষ।

ভগবানের করুণায় "কুশদহ" পত্রের আর একটি বৎসর পূর্ণ হইল। কার্য্য ক্ষেত্রে যখনই বাধা বিঘ্নে পড়িয়াছি, তখনই তাহা হইতে একমাত্র তাঁহার কৃপাতেই উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমার আর কোন সম্বল নাই, কেবল একবিন্দু 'বিশ্বাস' মাত্র সম্বল; এ বিশ্বাসও তাঁহারই দেওয়া, এ কাজে তিনিই আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, সুতরাং বাধাবিঘ্নের সময় এই মনে হইয়াছে যে, তিনিই ইহার উপায় করিবেন। এ বিশ্বাস কোন দিন আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। তবে, তাঁহার করুণা ও বিশ্বাস যে যন্ত্রের ভিতর দিয়া কাজ করিয়াছে সে যন্ত্র অপূর্ণ; তাহার ত্রুটি দুর্ব্বলতায় কাজে অনেক ত্রুটি ঘটিয়াছে। এ কাজে বিধাতার আর যাহাই অভিপ্রায় থাকুক, ইহা দ্বারা প্রথমতঃ আমাকে জ্ঞান-শিক্ষা দেওয়া যে তাঁহার অভিপ্রায় তাহা তাঁহারই কৃপায় অগ্রেই বুঝিয়াছি। তিনি আমাকে এই উপলক্ষে সত্যের দিকে, জ্ঞানের দিকে লইয়া যাইতেছেন।

যাঁহারা একাজে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত যেমন আমার হৃদয়ের যোগ অনুভব করিতেছি, আবার যাঁহারা প্রায় সারা বৎসর কাগজ লইয়া ভিঃপিঃ ফেরত দিয়াছেন, তাঁহারাও তেমনি আমার শিক্ষাদাতা। ভগবান সকলেরই মঙ্গল করুন এবং আগামী বর্ষের কাজের জন্য আমাকে নববল দান করুন।

দাস—

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

অদ্ভুত রুচি।—প্রধানতঃ দুই তিন খানি বাঙালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের অদ্ভুত রুচি আমরা নিয়তই দেখিয়া আসিতেছি; প্রায়ই তাহাতে দেশের প্রধান ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে নানাপ্রকার ব্যঙ্গোক্তি মূলক কদর্য্য ছবি সকল প্রকাশিত করিয়া জঘন্যভাবে উপহাস করা হয়। তাহার পাঠকগণও তাহাতে বড়ই আমোদ উপভোগ

করেন। কিন্তু ঐ সকল কুরুচি পূর্ণ ব্যাঙ্গোক্তি পাঠ করিয়া দেশের প্রধান ব্যক্তিগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলে যে কি অপরাধ ঘটে, জাতিয় ভাব সম্বন্ধে কি ক্ষতি হয়, তাহা তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশে বিচার করিয়া দেখেন না। সম্পাদকগণ মনে করেন যেন তাঁহারা ঐ সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া কত ভাল কাজই করিতেছেন! সম্প্রতি একখানি ঐ শ্রেণীর কাগজে দেশের শ্রদ্ধাস্পদ কোন ব্যক্তিকে "আবহাওয়ার কুঁকড়ো কবি" বলিয়া একখানি ছবি বাহির করা হইয়াছে। দেশের মনস্বীগণ ঐ সকল কাগজের রুচি সম্বন্ধে কি মনে করেন, তাহা ঐ "রসময়" সম্পাদকগণ একবারও ভাবিয়া দেখেন না, দেখিলে লজ্জিত হইতেন। বিদেশীগণ আমাদের ভাব দেখিয়া আমাদের মহত্ত্ব কত তাহা বেশ বুঝিতে পারেন। ঐ সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ মনে করেন ঐরূপে সমাজের খুব শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁহাদের চক্ষের সাম্‌নে আরো যে সকল ভদ্র সংবাদপত্রগুলি রহিয়াছে, তাঁহারা কি দেশের লোকের অন্যায় অবিবেচনার প্রতিবাদ করেন না? কই তাঁহারা ত কখন পঞ্চানন্দ কিম্বা ষড়ানন্দ, গাধা, ভেড়া, লাঙ্গুল মূর্ত্তিতে (কি লজ্জার বিষয়) কাগজের কলেবর কলঙ্কিত করিয়া এমন অদ্ভূত রুচির পরিচয় দেন না? ইহা দেখিয়াও কি প্রথমোক্ত সম্পাদক মহাশয়গণের লজ্জা হয় না? আমরা কোন কোন বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ঐ সকল বিষয় ভাল ভাল কাগজে প্রতিবাদ করেন না কেন? তাহাতে তাঁহারা বলেন "ও জিনিষে কি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে আছে?"

থিয়েটার প্রচারের নূতন পন্থা।—এ পর্য্যন্ত বারাঙ্গনা সংশ্লিষ্ট থিয়েটারগুলি দেশের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি আর এক অভিনব পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। থিয়েটার হইতে দুইখানি মাসিকপত্র বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে অভিনেত্রীদিগের ছবি দেওয়া হইয়াছে; আমরা এই কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়াছি। ইহার উদ্দেশ্য কি? এতদিন সুদূর পল্লীর যাহারা ঐরূপ বিষময় থিয়েটারের বিষয় মনে স্থান দিবার তত অবকাশ পায় নাই, এখন এই মাসিকপত্রের প্রসাদে ঘরে বসিয়া তাহারা অভিনেত্রীদিগের রূপে গুণে মুগ্ধ হইবে। এবং কলিকাতায় আসিয়া সর্ব্বাগ্রে ঐ পুণ্য তীর্থ দর্শন করিয়া হৃদয়

মন এবং অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। আর সহরের ত কথাই নাই দেশহিতৈষী সম্পাদকগণের এ বিষয়ে নীরব থাকা উচিত নহে।

রুচি।—যে সকল সম্পাদক, কবি, এবং লেখকগণ চিরদিন বারাঙ্গনা সংশ্লিষ্ট থিয়েটারের যশোগান কণ্ঠ নিযুক্ত রাখিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে "বিদ্যাবিনোদ" প্রভৃতি উপাধিধারী পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত আছেন। আমরা বুঝিতে পারি না যে, তাঁহারা কি সূত্রে ঐ সকল থিয়েটারের ভক্ত এবং পক্ষপাতী হইলেন। বারাঙ্গনা থিয়েটার দেখাই যে কত লোকের অধঃপতনের কারণ, এ কথা কি তাঁহারা অবগত নহেন? যাঁহারা বাহিরে এত গণ্যমান্য, তাঁহারা ঐরূপ বিষয়ের সহিত কোন্ রুচিপ্রবৃত্তি অনুসারে মিশেন ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অথবা এই কথাই মনে হয়, তুমি জ্ঞানী, পণ্ডিত, কবি প্রভৃতি বহুগুণের আধার হইয়াও "লবণ শূন্য ব্যঞ্জনের" ন্যায় হইতে পার। থিয়েটার দ্বারা দেশের যে মহা অনিষ্ট হইতেছে তাহা কি তাঁহারা কিছুতেই বুঝিবেন না?

বিদ্বেষ প্রচার।—বিগত ২১ শে আশ্বিনের বসুমতী পত্রে "দায়ে পড়ে বিয়ে" হেডিংএ একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহাতে পরিষ্কার ভাষায় ব্রাহ্মসমাজের নামে অতি কুৎসিত কল্পনা মূলক গল্প সাজাইয়া স্পষ্টরূপে বিদ্বেষ প্রকাশ করা হইয়াছে। সমাজের নিন্দা শুনিয়া সেই ধর্ম্মের প্রতিও লোকের আস্থা চলিয়া যায়। আমরা সহযোগীকে জিজ্ঞাসা করি উহার উদ্দেশ্য কি? ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা কুৎসা শুনিলে তাঁহাদের পাঠকগণ কি সুখী হন, তাই মাঝে মাঝে ওরূপ লেখা দুই একটা না দিলে চলে না? কিন্তু কোনও ব্যক্তি বা সমাজের অযথা নিন্দা করিলে যে নিজের অপরাধ ও জনসমাজের অনিষ্ট সাধন হয়, তাহা কি ভাবিয়া দেখেন না? সহযোগী মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষ পরমহংস রামকৃষ্ণের ধর্ম্মের কথা প্রচার করেন। তিনি কি জানেন না যে, তাঁহার ধর্ম্ম কত উদার ও বিশ্বজনীন। যাঁহারা এতবড় মহাত্মার ধর্ম্মের কথা বলেন, তাঁহারা অপর ধর্ম্মের বা সমাজের নিন্দা বিদ্বেষ প্রচারে লজ্জিত হন না? পরমহংস মহাশয়ের শ্রদ্ধের

সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ এ বিষয়ে লক্ষ্য করিলে ভাল হয়! আর যদি তাঁহারা এ বিষয়ে নির্ব্বাক থাকেন, তাহা হইলে ইহাই প্রকাশ পাইবে যে তাঁহারাও এই বিদ্বেষ প্রচারে আন্তরিক দুঃখিত নহেন।

এরূপ কুৎসিত ভাবে কোনও ধর্ম্ম সমাজকে সাধারণের চক্ষে হীন আদর্শে প্রতিভাত করিবার চেষ্টা করা কি প্রকার প্রবৃত্তির কাজ? জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ সকল বিষয়েই বিদ্বেষ, বিদ্বেষে বিদ্বেষে দেশটা ছারখার হইল তবু কি এদেশ হইতে এ ভাব দূর হইবে না?

দুর্গোৎসব।

আজ ২৩শে আশ্বিন, সপ্তমী পূজা। আজ প্রাণ কেন এমন করছে! কি এক ধর্ম্মোৎসাহ প্রাণে উদয় হচ্ছে! এ কি সংস্কারবশতঃ এমন হচ্ছে! কতকটা তা হতেও পারে। যে দেশে, যে মাটিতে জন্ম, আজন্ম দুর্গোৎসবের সংস্কার হাড়ে হাড়ে গাঁথা; ঢাকের বাজনা, লোকের ভিড়, বালক বালিকার সুবেশ—উৎফুল্ল মুখশ্রী, চারি দিকে জম্ জমাট ভাব, প্রাণে কি এক আনন্দের সমাচার আনিয়া দিচ্ছেছে। কিন্তু এ যে কেবলই সংস্কারের জন্য হচ্ছে তাহাও বোধ হয় না। এর ভিতর দিয়া কি যে এক আনন্দের ভাব প্রাণে আসিতেছে! কি এক সুখস্পর্শ যেন প্রাণে অনুভূত হইতেছে। সংস্কারবশতঃ কি আনন্দ হয় না? এমন কি, কত অসার বিষয়ের স্মরণেও তো আনন্দ হয়, কত অপবিত্র আমোদের জন্য বন্ধুসম্মিলনের কথা মনে হলেও ত কত শত লোকের আনন্দ বোধ হয়? ছিঃ ছিঃ সে আনন্দ-স্মৃতির সঙ্গে এ আনন্দের তুলনা করিতেও ঘৃণা হয়। এ যে কার আবির্ভাবের জন্য আনন্দ! যাঁর স্বরূপ ঠিক্ বলা যায় না, এ বুঝি তাঁর আবির্ভাবের আনন্দ। কে যেন আসছেন—কে যেন এসেছেন। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে মাতৃভাবে এ আবির্ভাব বটে। তিনি কি মা? পিতা নহেন? তা কেন, পিতাও বটে, বন্ধুও বটে, দয়ালও বটে, প্রভুও বটে, মাও বটে; কিন্তু আজ মাতৃভাবে দেখা দিবার দিন। বহুকাল হইতে আজকার দিনে অসংখ্য ভক্ত মা,, মা, বলে ডেকে ডেকে, মা রূপে দেখে দেখে, আজকার দিনে তিনি

পাকা মা হয়ে গেছেন। কিন্তু যারা তাঁহাকে মা বলতে একজন, পিতা বলতে আর একজন মনে করে তারা বড় কৃপাপাত্র। মুখে অনেকে বলতে পারেন "সকল ভাবেই সেই একজন"। বলা সহজ, ভাবের ঘরে ভাবা বড় কঠিন। ওখানে ভেদভাব থাকলে বাহিরে মানব-ব্যবহারে তা ধরা পড়ে। যিনি সকল ভাবে এককেই বুঝেছেন, এককেই দৃঢ় করে ধরেছেন, তিনি সকল মানুষকেও একভাবে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন।

আজই কি কেবল মার আসবার দিন! আর কোন দিন কি তিনি আসেন না? আসেন বৈকি। রোজ আসেন, সর্ব্বক্ষণ আসেন, আসেন আবার কি? যিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র বিগুমান "অন্তরীক্ষ নহে শূণ্য তাঁহার সত্তায় পূর্ণ" তাঁহার আবার আসা যাওয়া কি? তাঁর আসা যাওয়া নাই সত্য, কিন্তু উহাত জ্ঞানগত অনুমানের কথা, সে পাকা ভক্তি বিশ্বাস-চক্ষু আমাদের কই? সে চক্ষুর নিকট আসা যাওয়া নাই। কিন্তু কত সময় আমরা তাঁহাকে ডাকিলাম,তাঁর পূজা আরাধনা করিলাম, তবু হয়ত তাঁর দর্শনের নাম গন্ধও পাইলাম না; আবার কখন না ডাকিতে তিনি আসিয়া উপস্থিত, অর্থাৎ তাঁহার আবির্ভাবে হৃদয় পূর্ণ। আজকার দিন সেই দিন। আজ না ডাকিলেও তিনি আসেন। ভক্ত তাঁকে না ডাকিয়া থাকিতে পারেন না, কিন্তু তুমি ডা'ক আর না ডা'ক আজ তিনি আসিবেনই। ভক্তগণ জল জমাইয়া বরফ করে রেখে গেছেন। আজ তাঁর আবির্ভাবের জমাট ভাব এমন হয়ে আছে যে, তুমি যদি তাঁর ভাব নাও বোঝ, তবু তোমার প্রাণে আনন্দের ধাক্কা লাগিতেছে। এমনি এ দেশের মাটীর গুণ যে, সাধারণ মুসলমানগণ, যাহারা ঈশ্বরের মাতৃভাব সম্বন্ধে বলে "ক্যা, খোদা আওরাৎ (স্ত্রীলোক) হ্যায়?" সেই মুসলমানের প্রাণেও আজ আনন্দের ধাক্কা লাগিতেছে।

আজ কি সকলেরই আনন্দের দিন! ঐ যে কত পুত্রহীনা মাতা; বৃদ্ধ পিতা; হৃদয়ের ধন হারাইয়া, কত যুবতী পতিকে লইয়া গত বৎসর এমন দিনেও কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন কিন্তু আজ সে হৃদয় অন্ধকার। কত নরনারী যে আজ কাঁদিতেছেন? হাঁ। এ দৃশ্য সত্য, কিন্তু আজকার কান্নাও যেন কেমন একটু আর এক রকমের, অন্য দিন যেখানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৃদয় অবসন্ন, হতাশ, মুহ্যমান, আজ, সেখানে কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় যেন তেমন শূন্য নয়, তেমন অবসন্ন নয়। বুঝি আর না বুঝি, কান্নার পর হৃদয়ে কার যেন আবির্ভাব—কার

সত্তায়, যেন হৃদয় অত খালি নহে। কে যেন জোর করে কান্না ভুলায়ে দিচ্ছেন! এ যে মার আগমণের ফল তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

আজ কি সকলেই মাকে দেখিতেছেন? কই তাত বোধ হয় না, ঐ যে অসংখ্য অতি কৃপাপাত্র নরাকার জীব, পূজার নামে ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে ভক্ত যেমন ভক্তির উদ্বোধন করিতেছেন, তাহারা তেমনই কুপ্রবৃত্তির উদ্বোধন করিতেছে। ভক্ত যেমন ভক্তি স্রোতে ভাসিতে উৎসুক, উহারা তেমন পাপ স্রোতে ভাসিতে চলিয়াছে, এ কি দৃশ্য! বিষয়টাতে সাদৃশ্য আছে, উভয়েই আনন্দের প্রার্থী কিন্তু ভাবে স্বর্গ নরক প্রভেদ, ঐ অন্ধদিগের চক্ষু খুলে যাক্ তখনই বুঝিবে, তাহারা কি নিকৃষ্ট ঘৃণিত জঘন্য সুখের প্রত্যাশী। পূজা ফুরাইল, আমোদ আহ্লাদও ফুরাইল, তার পর কেবল অবসাদ, হৃদয় গ্লানি, হয়ত দেহে নূতন রোগের আবির্ভাব। অনন্ত জগতের উহারা এমনই সোপানে দাঁড়াইয়া আছে,—কুসঙ্গরূপ বন্ধনে এমনই হৃদয় বদ্ধ,

"চারি দিকে হের ঘিরেছে কারা, শত বাঁধনে জড়ায় হে—
আমি ছাড়াতে চাই ছাড়ে না কেন গো, ভুলায়ে রাখে মায়ায় হে—"

এ সঙ্গীতের ভাব তাহাদের প্রাণে কখন কখন নিশ্চয়ই হয়? কিন্তু হায়! দেহ-হাটের কোলাহলে তাহা শুনিয়াও শোনে না, যদি বা শোনে—ঐ কোলাহল জন্য এত দূরাগত ভাবে অস্পষ্টরূপে শ্রুত হয় যে, তাহার অর্থ বোধ হয় না। তাই নিরাশায় প্রবৃত্তি বসে আবার মোহ নিদ্রায় স্বপ্ন খেলায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইতেছে।

সহরেও আজ অষ্টমীর দিন বার বার কি বীভৎস দৃশ্যই দেখিলাম। যাহারা ছাগ মহিষের রক্ত মাখিয়া মাতামাতি করিতেছে তাহাদের দশা দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইল। তাহারা জানে না যে, কি নৃশংস ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া হৃদয়ের কি দুর্গতি করিতেছে। এমন কি ছোট ছোট বালকেরা পর্য্যন্ত এই কুশিক্ষায় নির্দ্দয় কাণ্ডে অভ্যস্ত হইতেছে। যাহারা অন্ধ, তাহারা ইহাকে ধর্ম্ম মনে করে। ধর্ম্মের নামে জীবহত্যা করিয়া মনে করে এই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম। যদিও বহুল পরিমাণে এখন লোকে বুঝিয়াছে যে বলিদান—জীবহত্যা ধর্ম্ম নহে। তবুও বহু দিনের কুসংস্কারে হৃদয় এমন আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে সকলে বুঝিয়াও বুঝে না, যেন তেমন নিঃসংশয় নহে।

অনেকে মনে করে বলিদান শাস্ত্রসম্মত। শাস্ত্র রবারের মত যেদিকে টা'ন সেইদিকেই যায়। তবে কি শাস্ত্র মিথ্যা? না। কিন্তু আক্ষরিক শাস্ত্রের নিকট যাইবার আগে, হৃদয়ে বিবেক-শাস্ত্রের নিকট যাও, তখন সত্য শাস্ত্র বুঝিবে নচেৎ শাস্ত্র অন্ধকারে ঢাকা। বলিদান সম্বন্ধে বিবেক-শাস্ত্র কি বলে বুঝে দেখ।

তারপর আর এক শ্রেণীর লোকে বলেন,—"যাহারা সম্পূর্ণ স্বাত্বিকভাবে পূজা-উপাসনা করিতে পারে না তাহারা রাজসিক বা তামসিক ভাবে পূজার সঙ্গে মাংসাহার ভালবাসে, সেখানে বৃথা মাংস ভক্ষণ না করিয়া দেবীকে তাহা উপহার দিয়া শেষে প্রসাদ পায় তাহা বরং ভাল। এ যুক্তি'ও বিবেক শাস্ত্রের সঙ্গে মিলাইলে অনেকেই বুঝিবেন যে ইহা কত :অসার কথা। কারণ নিরামিষ ও আমিষ উভয়বিধ খাদ্যই জনসমাজে প্রচলিত আছে, যাহার যে মত রুচি বা প্রয়োজন জ্ঞান, সে সেই মত আহার করে। যাহারা মাংস ভক্ষণ করে তাহারাও তাহা খাদ্য জ্ঞানে খায়, কিন্তু ঈশ্বরোপাসনা, যাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ব্যাপার তাহার মধ্যে এ বীভৎস কাণ্ডের স্থান দান করা, এ কি ভাব, কোন্ যুক্তি সঙ্গত? ঈশ্বরোপাসনায় সকলে সমান অধিকারী নহে, ইহা সত্য, তার জন্য কি তুমি উপাসনার ঘর কলুষিত করিবে? পূজার আদর্শ ছোট করিবে? উপাসনার আদর্শ চিরদিন পবিত্র ও উচ্চ রাখিতে হইবে। যে যতদূর গ্রহণ করিতে পারে ক্রমে ক্রমে তাহা গ্রহণ করিবে। আদর্শ কথনই মলিন করিতে পার না। জীব-হত্যা ধর্ম্মের কোন্ উচ্চ আদর্শ ব'লতো? বলিদানের যদি কিছু অর্থ থাকে, তবে তাহা আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ ঈশ্বর-চরণে ক্রমে ক্রমে নিজের সকল প্রকার আমিত্ব বলিদান করিতে হইবে। আত্ম-বলিদান মহিষ বলি অপেক্ষা অনেক কঠিন ব্যাপার।

তারপর নবমীও গেল; কত বাড়ী নাচগান পানভোজনের ধূমধাম তাহাও ফুরাইল। দশমীর ব্যাপারও গেল। এখন সাধক তুমি কোথায়? তুমি কি নিত্য-দেবীকে নিত্য-প্রভুকে ধরেছ? তা যদি ধরে থা'ক, তোমার চরণে আজ আমার প্রণাম। বিজয়ার পর যাহার সমস্ত ফুরাইল তোমার অবস্থা তাহাদের মত নয়, তোমার ঠাকুরের বিজয়া নাই। তোমার ঠাকুর প্রতিদিনের ঠাকুর। প্রতিদিন তুমি তাঁর কথা শুনিতে পাও, প্রতিদিন তাঁর কথা না শুনিলে তোমার চলে না, তুমি তাঁর কথা শুনিয়াই সকল কাজ কর। তুমি তাঁর কথা

জনিয়াই চিরকালের জন্ত তাঁর শরণাপন্ন হইয়া, তাঁর চরণাশ্রয় করিয়াছ। তবে ভাই! তুমি ঐ কোটী কোটী কৃপাপাত্র, যাহারা তিন দিনের পূজায় বাহ্ আমোদে কত কদাচারে কাটাইল তাহাদের জন্ত প্রার্থনা কর। আর এ দাসের মস্তকে পদধূলি দাও। দেবীর জয় হউক।

উপাস্য সসীম কি অসীম ?

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও অনেকের মত এই যে, অনন্তের উপাসনা হয় না। উপাসনা করিতে হইলেই উপাস্তকে ছোট করিয়া আনিতেই হইবে। যাহাকে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, যাহার কিছুই বোঝা যায় না, তাহার উপাসনা করা চলে না। শ্রীকৃষ্ণ, খৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য, বা অন্য দেব দেবীর মূর্ত্তির উপাসনা করিতে হইবে। এই মতাবলম্বীগণের মধ্যে শ্রীমতী এনিবেশান্ত একজন প্রধানা।

এই মতে কতখানি সত্য আছে এবং কতখানি মিথ্যা—ভ্রান্তি আছে তাহাই প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের প্রথম উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ উপাস্যের স্বরূপ কি, উপাস্ত সসীম কি অসীম তাহার আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা হইবে।

যাঁহারা উপরোক্ত মতের পক্ষপাতী আমার মনে হয়, তাঁহারা কথাটা তেমন পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারেন নাই, কিন্তু কথাটার ভিতর সত্য আছে। তাঁহারা যে বলেন অনন্তের উপাসনা হয় না, তাঁহাদের কথাটার প্রকৃত উদ্দেশ্য বোধহয় এই যে, অজ্ঞেয়ের উপাসনা হয় না। বস্তুতঃ যিনি অজ্ঞেয়, যাঁহার কিছুই জানি না কিছুই বুঝি না তাঁহার আবার উপাসনা কি? যে বস্তু সৎ কি অসৎ, ভাল কি মন্দ, মঙ্গল কি অমঙ্গল তাহা জানি না, তাহার উপাসনা করিব কিরূপে? সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত বস্তুর উপাসনা হয় না। আবার উপাস্ত যদি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞেয় হয় তাহারও উপাসনা হয় না। যে বস্তুকে আমি সমস্তই জানিতেছি, সমস্তই দেখিতেছি, সমস্তই বুঝিতেছি ইহার অধিক আর কিছুই নাই এমন বস্তুরও উপাসনা হয় না।

যাঁহারা সাকার মূর্ত্তি পূজা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশের এইরূপ বিশ্বাস যে, প্রতিমা যখন প্রস্তুত হয় তখন তাহাতে দেবতা থাকেন না, যখন

তাঁহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হইল, তখন তাহার ভিতর দেবতার আবির্ভাব হইল। কিন্তু সেই স্থানে পূর্ব্ব হইতে দেবতা ছিলেন, কেননা দেবতা সর্ব্বব্যাপী। এবং প্রতিমায় আবির্ভূত দেবতাও সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, ইহাই অনন্তের বীজ, যাঁহারা সরল অকপট সাধক তাঁহারা এই প্রকার উপাসনায়ও অগ্রসর হন, যদিও তাঁহাদের কল্পিত মূর্ত্তি, মুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে অন্তরায়, তথাপি ঐ যে অনন্তের বীজ যেখানে রহিয়াছে সেখানে উপাসনা যদি সরল হয়, অকপট হয়, তবে তাহা নিষ্ফল হয় না। আর যাঁহারা বিশ্বাস করেন প্রতিমাই দেবতা ইহার অতীত আর কিছু নাই, এই ত যাহা দেখিতেছি এই উপাস্য, তাঁহাদের উপাসনা কোন ফলপ্রদ হয় না। উপাসনা অনন্তেরই হয়, অজ্ঞেয়ের হয় না। অনন্ত এক হিসাবে অজ্ঞেয় হইলেও ইহা সত্য নয় যে, অনন্তের বিষয় মানুষ কিছুই জানিতে পারে না। বিশ্বাসী ভক্ত বলিতেছেন,—

"(আমি) চিনি না জানি না বুঝি না তাঁহারে, তথাপি তাঁহারে চাই।
সজ্ঞানে অজ্ঞানে পরাণের টানে, তাঁর পানে ছুটে যাই।
দিগন্ত প্রসার, অনন্ত আঁধার, আর কোথা কিছু নাই ;
তাহার ভিতরে, মৃদুমধুস্বরে, কে ডাকে শুনিতে পাই।
আঁধারে নামিয়া, আঁধার ঠেলিয়া, না বুঝিয়া চলি তাই ;
আছেন জননী, এইমাত্র জানি, আর কোন জ্ঞান নাই।"

আছেন জননী, এইমাত্র জানি, এই ত আমি কিছু জানি। তিনি আছেন আমি জানি, ইহাই অনন্তকে জানিবার সোপান। তিনি স্রষ্টা, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি পরম পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, তিনি পরম জননী, এইরূপেই তাঁহাকে জানা যায়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না। তাঁহাকে জানার কোনকালে শেষ নাই। তিনি জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানের শেষ নাই, শেষ নাই তাইত তিনি উপাস্য। যদি শেষ হইতেন, তবে ত উপাস্য হইতে পারিতেন না। যাহার সমস্ত জানিয়াছি তাহার আর প্রয়োজন কি ? যাহাকে জানি অথচ জানি না, তিনিই প্রকৃত উপাস্য। এ সম্বন্ধে ভক্ত কি বলিতেছেন,—

"অনন্ত হয়েছ, ভালই করেছ, থাক চিরদিন অনন্ত অপার।
ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর?
ভুলায়েছ যারে তব প্রলোভনে, সে কি ক্ষান্ত হবে তব অন্বেষণে?
না পায় না পাবে, যায় প্রাণ যাবে, কভু কি ফুরাবে অন্বেষণ তার?
যত পাছে পাছে ছুটে যাব আমি, তত আরো আরো দূরে রবে তুমি;
যতই না পাব, তত পেতে চাব, ততই বাড়িবে পিপাসা আমার।
আদর্শ তোমারে দেখিব যত, তোমার স্বভাব পেয়ে হব তোমার মত,
ফুরাবে না তুমি, ফুরাবো না আমি, তোমাতে আমাতে হব একাকার।"

এ সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

"নাহং মন্যে সুবেদেতি, নো ন বেদেতি বেদে চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ, নো ন বেদেতি বেদ চ॥"

তলবকারোপনিষৎ। ১০।

আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না; আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমাদিগের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।

অতএব উপাস্যে জ্ঞেয় এবং অজ্ঞেয় এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। তেমন বস্তুরই উপাসনা হয়। উপাস্য প্রকৃত পক্ষে চিরদিন অসীম অনন্ত পদার্থ কিন্তু যেটুকু স্বরূপ আমি বুঝিতেছি তাহা আমার আয়ত্ত সুতরাং অসীম হইয়াও যেন সসীম। অথচ উপাস্য যে অসীম এ জ্ঞান সর্ব্বক্ষণই থাকা আবশ্যক। উপাস্য সসীম হইলেই আর তিনি উপাস্য থাকেন না।

এই ভাব মানবীয় প্রেম সম্বন্ধেও প্রযুজ্য। মানুষ মানুষকে যে ভালবাসে তাহাও অনন্তকেই ভালবাসে। আমরা যে শিশুকে ভালবাসি, আমরা ত জানি শিশু কত ক্ষুদ্র, শিশুর ত কোন জ্ঞান নাই, শিশু যা তা মুখে দিতে যায়, এই দেখে কি আমরা শিশুকে ভালবাসিতে পারি? তা যদি হইত তবে আমরা তাহাকে ভালবাসিতে পারিতাম না। শিশুকে দেখিলেই যে কেমন একটা আনন্দের ভাব আসে, কেমন একটা আকর্ষণ হয়, তা ঐ যতটুকু দেখিতেছি তাহার প্রতি নির্ভর করে না, যাহা দেখিতেছি তাহা ছাড়া শিশুতে আরো এমন কিছু আছে, যাহা বুঝি নাই, কিন্তু যেন বুঝিবার চেষ্টা আসে, সেই বস্তুকেই

ভালবাসি। স্বামী স্ত্রীর ভালবাসাতে যদি এ ভাব হয় যে, যাহা পরস্পরকে জানা হইয়াছে তাহা ছাড়া আর কিছু বুঝিবার বিষয় নাই, তবে সেখানে দয়া থাকিতে পারে, আসক্তি থাকিতে পারে, ব্যাবহারিক কার্য্যাদিও থাকিতে পারে কিন্তু প্রেম থাকিতে পারে না। যেখানে এই ভাব আছে, যাহা বুঝা হইয়াছে, তাহা শেষ নয় কিন্তু এখনও পরস্পরকে লাভ করিবার বাকী আছে, সেইখানেই প্রেম আছে। সাধুভক্ত সম্বন্ধেও যদি মনে হয়, অমুক সাধুর বিষয় যাহা বুঝিয়াছি ঐ পর্য্যন্ত, আর উহাঁতে অধিক কিছু বুঝিবার বিষয় নাই, তবে সেখানেও ভক্তি থাকে না। যেখানে আরো বুঝিবার, জানিবার আছে সেই খানেই ভক্তি আছে। এতএব বিশ্বাস নির্ভর প্রেম ভক্তি সকলই অসীমকেই আশ্রয় করিয়া আছে। অসীমই প্রকৃত উপাস্য।

—জনৈক পণ্ডিতের বক্তৃতার ভাব অবলম্বনে লিখিত।

মহাপুরুষ মোহম্মদের আকৃতি ও প্রকৃতি।

শ্রীমোহম্মদ গৌরবর্ণ মধ্যমাকার পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ললাট প্রসারিত ও উভয় ভ্রূযুগল সূক্ষ্ম ছিল, উহা পরস্পর সংযুক্ত ছিল না; মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যবধান ছিল। তাঁহার শরীর দীর্ঘ ও উন্নত ছিল, তাহা হইতে এক জ্যোতি প্রকাশ পাইত। তাঁহার কপোল যুগল কোমল, সমতল ও বদন প্রসারিত ছিল; দন্ত শুভ্র ও উজ্জ্বল ছিল, এবং উপরের পংক্তির সম্মুখস্থ দশনদ্বয়ের মধ্যে অল্প ব্যবধান ছিল। শ্মশ্রু ও মস্তকের কেশরাশির মধ্যে কুড়িটী কেশ শুভ্র দৃষ্ট হইয়াছিল। কেশ সরল ছিল না, অনধিক বক্র ছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইত। * * তাঁহার বক্ষঃস্থল বিস্তৃত ছিল, এবং বক্ষ হইতে নাভিতল পর্য্যন্ত রোমাবলীর একটী সূক্ষ্ম রেখা ছিল। স্কন্ধ, কফোণি, (কনুই) ও জঙ্ঘার অস্থি স্থূল ছিল। করদ্বয় দীর্ঘ এবং করতল ও পদতল মাংসল এবং কোমল ছিল। তাঁহার শরীর সুগঠিত উজ্জ্বল ও সৌম্য ছিল। যখন তিনি মৌনভাবে বসিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে একপ্রকার তেজ ও প্রতাপ প্রকাশ পাইত, এবং যখন কথা কহিতেন তখন কোমলতা ও সৌন্দর্য্য বোধ হইত। যে ব্যক্তি দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিত, সে শোভা ও

নূতনত্ব লাভ করিত, এবং যে নিকটে আসিয়া দর্শন করিত সরসতা ও মিষ্টতা প্রাপ্ত হইত।

হজরত মোহম্মদ কাপাস-সূত্রের একটি খর্ব্ব কামিজ ব্যবহার করিতেন। কেহ তাঁহাকে এক উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দান করিয়াছিল, তিনি তাহা একবার মাত্র অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি তাঁহাকে কেনান দেশীয় একটি জোব্বা এবং এক জোড়া মোজা উপহার দিয়াছিল, তিনি সে সকল জীর্ণ হইয়া ছিন্ন হওয়া পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন। দৈর্ঘ্যে চারি হস্ত, পরিসরে সার্দ্ধ দ্বিহস্ত পরিমাণ তাঁহার এক উত্তরীয় বস্ত্র ছিল, তিনি উহা স্কন্ধে ধারণ করিতেন। তাঁহার অন্য একপ্রকার পরিচ্ছদ ছিল, কোন স্থান হইতে কোন দূত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে উহা পরিতেন। তিনি রজত অঙ্গুরীয় অঙ্গুলীতে ধারণ করিতেন। সেই অঙ্গুরীয়ে স্থাপিত ক্ষুদ্র প্রস্তরের উপরে "মোহম্মদ রসুল আল্লা" এই তিনটি পদ তিন পংক্তিতে অঙ্কিত ছিল। তদ্বারা তিনি পত্রাদির উপরে মোহর করিতেন।

হজরত খোর্ম্মাবল্কলের তন্তুনির্ম্মিত রজ্জুর ছাউনি খট্টার উপরে শয়ন করিতেন, অনেক সময় তাহাতে কোন আচ্ছাদন বা শয্যা বিস্তৃত হইত না। একদিন তাঁহার প্রচারবন্ধু ওমর তদবস্থায় তাঁহাকে শয়ান দেখিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওমর, তুমি কেন কাঁদিতেছ?" ওমর বলিলেন, "আপনি পরমেশ্বরের নিকটে সম্রাট্ অপেক্ষাও গৌরবান্বিত, তাঁহারা কত পার্থিব সম্পদ্ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন, হায়! আপনি ঈশ্বরের প্রেরিত হইয়া এই দুরবস্থায় জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।" তখন হজরত বলিলেন "ওমর, তাঁহাদের জন্য পৃথিবী ও আমাদের জন্য স্বর্গলোক ইহা তুমি কি ইচ্ছা কর না?" হজরত্ পরলোকে গমন করিলে আয়শা দেবী একটি ইজার ও কম্বল বাহির করিয়া বলেন যে, "মৃত্যুর সময়ে এই ইজার ও কম্বলমাত্র তাঁহার দেহে জড়িত ছিল।"

তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণাতে কখনও অধীর হইতেন না, বরং যখন অধিকতর ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইতেন তখন জমজমের জলপানে ধৈর্য্য ধারণ করিতেন। তাঁহার ক্রোধ ও সন্তোষ কোরাণের বিধি অনুযায়ী ছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকিত। যে কার্য্য ঈশ্বরাভিপ্রেত না হইত তিনি তাহাতে ঔদাসীন্য

প্রকাশ করিতেন। পৌরুষ ও বদান্যতা বিষয়ে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কোন প্রার্থী তাঁহার দ্বারে আসিয়া বঞ্চিত হইত না। কিছু না থাকিলে তিনি দুঃখপ্রকাশ করিয়া প্রার্থীর মনোরঞ্জন করিতেন। কথা দ্রুত বলিতেন না, চিন্তা ও গাম্ভীর্য্য সহকারে বাক্য সমাপ্ত করিতেন। যদি কোন মূর্খ দরিদ্র লোক ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিত, অধৈর্য্য হইয়া তার স্বরে কথা কহিত, তিনি অন্তরে ধৈর্য্য ধারণ করিতেন, তাহাকে অসন্তুষ্ট করিতেন না। তাঁহার স্বভাব অতি মধুর ছিল, যে ব্যক্তি তাঁহার সহবাসাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহার নিকটে বসিত, সে শীঘ্র উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা করিত না। তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ধীর স্বভাব ছিলেন; লোকের প্রতি সর্ব্বদা দয়া প্রকাশ করিতেন। ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত তিনি কখনও কাহাকে স্বহস্তে উৎপীড়ন করেন নাই। কি ধনী কি দরিদ্র কি অধীন কি স্বাধীন সকল লোকের নিমন্ত্রণ ও উপহার গ্রহণ করিতেন, কিন্তু সদ্‌কা (ধর্ম্মার্থ দীন-দুঃখীদিগকে দান) স্বরূপ দান করিলে গ্রহণ করিতেন না। প্রাপ্ত উপহারের বিনিময়ে তিনি তদনুরূপ দ্রব্য বা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রদান করিতেন।

তিনি স্বয়ং পশুযূথকে ঘাস খাওয়াইতেন, উষ্ট্র বন্ধন করিতেন, গৃহ ঝাঁট দিতেন, ছাগ মেষ দোহন করিতেন, ভৃত্যের সঙ্গে একত্র ভোজনে রত হইতেন, গোধূম চূর্ণ করিতে দাস পরিশ্রান্ত হইলে স্বয়ং যাঁতা যন্ত্র ঘুরাইয়া তাহার সাহায্য করিতেন, এবং বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বসনাঞ্চলে বাঁধিয়া গৃহে লইয়া আসিতেন। ধনী দরিদ্র ভদ্রাভদ্র সকল লোককে সেলাম করিতেন, কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে প্রথমতঃ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহার হস্ত গ্রহণ করিতেন। এ বিষয়ে প্রভু ও দাস, শ্বেতকায় ও কৃষ্টাঙ্গ, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকের প্রভেদ করিতেন না। সামান্য শ্রেণীর কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রণ করিলেও তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন। দিবসের অন্ন রাত্রির জন্য এবং রাত্রির অন্ন পরদিনের জন্য রক্ষা করিতেন না।

তিনি যখন সৈন্যসহ যাত্রা করিতেন তখন কৃষ্ণ ও শুভ্রবর্ণের বিজয়পতাকা সঙ্গে বহন করিয়া চলিতেন, সেই পতাকায় "লা এলাহ এল্লেল্লাহ মোহম্মদ রসুলাল্লা" অর্থাৎ "সেই ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত।" এই বচন অঙ্কিত থাকিত।

তিনি স্বীয় ধর্ম্মবন্ধুদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন ও তাঁহাদের সন্তোষবিধান

এবং সর্ব্বদা কুশল কল্যাণ জিজ্ঞাসা করিতেন। কেহ বিদেশে যাত্রা করিলে বা পীড়িত হইলে যাইয়া তাঁহার তত্ত্ব লইতেন, এবং তাঁহার জন্ত কল্যাণ প্রার্থনা করিতেন। কোন মোসলমানের মৃত্যু হইলে "নিশ্চয় আমরা ঈশ্বরের জন্ত, নিশ্চয় আমরা তাঁহার অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকারী" এই প্রবচনটি পড়িতেন, এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপাসনান্তে তাহার সম্বন্ধে কুশল প্রার্থনা করিতেন। লোকের সুখে দুঃখে সহানুভূতি করিতেন, সকল অবস্থায় প্রতিবেশীর তত্ত্ব লইতেন। কোন ধার্ম্মিক মোসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে অগ্রেই তিনি তাঁহাকে সেলাম করিতেন। লোকের ক্ষমা প্রার্থনা ও ত্রুটি স্বীকারকে উপেক্ষা করিতেন না। অতিথি অভ্যাগতকে ভালবাসিতেন ও ভোজন করাইতেন। যখন তিনি কোন পশুর উপর আরোহণ করিয়া কোথাও যাত্রা করিতেন তখন কোন পদাতিককে সঙ্গে লইতেন না, আরোহী হইলে সঙ্গে লইতেন; সঙ্গীর বাহন না থাকিলে, আপনার নিকট হইতে বাহন দিতেন, দৈবাৎ তাহার অভাব হইলে, পদাতিককে অগ্রে প্রেরণ করিতেন। যে ব্যক্তি তাঁহার সেবা করিত, সেই লোক দাসদাসী হইলেও তিনিও তাহার সেবা করিতেন। প্রধান ধর্ম্মবন্ধুদিগের অধিকাংশ কার্য্যে তিনি স্বয়ং যোগদান করিতেন। তিনি যে সভাতে বা সমাজে উপস্থিত হইতেন সামান্য শূন্য আসনে যাইয়া বসিতেন, উচ্চ স্থান ও উচ্চ আসনের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। উঠিতে বসিতে ঈশ্বরের নাম করিতেন। যে ব্যক্তি অপকার করিত তিনি তাহার উপকার করিতেন। দুঃখী দীনহীনের প্রতি একান্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন, কখনও তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন না। হজরত স্বীয় জীর্ণ পাদুকা ও বস্ত্র স্বহস্তে শিলাই করিতেন তিনি অনেক সময় কাবা মন্দিরের অভিমুখে মুখ করিয়া বসিতেন।*

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র সেন কৃত,
"মোহম্মদ চরিত" হইতে।

* অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান মুসলমান সমাজ দেখিয়া মহাপুরুষ মোহম্মদকে চেনা যায় না। (কুঃ সঃ)

তটিনী।

১

কুল কুল রবে তুমি সদা বহে যাও।
অবিশ্রামে বহ কভু ক্লান্ত নাহি হও॥
সদা সময়ের সহ, বহ তুমি অহরহ,
বহে যাও পুনঃ ফিরে পিছে নাহি চাও।
তীব্র গতি কভু ধীরে এঁকে বেঁকে ধাও॥

২

পর্ব্বতে জন্মিয়া তুমি মেশো গো সাগরে।
সুখী হও আলিঙ্গিয়া সাগর সখারে॥
বিশ্বের অভাব পুরি, করি বিতরণ বারি,
বাঞ্ছা তব সুখী হতে পতি সহবাসে।
তাই ধাও কুলনাদে সাগর উদ্দেশে॥

৩

বন উপবন মরু নগর প্রান্তর।
শোভে তব তীরে দেখি কতই সুন্দর॥
কোকিল কুজন শুনি, বাড়াইয়া কলধ্বনি,
সে সুন্দর শোভা মাঝে প্রফুল্ল হইয়া।
দ্বিগুণ উৎসাহে তুমি যাও গো ধাইয়া॥

৪

চাঁদের কিরণে খেলে চকোরা চকোরী।
জ্যোছনা আলোকে বহ তুলিয়া লহরী॥
সদা সুমন্দ পবনে, বহ প্রফুল্লিত মনে,
চাঁদের আলোকে দিক বেড়ায় হাঁসিয়া।
খেলিয়া তাহার মাঝে যাও গো ভাসিয়া॥

৫

চাঁদের আলোক প্রতিফলিত হইয়া।
খেলে তব হৃদি মাঝে নাচিয়া নাচিয়া॥
তব মৃদু উর্ম্মিমালা, চাঁদে লয়ে করে খেলা,
দেখায় সহস্র চাঁদ নির্ম্মল সলিলে।
যাহা এক হেরি মোরা এ নভোমণ্ডলে॥

৬

নিচু বিনা উচু দিকে কভু নাহি ধাও।
নিচু হোতে সদা তুমি মানবে শিখাও॥
বক্ষে পরি উর্ম্মিমালা, খেল তুমি কত খেলা,
ভুলাও মানবগণে খেলিতে তথায়।
অভাগা মানব তথা খেলিবারে ধায়॥

শ্রীসুনীতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺কাশীধাম।

কুশদহ। (১০)

গোবরডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য বংশ।—গোবরডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য বংশ অতি প্রাচীন। এই বংশের আদি পুরুষের নাম রাঘবেন্দ্র। সাতক্ষীরার নিকট বুড়ন পরগণার অন্তর্গত কুল্লো নামক স্থানে ইঁহার প্রথম বসতি। আনুমানিক দশ শত সালের প্রথমে অর্থাৎ জাহাঙ্গীর বাদসাহের রাজত্বকালে ইছাপুরের তাৎকালিক জমিদার, চৌধুরী বংশের পূর্ব্বপুরুষ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের দ্বারা রাঘবেন্দ্র গোবরডাঙ্গায় আনীত হন্। সিদ্ধান্তবাগীশ রাঘবেন্দ্রকে বাস করিবার জন্য ৫৫ বিঘা জমি দান করেন। মূল পুরুষ রাঘবেন্দ্র হইতে এখন গোবরডাঙ্গায় ১৩।১৪ ঘর হইয়াছে। রাঘবেন্দ্রের রামজীবন, রামভদ্র ও রামনারায়ণ নামে তিন পুত্র ছিলেন। হরদেব, মহাদেব, জানকীনাথ এবং হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা রামজীবনের শাখা। পতিরাম, যোগীন্দ্র, শ্রীশ, জনার্দ্দন নকুলেশ্বর, নগেন্দ্র এবং মন্মথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা রামভদ্রের বংশধর। রামনারায়ণের বংশধর এক মাত্র কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বর্ত্তমান আছেন। পূর্ব্বকালে এই বংশে অনেক

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় সকলেরই টোল চতুষ্পাঠী ছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ছাত্র আসিয়া ঐ সকল টোলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত।

রামজীবনের প্রপৌত্র কালীশঙ্কর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। স্বর্গীয় খেলারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন গোবরডাঙ্গার জমিদার হন তখন তিনি কালীশঙ্করের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজ কুল পুরোহিত নিযুক্ত করেন। তদবধি কালীশঙ্করের বংশধরেরা সসম্মানে জমিদার বাবুদিগের পৌরহিত্য করিতেছেন। যমুনানদীর ভট্টাচার্য্যপাড়ার বাঁধা ঘাট কালীশঙ্করের সহোদর রাধাকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ১২২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কালীশঙ্করের দুই পুত্র, চন্দ্রশেখর ও মাধব। চন্দ্রশেখর পিতার ন্যায় পণ্ডিত ও সমস্ত সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। তৎপুত্র শ্রীযুক্ত মহাদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় পিতৃ পিতামহের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন। তিনিই এখন এই পণ্ডিত বংশের মান রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার দুই সংসার; প্রথম পক্ষের পুত্র সুরনাথ সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ" ও "জন্মএয়োস্ত্রী" নামক পুস্তকে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, সুরনাথ যৌবনকালেই দুইটি শিশু পুত্র রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় পক্ষের চারি পুত্র, সকলেই সুশীল ও সচ্চরিত্র।

মাধবের পুত্র স্বর্গীয় হরদেব শিরোমণি এতদ্দেশের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার টোল ছিল এবং বহু ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

কালীশঙ্করের অপর ভ্রাতার নাম রামধন। রামধনের পুত্র অমরচাঁদ এবং পৌত্র শরৎ ও হরি। শরৎ সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া জীবনের অধিকাংশ কাল মুঙ্গেরে সসম্মানে কাটাইয়া অমরধামে গিয়াছেন। হরিবাবু স্থানীয় মিউনিসিপাল আপিসে কর্ম্ম করেন। তিনি নির্ব্বিরোধী এবং সৎকার্য্যে উদ্‌যোগী।

রামভদ্রের পুত্র রামচন্দ্র ও রামরাম। রামচন্দ্রের বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে সম্মানের সহিত দেওয়ানজী বাবুদিগের পৌরহিত্য করিতেছেন। রামচন্দ্রের প্রপৌত্র রামগোপাল চূড়ামণি যশঃ অর্থ ও সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া গিয়াছেন। তৎপুত্র পতিরাম ও বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমান আছেন।

রামরামের পুত্র শ্যাম ও গঙ্গাধর। শ্যামের পুত্র রামলোচন ও শ্রীধর।

রামলোচন ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পৌত্র মহিম ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথকতা করিয়া কাশীধামে অর্থ ও সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন। রামলোচনের প্রপৌত্র কুঞ্জলালের কথা সমধিক উল্লেখ যোগ্য। ইনি খুব ঈশ্বরবিশ্বাসী লোক ছিলেন। ভিক্ষা করিয়া দুর্গোৎসব করিতেন এবং যথেষ্ট ব্রাহ্মণ ও কাঙালী ভোজন করাইতেন। ইঁহার মৃত্যুতে পাড়ার সে আনন্দ অন্তর্হিত হইয়াছে।

গঙ্গাধরের পৌত্র ও প্রপৌত্রগণের মধ্যে উমাচরণ, পূর্ণচন্দ্র, জনার্দ্দন ও রসরাজের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। উমাচরণ ভট্টাচার্য্য গঙ্গাধরের পৌত্র। ইনি বড়ই সরল হৃদয়ের লোক ছিলেন। তৎপুত্র সাধুপ্রকৃতি রসরাজ নিজ চেষ্টা অধ্যবসায় দ্বারা লাহোর মেডিকেল কলেজ হইতে বিশেষ যোগ্যতার সহিত এল, এম, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গভর্ণমেণ্টের চাকুরী পাইয়াছিলেন। বংশের দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্পকাল মধ্যেই তিনি পরলোক গমন করেন।* পূর্ণচন্দ্র গঙ্গাধরের প্রপৌত্র। ইনি বড়ই পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও গঙ্গাধরের প্রপৌত্র। ইনি সজ্জন সরলহৃদয় ও দয়ালু।

রামনারায়ণের পৌত্র রামগোবিন্দ, সার্ব্বভৌম, নামে বিখ্যাত ছিলেন। উক্ত সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ছয় পুত্র। তৃতীয় পুত্র কাশীনাথ ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। নৈহাটীতে তাঁহার টোল ছিল। মধ্যম কালীপ্রাসাদ ব্যতীত অপর পাঁচ ভ্রাতাই অপুত্রক। কালীপ্রসাদের পুত্র কৃষ্ণমোহন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আজকাল অল্পই দেখা যায়। ইনি নিজের

---

* রসরাজ পল্লীগ্রামের সংকীর্ণ ভাব হইতে বিদেশে থাকিয়া উদারশিক্ষায় মন এবং সংস্কারের উন্নতি সাধনে সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রকৃতি সরল, উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের,দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। লাহোরে তিনি এমন একটি মহদন্তঃকরণ-বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি রসরাজের সঙ্কট পীড়ার সময় তাঁহাকে দেখিতে লাহোর হইতে গোবরডাঙ্গায় আসিয়াছিলেন। আমরা বলি কেবল বংশের দুর্ভাগ্য নহে, দেশেরও বিশেষ দুর্ভাগ্য যে অকালে রসরাজ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অথবা ঐ শ্রেণীর স্বর্গীয় দূতরা অল্প সময়ের মধ্যেই ইহ জীবনের কার্য্য শেষ করিয়া সুন্দর জীবনাদর্শ রাখিয়া চলিয়া যান। স্বর্গীয় দূতের লক্ষণ এই যে আর সকলকে মানুষ ভুলিয়া যায়, উঁহাদিগকে জন সমাজ ভুলিতে পারে না। (কুঃ সঃ)

অবস্থায় সদানন্দ থাকিতেন। সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণ এবং শাস্ত্রালোচনা করিয়া কালাতিপাত করিতেন। কৃষ্ণমোহনের পুত্র মহানন্দ ও কেশবচন্দ্র। উভয়েই দেবোপম চরিত্রবান্ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও পরম ধার্ম্মিক। মহানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিঃশত্রু ছিলেন। পরোপকার তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এই মহাত্মা অকালে ৪৮ বৎসর বয়সে তিনটী পুত্রসন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।* কেশববাবু সংসারে থাকিয়াও যোগী। ইনি দীর্ঘকাল সুখ্যাতির সহিত ২৪ পরগণা জজ আদালতের পেসকারী ও রেকর্ডকিপারী চাকুরি করিয়া পেনসন গ্রহণ করতঃ অধুনা *বর্দ্ধমানের রাজা বনবিহারী কপূর C. S. I, মহোদয়ের ধনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন।

(ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য হইতে প্রাপ্ত)

হিমালয় ভ্রমণ। (পরিশিষ্ট)

শেষ।

বেলা প্রায় ৩টার পর লুধিয়ানা পৌঁছিলাম। প্রথমে একটী ছত্রে গিয়া বিশ্রাম ও কিছু আহার করিয়া,তৎপরে সহরের ভিতর যাইয়া এক বাঙালী বাবুর বাসায় রাত্রি যাপন করিলাম। দুঃখের বিষয়, তাঁহার নাম ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতে ভুলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি অতি সজ্জন, সাধু-ভক্ত ব্যক্তি। তাঁহার বাসায় আরও একটী বাঙালী গৃহস্থ ভদ্রলোককে দেখিলাম, তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া এক্ষণে দেশাভিমুখে চলিয়াছেন। তিনি অনেক তীর্থের গল্প করিলেন, কিন্তু সকলই বাহ্যিক ভাবের কথা বলিলেন, দুঃখের বিষয় তাঁহার নিকট বিশ্বাস ভক্তির, কথা কিছু পাইলাম না।

৬ই অগ্রহায়ণ প্রাতেই লুধিয়ানা ছাড়িলাম। মধ্য পথে 'জলন্ধর' এবং

* স্বর্গীয় মহানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সোদর-প্রতিম ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য পদ পসারে ধনে ধান্যে তেমন উন্নতি করিতে না পারিলেও, পিতৃ পিতৃব্যের সর্ব্বোচ্চ আশীর্ব্বাদ 'ধর্ম্ম-প্রকৃতি' লাভে বঞ্চিত হন নাই। তাঁহার ধর্ম্মভাবে তরঙ্গ নাই, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক। (কুঃ সঃ)

'জলামুখী' তীর্থ দর্শনীয় ছিল, কিন্তু আমি আর তথায় না নামিয়া একেবারে অমৃতসর পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে সহরে পৌঁছিতে বেলা প্রায় ১২টা হইয়া গেল। এক্কাওয়ালা আমাকে গুরুদরবারার নিকট নামাইয়া দিল। আমি তথায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এক্ষণে গুরুভাণ্ডারায় গেলে, আহার মিলিতে পারে। আমি অমৃতসরোবর দেখিতে পাইলাম। প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে যে অত্যুন্নত স্বর্ণ মণ্ডিত মন্দির, তাহারই নাম গুরুদরবারা। অমৃত সরোবরের চারিধার শ্বেতপ্রস্তর মণ্ডিত চত্বর, এবং চতুর্দ্দিকে বৃহৎ অট্টালিকাশ্রেণী। শুনিলাম এখানে লক্ষ যাত্রী আসিলেও আশ্রয়ের অভাব হইবে না, এই আদর্শে ঐ অট্টালিকা শ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়, শুনিলাম, এক্ষণে ঐ স্থানে সাংসারিক ভাবে নানাবিধ আয়কর বিষয়ে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু গুরু নানকের মহিমায় সহরের চতুর্দ্দিকে এত ছত্র, এবং আখেড়া, (আশ্রম) আছে যে, লক্ষ লক্ষ যাত্রী এবং সাধু সান্ত নিঃশব্দে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সরোবরের একদিকে দরবারা, ও চাতালের সহিত বৃহৎ সেতু সংযুক্ত। উহা যথেষ্ট পরিসর। আমি এক্ষণে মন্দিরে না যাইয়া গুরু ভাণ্ডারায় গেলাম। সেখানে প্রকাণ্ড ইঁদারা হইতে কপিকলে জলরাশি উত্থিত হইতেছে, এবং শত শত লোকে স্নানাদি করিতেছে। আমি স্নান করিয়া সাধুদিগের সহিত গুরুভাণ্ডারায় ভোজন করিলাম। তৎপরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বেলা প্রায় ২টার পর বাহিরে আসিলাম। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলাম ও যাহা শুনিলাম, তাহাতে মনের যে অবস্থা হইয়াছিল এখন তাহা স্মরণ করিলেও আনন্দ হয়। দেখিলাম নরনারীতে মন্দির পরিপূর্ণ জমাট ভাব। শুনিলাম ভজন, সারঙ্গীর স্বরে (এখন তাহার সহিত হারমোনিয়মও ব্যবহৃত হইতেছে) ও মৃদঙ্গের (পাখোয়াজের) তালে সে যে কি ধ্বনি, কেন জানি না শ্রবণ মাত্রে আমার মন মোহিত হইয়া গেল। সঙ্গীতের ভাষা সকলই যে বুঝিতেছিলাম তাহা নহে, কিন্তু তাহার উদার বিশ্বজনীন ভাবের শক্তিতে আমার মনকে কোথায় যেন লইয়া যাইতে লাগিল।

মন্দিরের ত্রিতল অবধি নরনারীতে পরিপূর্ণ। সাধারণতঃ উপরে স্ত্রীলোক-দিগের স্থান কিন্তু এখানে স্ত্রী পুরুষের ভেদও সঙ্কোচ ভাব নাই, কি এক মহা-পবিত্রতা যেন সকলকে সংযত করিতেছে। তৎপরে শুনিলাম এবং এই দিনে

দেখিলাম এইরূপ জমাট ভাব প্রত্যহ। ভজন সর্ব্বক্ষণ চলিয়াছে, কেবল রাত্রি ১০ টার পর হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মন্দির বন্ধ থাকে। ভোর ৫টার পর হইতে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত খুব জমাটভাব চলে। তার পর দল পরিবর্ত্তন হইয়া ভজন চলিতে থাকে। মধ্যাহ্নে কিছুক্ষণ "গ্রন্থসাহেব" (শিখধর্ম্মশাস্ত্র) পাঠ হয়। আমি অনেকক্ষণ ভজন শুনিয়া বাহিরে আসিলাম। তথায়ও চারিদিকে দলে দলে ভজন করিতেছেন। কোথাও ভক্তগণ মিলিয়া সৎপ্রসঙ্গ (সঙ্গত) চলিয়াছে কোথাও সাধু সান্তগণ বসিয়া জপ করিতেছেন, ফলে এমন ধর্ম্মের ব্যাপার বোধ হয় আমি আর কোথাও দেখি নাই। কোন সঙ্কোচ নাই, বাধা নাই, ভেদাভেদ নাই, (কেবল ভিতরে জুতা লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ) আপন ভাবে বিচরণ কর আর ভজন শোন। মধ্যে মধ্যে ভক্তগণ 'কড়াপ্রসাদ' (মোহন-ভোগ) সকলকে বিতরণ করিতেছেন। শত শত অন্ধ আতুরও শান্তভাবে বসিয়া আছে, মধ্যে মধ্যে ভক্তগণ তাহাদিগের মধ্যে, রুটী, চানা (ছোলা) বণ্টন করিতেছেন।

আমি বাহিরে আসিলে একটু পরেই একটী সাধুর সঙ্গে আমার আলাপ হইল। কি জানি কেন, অল্পক্ষণেই তাঁহার সঙ্গে এতটা ঘনিষ্টতা ভাব আসিয়া গেল যে, কথায় কথায় আমার জীবনের অনেক গুঢ় কথাও তাঁহার নিকট বলিয়া ফেলিলাম। তাহাতে তিনি অত্যন্ত সন্তোষভাব প্রকাশ করিয়া, আমার এখানে থাকা সম্বন্ধে বলিলেন, আপনি কল্য বেলা ৯টার সময় ঠিক এই স্থানে আসিবেন, আমি এক গৃহস্থ বাড়ি আহারের বন্দবস্ত করিয়া দিব তাহাতে আপনার আর কোন কষ্ট হইবে না। থাকিবার জন্য নিকটেই একটি ছত্রের ঠিকানা বলিয়া দিলেন। আমি বেলা থাকিতে সেই ছত্র-বাড়িতে গেলাম, সেখানে কেবল একজন দারবান বাড়ি রক্ষক আছে, সে আমাকে দ্বিতলে একঘর দেখাইয়া দিল, আমি সেই ঘরে আশ্রয় লইলাম। তখন এই প্রকাণ্ড বাড়ী প্রায় খালি ছিল। সেখানে থাকিয়া আমার কোনই অসুবিধা হইল না।

৭ অগ্রহায়ণ শুক্রবার। ভোর ভোর উঠিয়া মন্দিরে গিয়া মনে হইল একি ব্রহ্মসমাজের ১১ই মাঘ? মন্দির পরিপূর্ণ, ভিতরে দ্বারদেশের নিকট কোন রকমে বসিলাম। ভোরের ভজন-সঙ্গীত ধ্বনিতে আমার মন যে কোথায় ভাবরাজ্যে চলিয়া গেল, তাহা আর এখন বলিতে পারি না। যখন সূর্য্যরশ্মি

মন্দির-দ্বারে প্রবেশ চেষ্টা করিতেছিল, তখন মন যেন বহির্জগতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সেরূপ অতুলানন্দ আমি জীবনে অল্পই ভোগ করিয়াছি।

তার পর বাসায় আসিয়া স্নানাদি করিয়া আবার মন্দিরে গেলাম। ৯টার সময় সেই স্থানে যাইবামাত্র ঐ সাধুর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি আমাকে এক গৃহস্থ হালয়াইয়ের দোকানে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিলেন "এই মহারাজ যে কয়দিন এখানে থাকেন তুমি ইঁহাকে ভোজন করাইও।" এই বলিয়া তিনি আর একবাড়ি আহারের জন্য চলিয়া গেলেন।

হালয়াই, "আইয়ে মহারাজ আইয়ে মহারাজ," বলিয়া আমাকে দোকানের উপরে উঠাইয়া লইলেন। কিছুক্ষণ কথা বার্ত্তার পর তিনি গৃহ হইতে আনিত উত্তম রুটী ডাউল প্রভৃতি ভোজ্য আমাকে ভোজন করাইলেন। তৎপরে কথা হইল বেলা ১টার পর তিনি আমার সঙ্গে বাহির হইয়া, এখানে যে সকল বিশেষ দর্শনীয় বিষয় আছে, তাহা আমাকে দেখাইবেন।

যথা সময়ে আমরা বাহির হইয়া কতকটা ঘুরিয়া আসিলাম। যাহা যাহা দেখিয়া ছিলাম তাহার মধ্যে গুরু রামদাস, অর্জ্জুনদাস, গুরু গোবিন্দ সিংহের স্মৃতিচিহ্ন এক একটী ছোট ছোট মন্দিরের ন্যায় স্থান গুলির কথা স্মরণ আছে। গুরু নানাকের পর ক্রমে ক্রমে যে দশজন গুরু ছিলেন ইঁহারা তাঁহাদের মধ্যের, গুরু গোবিন্দ সিংহ শেষ গুরু; ইনি শিখ খালসা সৈন্য প্রস্তুত করিয়া দিল্লীর বাদসার সহিত যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। কারণ ইঁহার পিতা যিনি নবম গুরু ছিলেন তাঁহাকে বাদসা হত্যা করিয়াছিলেন। চতুর্থ গুরু রামদাস, ইনি অমৃত সরোবর এবং গুরুদরবারার নির্ম্মান আরম্ভ করেন। তাঁহার পরবর্ত্তি গুরুতে সম্পন্ন হয়। এইরূপে দুই দিন পর্য্যন্ত অমৃতসরে আনন্দ উপভোগ করিয়া লাহোর যাত্রা করি। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালীন আরো একদিন অমৃতসর হইয়া দিল্লী, বৃন্দাবন, কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী, গাজীপুর মুঙ্গের ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান হইয়া ৮ই পৌষ কংগ্রেসের সময় খ্রিষ্টীক কন্‌ফারেন্সের অর্থাৎ একেশ্বরবাদীদিগের সভার অধিবেশনের প্রথম দিনে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলাম।

স্থানীয় সংবাদ।

গোবরডাঙ্গা ইংরাজী বিদ্যালয়।

গোবরডাঙ্গা স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন বাবুর প্রতি আমরা অদ্যাপি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা দিতে পারিয়াছি কি না তাহা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়; বোধ হয় পারি নাই। গোবরডাঙ্গা স্কুল যদি না হইত আমরা ঐ গ্রাম সমুহের এমন কি ও প্রদেশের অবস্থা আজ অন্য প্রকার দেখিতাম।

ইতিপূর্ব্বে জমিদার বাবুদিগের মাসিক সাহায্য ৫৫৲ টাকা, গভর্ণমেণ্ট সাহায্য ৫৫৲ টাকা, এবং ছাত্র বেতনে স্কুল চলিয়া আসিতেছিল। তারপর মধ্যে বাবুদের সাহায্য এবং গভর্ণমেণ্ট সাহায্য কমিয়া যায়, ও নানা কারণে স্কুলের অবস্থা খারাপ হইতে থাকে। এ সম্বন্ধে বিগত মাঘ মাসের "কুশদহ" পত্রে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় "গোবরডাঙ্গা হাইস্কুল" যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ বনগ্রাম-সহযোগী পল্লিবার্ত্তায় প্রেরিত পত্রে প্রকাশিত হয় যে—"গোবরডাঙ্গা ইংরাজী বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল নহে! বর্ত্তমান সময়ে কুশদহ সমাজে অনেক কৃতবিদ্য উপার্জ্জনক্ষম বক্তি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা সকলেই এই বিদ্যালয়ের উন্নতি দর্শনে উদাসীন। কেবলমাত্র গোবরডাঙ্গার বাবুদের কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই এই বিদ্যালয় চলিতেছে। ইহার উপব যদি দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পতিত হয় তবে অচিরাৎ এই বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন হইবে। আশা করি সাধারণে এ বিষয় যত্নবান হইবেন।" আমরাও তখন স্কুল সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিতেছিলাম। সুতরাং ঐ লেখা উপলক্ষ করিয়াই অগ্রহায়ণের কুশদহর স্থানীয় সংবাদ স্তম্ভে, আগে পত্র প্রেরক মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়া, আমাদের মন্তব্য এইরূপে প্রকাশিত হয়।" "পত্র প্রেরক মহাশয় কথাটি উল্লেখ করিয়া ভালই করিয়াছেন, 'কিন্তু, আশা করি সাধারণে এ বিষয় যত্নবান হইবেন।' এই মন্তব্যটী উল্টা বলা হইয়াছে। কারণ বাবুদের অগ্রে এমত কিছু যত্নবান হওয়া আবশ্যক যাহাতে স্কুলের প্রতি সাধারণে যত্নবান হন। বড়বাবু ইচ্ছা করিলে দেশের

কৃতবিদ্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী স্কুল কমিটা গঠন করিয়া বিবিধ উপায়ে শীঘ্রই স্কুলের উন্নতি করিতে পারেন। অবশ্য একাজে অর্থের প্রয়োজন, তাহাও তিনি একটু চেষ্টা করিলে যাহা হইবে, আর কাহার দ্বারা তাহা সম্ভব নহে। (অগ্রহায়ণের 'কুশদহ' দ্রষ্টব্য)

শ্রদ্ধেয় বরদা পণ্ডিত মহাশয়ও তাঁহার প্রবন্ধে সুমিষ্ট রস-ভঙ্গিমায় স্কুলের বর্ত্তমান অবস্থা ও অভাব বর্ণনা করিয়া বলেন "গোবরডাঙ্গা স্কুলের সন্তান সন্ততি ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, পোষ্টমাষ্টার, স্কুলমাষ্টার কেরাণী, নায়েব, গোমস্তা, মার্চেণ্ট আর কতই বা বলিব অসংখ্য বর্ত্তমান, কিন্তু কখন এক পয়সার মিছিরি দিয়াও জননীর কুশল জিজ্ঞাসা করেন না। বৃদ্ধা বিপন্না জননী অদ্যাপি 'হাঁটকুড়ীর' মত তাঁহার পিতৃকুলের মুখপানে চাহিয়া আছেন। মাননীয় 'কুশদহ' সম্পাদক ইঙ্গিতে বলিয়াছেন "কাহাকেও কিছু না বলাতে স্কুলের সন্তানদিগের কিছু অভিমান হইয়াছে, মাননীয় জমীদার মহাশয়গণ আহ্বান করিলে তাঁহারা সানন্দে মাসিক চাঁদা দিতে প্রস্তুত আছেন, দেশের লোকের মনের ভাব এমন হইলে বাবুরাও সানন্দে সকলকে আহ্বান করিবেন বলিয়া ভরসা করিতে পারি।"

আজ আমরা অতীব আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ২৭শে আশ্বিন অপরাহ্নে গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপাল গৃহে স্কুলের উন্নতি সাধনোদ্দেশ্যে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশে মিলিত হইয়া এক সভার অধিবেশন হয়। কিন্তু এই সভায় গিরিজা প্রসন্ন বাবু উপস্থিত ছিলেন না। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে দেওয়ানজী বাড়ির শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় (উকিল) মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এক সারগর্ভ বক্তৃতায় এই ভাব প্রকাশ করেন যে, "ইংরাজী ১৮৪৭।৪৮ সালে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা হইয়া এ পর্য্যন্ত দেশের কি উপকার হইয়াছে তাহা একবার সকলে ভাবুন। তৎকালে এ প্রদেশে বারাশত ও রাণাঘাট ব্যতিত উচ্চ বিদ্যালয় আর ছিল না। এ পর্য্যন্ত স্বর্গীয় সারদাপ্রসন্ন বাবু ও তাঁহার পুত্রগণের সাহায্যে স্কুল চলিয়া আসিতেছে। এ জন্য তাঁহারা আমাদের নিকট কতদূর ধন্যবাদের পাত্র তাহাও আপনারা ভাবিয়া দেখুন। এক্ষণে ইউনির্ভাসিটীর নূতন নিয়মানুসারে স্কুলগৃহের সম্পূর্ণ সংস্কার, লাইব্রেরী, শিক্ষক নিযুক্ত, ছাত্রনিবাস প্রস্তুত করা

নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু তাহাতে প্রায় ২০০০৲ দুই হাজার কটাার প্রয়োজন। জমিদার বাবুদিগের সাহায্য পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতেও ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছে না, এখন সাধারণের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। এখন আমাদের অযত্নে স্কুলটী যদি উঠিয়া যায় তবে তাহা কি শোচনীয় ও দুঃখের বিষয় হইবে।" তৎপরে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় (এডিটার॰) মহাশয় বিশদ রূপে স্কুলের উপকারিতা এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপরে কুঞ্জবাবু চাঁদার বহি লইয়া সকলের নিকট দেওয়ায় প্রথমে গৈপুর নিবাসী,—মোরেলগঞ্জ ষ্টেটের বর্ত্তমান ম্যানেজার শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্র বাবুর নামে এককালীন ৫০০৲ শত টাকা দান স্বাক্ষর করিলেন; তখন সকলের মনে এক আশ্চর্য্য ভাবের সঞ্চার হইল। আমরা বলি, বিধাতার খেলাই এইরূপ, তিনি কোন্ সূত্র ধরিয়া কাহার দ্বারা কি কাজ করান দেখিয়া আমরা অবাক হই। তৎপরে সকলে ইচ্ছামত চাঁদা সাক্ষর করিলেন।

শ্রীযুক্ত পতিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র " সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	গৈপুর	৫০০৲
" গণেশচন্দ্র আশ,	হয়দারপুর	২০০৲
" শরৎচন্দ্র রক্ষিত	খাঁটুরা	১০০৲
" কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়	গোবরডাঙ্গা	৫০৲

তৎপরে ১০৲, ৫৲ টাকা অনেকেই সাক্ষর করেন, এক্ষণেও চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে, বোধ হয় এ পর্য্যন্ত ১০০০৲ এক হাজার টাকার অধিক হইয়াছে।

তৎপরে বড়ই মঙ্গলের বিষয় যে স্কুল পরিচালনা এবং উন্নতি বিধান জন্য একটী কমিটি গঠনও হইয়াছে,—

রায় শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর জমিদার সভাপতি।
" জ্যোতিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সম্পাদক।
" ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মিত্র সহকারী "
" কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়, অডিটার (হিসাব পরিদর্শক)
" হরিশচন্দ্র বল ম্যানেজার সহকারী " "

ডাক্তার কেশব বাবু, শশী বাবু, অম্বিকা বাবু এবং শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপযুক্ত ব্যক্তিগণ সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

এক্ষণে আমাদের দুই একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আজকার কথা শেষ করিতে চাই। আশা করি তাহাতে কেহ ক্ষুণ্ণ হইবেন না। প্রথমতঃ আমাদের মনে হয় এই এককালীন দান ব্যাপারে জমিদার বাবুদিগেরও একটা বিশেষ দান থাকা উচিত। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত সকল সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, বর্ত্তমানে তাঁহারা মাসিক প্রায় ৭৫৲ টাকা দিতেছেন, এখনও অবশিষ্ট সকল অভাব তাঁহাদের উপরই নির্ভর করিতেছে। আমরা এ কথা স্বীকার করিয়াও বলি, এখন যখন কমিটী গঠন করিয়া দেশের লোকের হাতে স্কুলের ভার দেওয়া হইল, তখন দেশের লোকও কিছু কিছু মাসিক চাঁদা দিবেন না কেন? অবশ্যই দিবেন! এই যে এককালীন দান পাওয়া গেল, ইহা ভগবানের বিশেষ কৃপা সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাতেই কি স্কুল চলিবে? স্কুলের প্রকৃত উন্নতি এবং স্থায়িত্ব বিধান করিতে হইলে, জমিদার বাবুদিগের সাহায্য সত্ত্বেও সাধারণের মাসিক চাঁদার একান্ত আবশ্যক।

তৎপরে স্কুল পরিচালনার জন্য যিনি যে পদেই অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, যিনি বুক দিয়া কাজ করিবেন, তিনিই প্রকৃত নেতা। আমরা শ্রদ্ধেয় কুঞ্জবাবু এবং পতিরাম বাবুকেই সেইরূপ লক্ষ্য করি। আর কিশোরী বাবুকে কেবল সাধারণ সভ্যের পদে রাখা আমাদের বিবেচনায় ঠিক নহে। তাঁহাকে বিশেষ কার্য্যভার (Active Part) দেওয়া আবশ্যক। ধনাধ্যক্ষ কে হইয়াছেন তাহার কোন উল্লেখ নাই কেন? "অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" যেন না হয়।

বিলাতযাত্রা।—গোবরডাঙ্গার দেওয়ানজী বংশের স্বর্গীয় কালীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র, মইনপুরীর উকিল শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, সিটিকলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ, বিগত ২৮শে অক্টোবর ব্যবহারিক বিজ্ঞান (ইকনমিক্ সায়েন্স) শিক্ষার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার শুভ ইচ্ছার সহায় হউন।

স্বাবলম্বন।

আমরা আহ্লাদের সহিত নিম্ন লিখিত সংবাদটী পত্রস্থ করিতেছি যে, কুশদহের অন্তর্গত গাইঘাটা থানার নিকট নগরউখড়া গ্রামে বাবু রামদয়াল বিশ্বাস, আপাততঃ শতাধিক বিঘা জমি লইয়া বিগত বর্ষ হইতে কৃষি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে, একটী সদ্ভাবে প্রণোদিত হইয়া রামদয়াল বাবু এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে, লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকে চাষ কাজ করিয়া চাকুরী অপেক্ষা সুখের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন কি না তাহা পরীক্ষা করা। প্রথম বৎসরে তিনি জমীর সার দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য, নূতন প্রণালীতে চালাইয়া লাভবান হইতে পারেন নাই, কিন্তু সেজন্য তিনি নিরুৎসাহিত নহেন। কেন না, প্রথমে কোন অভিনব পথ প্রদর্শন করিতে হইলে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা চাকুরীর দুর্গতি বুঝিয়াও শক্তি সামর্থের অভাবে চাকুরী ভিন্ন গতি নাই মনে করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যাঁহাদের জীবিকার জন্য অন্য উপায় আছে, হাতে দশটাকা মূলধনও আছে, তাঁহারা যদি কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এবং প্রথম বাধা বিঘ্ন সকল অতিক্রম করিবার জন্য ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে পারেন তবে তাহাতে লাভবান হইবার পক্ষে সন্দেহ নাই। রামদয়াল বাবুর কলিকাতা বেলগেছিয়ায় পাটের আড়ৎ আছে, ঈশ্বর কৃপায় কিছু মূলধনও আছে, চাষ কাজে একটী উপযুক্ত সহকারীও পাইয়াছেন এখন দৃঢ়তার সহিত কাজ করিতে পারিলে সফলতা লাভে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই।

রাণাঘাট-সবডিভিসানাল অফিসার মহোদয় রামদয়াল বাবুর একার্য্য দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট বিশেষ সহানুভূতি ও অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। আমরা এরূপ কাজে দেশের শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

মৃত্যু।—আমরা অতীব দুঃখিতভাবে প্রকাশ করিতেছি যে, গোবরডাঙ্গা এবং কলিকাতা জরিপস্ লেন নিবাসী, বড়বাজার চিনিপটীর পরলোকগত

রামকৃষ্ণ রক্ষিতের ফারমের অংশীদার শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহলোকে নাই। তিনি বহুকাল হইতে শিরঃপীড়া ভোগ করিয়া, ইদানীং ৩।৪ বৎসর হইতে অন্যান্য রোগে একবারে কার্য্য পরিদর্শনে অক্ষম হইয়া পড়েন। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পুরী ও পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করিয়াও শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ আর হইল না। তাহার উপর বৎসরাধিককাল গত হইল, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্ম্মলচন্দ্রের মৃত্যুতে, তাঁহার যাহা কিছু বল সামর্থ্য ছিল তাহা চলিয়া যায়। তৎপরে বিগত ১২ই কার্ত্তিক সংসারের সকল শোক মোহ ভুলিয়া, "ধনে সুখ নাই, জনে সুখ নাই, মান সম্ভ্রমেও হৃদয় বেদনা দূর হয় না", এই সকল মহাবাক্যের সাক্ষীস্বরূপ হইয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন বড়ই বিচিত্রতাপূর্ণ, অনেক শিক্ষনীয় বিষয় তাহার মধ্যে আছে। আমরা বারান্তরে তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। ভগবান্ অমরধামে তাঁহার আত্মার সদ্গতি করুন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।*

বিনিময়ে প্রাপ্ত পত্রিকাদি।

আমরা কুশদহর বিনিময়ে প্রাপ্ত পত্রিকাদির একণে কেবল প্রাপ্তি স্বীকার করিলাম। আগামী বর্ষে ক্রমে ক্রমে সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

সাপ্তাহিক। ১। Unity and the Minister, ২। বঙ্গবাসী, ৩। বসুমতী, ৪। সঞ্জীবনী, ৫। এডুকেশন গেজেট, ৬। কল্যাণী, ৭। পল্লীবার্ত্তা, ৮। প্রসূন।

পাক্ষিক।—৯। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১০। তত্ত্বকৌমুদী।

মাসিক।—১১। তত্ত্ববোধিনী, ১২। বামাবোধিনী, ১৩। নব্যভারত, ১৪। মহাজন বন্ধু, ১৫। যুবক, ১৬। বিধানপ্রকাশ, ১৭। মুকুল, ১৮। দেবালয়, ১৯। তিলি বান্ধব, ২০। সুপ্রভাত, ২১। Calcutta University Magazine, ২২। সমাজ, ২৩। তাম্বুলী সমাজ, ২৪। প্রকৃতি, ২৫। অর্চ্চনা, ২৬। ভারতী, ২৭। ভারত মহিলা(ঢাকা), ২৮। প্রচার, ২৯। গৃহস্থ, ৩০। বাণী, ৩১। অলৌকিক রহস্য, ৩২। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম (ত্রৈমাসিক)

---

* নানা কারণে, কুশদহ বাহির হইতে কালবিলম্ব হওয়ায় কার্ত্তিক মাসের ঘটনা, উক্ত সংবাদটী আশ্বিনের কাগজে দেওয়া হইল।

Printed by J, N. Kundu at the Kantik Press, 20 Cornwallis Street and Published from 28-1 Sukea Street, Calcutta.